বৈষ্ণব দর্শন
ও
সাহিত্যের রসলোকে

ডঃ দিলীপ কুমার দত্ত, এম. এ., পি-এইচ. ডি.,
রিডার, মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

: পরিবেশক :
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬৩

প্রকাশিকা : শ্রীমতী ছায়া দত্ত

গ্রন্থস্বত্ব : শ্রীমতী

প্রচ্ছদ শিল্পী : তরুণ চক্রবর্তী

পরিবেশক : অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বাঁধাই : অন্নপূর্ণা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক : শ্রীঅজিত কুমার মান্না
পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

: উৎসর্গ :

বাৎসল্য রসমাধুর্যে নিত্য প্রেরণার মন্ত্রোচ্চারণে
যিনি ছিলেন আলোকের পথপ্রদর্শিকা,—
শ্রদ্ধার স্বর্গে নিত্য-পূজিতা মা
৺শৈলবালা দত্তের
পুণ্য স্মৃতির
উদ্দেশে

গ্রন্থকারের প্রকাশিতব্য অন্যান্য গ্রন্থ :

* বঙ্কিম-মনন (যন্ত্রস্থ)
* বৈষ্ণবীয় প্রেমরস ও সাহিত্যপ্রসঙ্গে
* রবীন্দ্র মানসলোকে
* বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শন ও বিপ্রলম্ভাদর্শ
* পথ, প্রকৃতি ও মানুষ : হিমাচলে কয়েকটি দিন
* বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গনে
* শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বৈষ্ণবাদর্শ

॥ নিবেদন ॥

বৈষ্ণবসাহিত্যের রসজগৎ সম্বন্ধে আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে,—এমন একটি পরিপূর্ণ রসভাণ্ডার, শুধু পরিপূর্ণই বা বলি কেন, এমন একটি অশেষ রত্নখনি সমগ্র বিশ্বের কি রসসাহিত্যের, কি ধর্ম বা সাধনসাহিত্যের সমস্ত অঙ্গন তন্ন তন্ন করে কর্ষণ করেও দ্বিতীয় আর একটি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রেমই হোক বা ভক্তিই হোক, তার চূড়ান্ত শেষ সীমা বাড়তে বাড়তে কতদূর যেতে পারে, কতখানি স্বার্থশূন্য ও নিষ্কলঙ্ক হতে পারে, আত্মসমাহিত বিভোরতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, তা মুগ্ধ বিশ্ববাসীর অনুভবগোচর করিয়েছে—আমাদেরই সোনার বাংলার সোনার মানুষ শ্রীচৈতন্যদেবের অনন্য কৃষ্ণপ্রেমের সাধনা এবং যুগপৎ তাঁর সম্ভোগময় রসানন্দের অপূর্ব বিভোরতা ও বেদনার অশ্রুসাগরমথিত কৃষ্ণবিরহার্তির অনুপম আদর্শকে অবলম্বন করে বিবর্তিত একদিকে বৈষ্ণবসাহিত্যের অশেষ বৈচিত্র্যভরা অতুলনীয় প্রেমস্বরূপ, অপরদিকে গৌড়ীয় সাধনার অদ্বিতীয় রাগভক্তিমহিমা। আসলে প্রেম ও ভক্তির মধ্যে এখানে কোন ভেদরেখা নেই, যে কারণে প্রেমধর্ম, ভক্তিধর্ম, প্রেমভক্তিধর্ম—সবই এই বৈষ্ণবধর্মের বিকল্প নামে পরিণত হয়েছে।

প্রেম বা ভক্তির সেই সর্বোচ্চ গরিমার এখানে উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে রাধাপ্রেমকে আশ্রয় করে। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ কেবল আবেগের বশে প্রচার করেননি—"ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা।", সে প্রেমের অনুপম স্বরূপের যোগ্য প্রকাশও ঘটিয়ে গেছেন সংস্কৃত ও বাংলায় রচিত তাঁদের অসংখ্য সাহিত্যে। শুধু তাই নয়, সে সাহিত্যে যে অদ্বিতীয় রসাদর্শের বিস্তার, শ্রুতি-স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রাদির সমর্থনকে ভিত্তি করে রচিত নানা অলঙ্কারগ্রন্থে তার যথা-আদর্শের বিশ্লেষণে ও দর্শনগ্রন্থাবলীতে তার গৌরবমূল নানা তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠায় সে রসাদর্শের সুদৃঢ় সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তাঁরা করে গেছেন। অথচ ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে মধুররসাত্মক রাগসম্পর্কের বীজ বৈদিক সংহিতাতেই প্রথম উপ্ত হতে দেখি। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর নানা দেশে তার বিবর্তনে রাগময় ভক্তিসাধনার নজির খুব বিরল নয়, যেমন—খ্রীষ্টীয় মিষ্টিক সাধনা, ইসলামী-সূফী সাধনা, ভারতে আড়বার সাধকদের সাধনা, সহজিয়া বৌদ্ধ সাধনা প্রভৃতি। কিন্তু বিশেষ কোন গৌরবপরিচিতির স্বাক্ষর তারা রেখে যেতে পারেনি। কেননা, পরিণতিতে সকাম মুক্তিবাসনায় ঈশ্বরের সঙ্গে সাধকের কান্ত-কান্তা কিংবা কান্তা-কান্ত প্রেমসম্পর্কের স্থাপন কেবল সাধনোপায় হিসাবেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, উপেয় হয়ে উঠতে পারেনি। এককথায় সে সব ক্ষেত্রে প্রেমের সাধনা প্রেমহীন মুক্তির লক্ষ্যে, প্রেমরাগ তাই সেখানে

একান্তই গৌণ,—উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু চৈতন্যদেবের সাধনাশ্রিত বৈষ্ণব সাধনায় প্রেম উপায়-উপেয়, উপলক্ষ্য-লক্ষ্য, সাধন-সাধ্য সবই। সুতরাং এ গৌরব তার সম্পূর্ণ নিজস্ব, —সার্বভৌম।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে মহাবিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনকালে শ্রেণীকক্ষে বৈষ্ণব পদাবলী পড়াতে পড়াতে অসংখ্য উদ্ধৃতিসহ বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনের বিশ্লেষণে বিভোর হয়ে যেতে দেখতাম পূজনীয় মাষ্টারমশাই শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে। আমাদের সব সময়ে বলতেন অলস ও অবসর মুহূর্তগুলি আপনমনে বৈষ্ণবসাহিত্যের স্মরণে-পর্যালোচনায়-আবৃত্তিতে ভরিয়ে তুলতে। সেই প্রথম বৈষ্ণবসাহিত্য সম্পর্কে মুগ্ধতার সূচনা। তবু সেদিন বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝি—কি অমূল্য রসরত্নাকরের হদিশ তিনি পেয়েছিলেন এবং কি অমূল্য উপদেশই না তিনি দিতেন আমাদের। কিন্তু যা অনন্ত রসভাণ্ডার, দুর্বিগ্রাহ—তাকে পূর্ণ আস্বাদের গণ্ডিতে আনার সাধ্য কার! মনে পড়ে আমাদের পরম রসিক কবিগুরুর কবিতার ক'টি পঙ্‌ক্তি :

"বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা!
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো—
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।"

শ্রীরূপ গোস্বামী এ প্রেমরসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বহু কাব্য-নাটক-অলঙ্কারগ্রন্থ, প্রেমভক্তি-রসের বেদস্বরূপ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং বিশেষ করে কেবলমাত্র মধুররসের মহাকাব্য-সদৃশ অনবদ্য দিগদর্শনী 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রণয়ন করে বিশ্বজনের পরম শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তবু প্রেমরসের সে মহাগ্রন্থের উপসংহারে তাঁর এই অনুভবই সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল যে,—অতুল অপার প্রেমরসসমুদ্রের তটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি সে রসের এক কণামাত্রই কেবল স্পর্শ করতে পেরেছেন। এ থেকেই বৈষ্ণবসাহিত্য-দর্শনের অনির্বচনীয় ভূমাস্বরূপটির আভাস পাওয়া যাবে।

বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সে রসস্বরূপের একটা অতি ক্ষীণ আভাস উপলব্ধির অক্ষম প্রয়াসমাত্র। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে 'আলেখ্য' (সন্তোষপুর, কলকাতা-৭৫), 'বিশ্ববাণী' (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কলকাতা-৬), 'চণ্ডীদাস স্মরণিকা' (নানুর, বীরভূম), 'জ্ঞানদাস স্মরণিকা' (কাঁদরা, বর্ধমান), 'এষণা' (এগ্‌রা, মেদিনীপুর) ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া একটি প্রবন্ধ ('ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও

মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধা') ঈষৎ ভিন্ন নামে মুদ্রিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচশত জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত স্মারক সঙ্কলন 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুর্যামৃত' গ্রন্থে। সেগুলির বহুল পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে বর্তমান গ্রন্থাকারে প্রকাশ আচার্যদেব ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, প্রবীণ মাষ্টারমশাই শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সমালোচক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী—এঁদেরই নিত্য প্রেরণা ও স্নেহ-সাহচর্যের ফল। এঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের, স্নেহাশীর্বাদ প্রার্থনার,—কৃতজ্ঞতা জানাবার নয়।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কসের শ্রীঅজিতকুমার মান্না ও শ্রীশ্যামাপদ পাত্র মহাশয় আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রয়াসে রচনাগুলিকে গ্রন্থাকারে পরিণতি দিয়ে আমায় অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। অশেষ ঋণে ঋণী করেছেন বন্ধুবর শিল্পী তরুণ চক্রবর্তী প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কনে দায়িত্বপূর্ণ আয়াস স্বীকার করে। আর অন্নপূর্ণা প্রকাশনী শুধু এ গ্রন্থ পরিবেশনের ভার নয়, খুঁটিনাটি বহু কাজে অকুণ্ঠ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার বহু পরিশ্রমের লাঘব করেছেন। এঁদের ঋণ ভুলব না।

পরিশেষে বলি, প্রবন্ধগুলি রচনা করতে বসে বৈষ্ণব রসমহার্ণবের এক অতি সূক্ষ্ম কণার স্পর্শই আমাকে যে অনাবিল আনন্দ দিয়েছে, তাই আমার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তবু গ্রন্থাকারে সাজিয়ে তোলার এই দীন প্রয়াস—এর মাধ্যমে যোগ্য রসিকজন যদি কেউ নির্মল আনন্দের সন্ধানে সেই অতলান্ত রসসমুদ্রের পথিক হন, ডুবুরী হয়ে সে রত্নরাশির কিছু আহরণ করে আনতে প্রয়াসী হন—সেই অন্তর্গূঢ় অভিপ্রায়ে।

দিলীপকুমার দত্ত

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ধর্মসাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ণব প্রেমভাবনা	...	১
বৈষ্ণবসাহিত্যের রাধাপারম্যবাদ ও কবি জয়দেব	...	১৮
বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব	...	২৮
বেদান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন : বীজ ও বিবর্তন	...	৫৭
কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ত্ব : স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব		৯২
ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধা	...	১৩১
গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার	...	১৬৭
বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও কবি জ্ঞানদাস	...	১৮৮
গ্রন্থপ্রসঙ্গ	...	২০৭

॥ ধর্ম-সাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ণব প্রেমভাবনা ॥

ধর্ম,—'ধৃ'-ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ,—যা ধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ব্যুৎপত্তির বিচারে—যা ধারণ করে রাখে, তাই হ'ল ধর্ম। মহাভারত-প্রদত্ত ধর্ম-সংজ্ঞা এই ব্যুৎপত্তিমূলকেই আশ্রয় করে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণের ধারকতাকেই বিশেষ মূল্য দান করেছে। ধর্মের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে কর্ণ-পর্বে পার্থের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :

"ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ সংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

(মহা° ॥ কর্ণ/৬৯/৫৮ ॥ চিত্রশালা প্রেস, পুনা/১ম সং., ১৯৩১)

[ধারণ হেতুই ধর্মের উদ্ভব, সুতরাং ধর্ম হ'ল প্রজাগণের ধারক বা রক্ষাকারী। যা ধারণ অর্থে প্রযুক্ত, তাকেই নিশ্চিত ধর্ম জ্ঞান করবে।]

এই সংজ্ঞাই ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা। বৈশিষ্ট্য বা গুণ অর্থেও যখন 'ধর্ম' শব্দটি প্রযুক্ত হয়, সে অর্থও ব্যুৎপত্তির বিচারে যথার্থই। যেমন পদার্থের ধর্ম, গৃহস্থের ধর্ম,—অর্থাৎ যা বৈশিষ্ট্য বা গুণের ধারক। এখানেও ধারকতার বিচারেই ধর্ম শব্দটি গ্রাহ্য, আর এ ধারণ অবশ্যই সকল কলুষ-মুক্ত সদ্‌গুণাবলীর যে কারণে মহাভারতে পুনরায় উক্ত হয়েছে :

"... ...ধর্মার্থমনৃতমুক্ত্বা নানৃতভাগ্‌ভবেৎ॥" (॥ কর্ণ/৬৯/৬৫ ॥)

এক কথায় জীব ও জগতের নিত্য কালের মঙ্গল, সত্য ও সুন্দরকে যা ধারণ করে রাখে—বৃহত্তর অর্থে তাই হ'ল ধর্ম। সুতরাং ধর্মের লক্ষ্য চির-সুন্দরের নিত্য রসানুভূতি যা সমস্ত সীমাবদ্ধতার গণ্ডিমুক্ত অবিনাশী সুখ ও আনন্দের উৎস। লৌকিক জগতের সর্ববিধ কাম্যবস্তুর আস্বাদজনিত আনন্দ অপেক্ষা গভীর, ব্যাপ্ত ও ঘনীভূত এক নিত্যবর্ধমান আনন্দরস-প্রবাহে অবিনাশী আত্মাকে সমাহিত করে রাখে ধর্ম। আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের ফলেই অনিত্য ভোগপুঞ্জের আপাত-সুখোজ্জ্বল মোহপাশ ছিন্ন করে নিত্য সুখ ও আনন্দের উৎস সেই চির-সুন্দরের উপলব্ধি সম্ভব। সুতরাং বলা চলে—

আত্মার প্রকৃত স্বরূপের জাগরণ ও তার পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধনের লক্ষ্যেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা।

জগতের সমস্ত কিছুরই সৃষ্টিমূলে রয়েছে জগৎ-নিয়ন্ত্রী রসময় ঈশ্বরের স্নেহস্পর্শ। সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনা—এ সবেরও মূলীভূত কারণ তিনিই, যে কারণে তাঁকে বলা হয় 'সর্বকারণকারণম্' (ব্রহ্মসংহিতা ॥ ৫/১ ॥), 'বিশ্বস্য কর্তা' (মুণ্ডকোপনিষৎ ॥ ১/১/১ ॥), 'কারণানি নিখিলানি' (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ॥ ১/৩ ॥) ইত্যাদি। উপনিষদে বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেখানে পাই—এ জীবজগৎ অর্থাৎ প্রকৃতি সেই অখণ্ড-আত্মা পরমপুরুষ ঈশ্বরেরই শরীরাংশ। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে উপনিষদের ঋষি লিখেছেন :

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ···
···স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।"

(বৃহদারণ্যক উ° ॥ ১/৪/১, ৩ ॥)

["এই (পরিদৃশ্যমান জগৎ) পূর্বে পুরুষরূপী আত্মরূপে বর্তমান ছিল। সেই আত্মা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনা ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না। ·····(কিন্তু) তিনি আনন্দলাভ করিলেন না ; সেই-জন্য কেহ একাকী থাকিয়া আনন্দ পায় না। তিনি দ্বিতীয় (এক ব্যক্তিকে লাভ করিতে) ইচ্ছা করিলেন।"

—অনুবাদ : মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন।]

একক সত্তায় আনন্দের আস্বাদ সম্ভব নয় বলেই দ্বৈতলীলার মাধ্যমে পারস্পরিক আনন্দরস-সম্ভোগ বাসনার চরিতার্থতা হেতু একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তাকে প্রাপ্তির বাসনা এবং সে কারণেই জীব-প্রকৃতির সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়োগ, —সৃষ্ট জীবজগৎ তথা প্রকৃতি এবং স্রষ্টা ঈশ্বররূপে আপনার দ্বিধা-বিভক্তি বা পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা বরণ :

"স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ স ইমমেবাত্মানং
দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং ··।" (ঐ ॥ /৪/৩ ॥)

["স্ত্রী ও পুরুষ আলিঙ্গিত হইয়া থাকিলে যে পরিমাণ হয়, তিনি সেই

পরিমাণ ছিলেন। তিনি স্বীয় দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী হইল।"]

বেদান্তসূত্রে বিশ্ব সম্বন্ধে এ কারণেই বলা হয়েছে—"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ।" (॥ ১/৪/২৬ ॥) খ্রীষ্টীয় দর্শনেও মানব-সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্য হিসাবে একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়:

"....man was created for the very purpose of enjoying God and being enjoyed by Him,...." (This Jesus : Eric G. Frost. p. 89)

সুতরাং স্বেচ্ছাবৃত এ বিচ্ছিন্নতা ও তার ফলশ্রুতি দুঃখ-বেদনা, অভাব-অতৃপ্তি, অশ্রু-উদ্বেগ প্রভৃতি কোনটাই শূন্যাত্মক কিংবা প্রকৃত দুঃখকারক নয়, তা লীলাজনিত রসাস্বাদ-বাসনাকে উত্তরোত্তর প্রগাঢ় করে তোলে, সৃষ্টি করে অসীম আনন্দরসের নিত্য বৈচিত্রী। সুতরাং তা নিত্য রস-সম্ভোগেরই কারক অর্থাৎ পূর্ণাত্মক। উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষি তাই জগৎ সৃষ্টির পিছনে সেই আনন্দের আস্বাদকেই একমাত্র হেতু হিসাবে উপলব্ধি করে বললেন:

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" (তৈত্তিরীয় উ॰ ॥ ৩/৬ ॥)

তত্ত্বজ্ঞানী দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ এই পরম সত্যেরই যেন ভাষ্যরূপ দিলেন তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে:

"...আমরা যেন কোনো-এককালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি।...তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না; বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।"

যাঁকে পাবার জন্য আমাদের এ ব্যাকুল বাসনা, তিনিই সর্ববিধ সৌন্দর্য, মাধুর্য ও আনন্দরসের বিষয়। কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ ব্যবধান আছে বলেই বাসনার অবসান ঘটে না, বরং সে বাসনা নিত্য বেড়ে চলে। এই সৌন্দর্যময় জগৎ আমাদের সেই এক হয়ে থাকার মিলনজনিত আনন্দকে "মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না,—আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না।"

"মুণ্ডকোপনিষৎ' ঈশ্বরকে বলেছেন পরম অমৃতস্বরূপ—'ব্রহ্ম পরামৃতম্'

(॥ ২/১/১০ ॥)। তিনি আদি-অন্তহীন প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যময় ভূমারসের আকর। আর সেই রস-সম্ভোগজনিত আনন্দই হ'ল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও ঘনীভূত আনন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথায় :

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" (তৈ॰ ॥ ২/৭/১ ॥)

এ কারণেই ঈশ্বরকে লাভের জন্য জীবের সাধনা বা ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার অবসান কোনদিনই ঘটে না। জীবের কাছে সেই পরম পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কঠোপনিষদের মন্ত্রস্রষ্টা ঋষি তাই উচ্চারণ করলেন :

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥" (কঠ ॥ ১/৩/১১ ॥)

["পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, তিনিই কাষ্ঠা। সেই পুরুষই জীবের সর্বোত্তম গতি বা গন্তব্য স্থান।"—অনুবাদ : অতুলচন্দ্র সেন।]

অতএব জীব ও ঈশ্বরের দ্বৈতলীলায় সেই রস-সম্ভোগজনিত নিত্য আনন্দলাভই জীবের একমাত্র লক্ষ্য বা কাম্য হওয়া উচিত।

কিন্তু জীবসত্তা ঈশ্বরেরই শরীরাংশ অর্থাৎ অদ্বয় সত্তা,—জীবের চিত্তে আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে এই প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি যদি থাকে, তাহলে লীলা-বাসনা সে চিত্তে আর থাকে না। ফলে রসাস্বাদের জন্য ব্যাকুলতাও সেক্ষেত্রে প্রবল হতে পারে না। সে কারণেই করুণাময় ঈশ্বর লীলারসকে পুষ্টিদানের উদ্দেশ্যে জীব-চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখেন প্রবল মায়ায়। সেই প্রবল মায়া হেতুই পার্থিব জগতের ভোগবিলাসের মোহে উদ্‌ভ্রান্ত জীব-চিত্তে ঈশ্বরের শরীরাংশ বা অদ্বয়-সত্তা হিসাবে আপনার স্বরূপজ্ঞানের বিলোপ ঘটে। ফলে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার জ্ঞানই জীবচিত্তে ধ্রুব হয়ে ওঠায় ঈশ্বরের প্রতি জীবের আকর্ষণ, ভক্তি কিংবা তাঁকে লাভের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা একান্ত স্বাভাবিকভাবেই নিত্য প্রগাঢ়তা লাভ করে। অন্যথায় ভক্তি-ব্যাকুলতার কোন অস্তিত্বই থাকত না। শঙ্করাচার্যের মত দু' একজন মহাপুরুষই কেবল ঈশ্বরের এই মায়াশক্তি ও তার দ্বারা জীবচিত্তের আচ্ছন্ন থাকার সত্যকে উপলব্ধি করে জীবের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং বলেছিলেন—"ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" আর এ কারণেই ঈশ্বর-সাধনার ক্ষেত্রে ভক্তি বা প্রেমের কোন উপযোগিতা তিনি স্বীকার করতে পারেননি। তাঁর সিদ্ধান্ত—রূপহীন আকাশে নীলবর্ণের

আরোপ যেমন ভ্রান্তির ফল, ঘটাকাশ অর্থাৎ ঘটের বাতাস মহাকাশ থেকে পৃথক—এ বোধও যেমন ভ্রান্ত কল্পনামাত্র, ভোক্তা জীবও সেরূপ ভ্রান্ত কল্পনার দ্বারাই ব্রহ্ম থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম থেকে জীব ভিন্ন নয়:

"নীলিমেব বিয়ত্যেষা ভ্রান্ত্যা ব্রহ্মণি সংস্থিতিঃ।
ঘটব্যোমেব ভোক্তায়ং ভ্রান্ত্যা ভেদেন ন স্বতঃ॥"[১]

(সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ, ২য় খণ্ড: সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী শাঙ্করদর্শনম্। পৃ. ৩০০)

সুতরাং শাঙ্করসিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবদেহের বিনাশে জীবাত্মার ব্রহ্মলীনতা স্বতঃসিদ্ধ. সে জন্য ভক্তি-সাধনার কোনই প্রয়োজন হয় না। তাঁর মতে ধর্ম-সাধনা আর কিছুই নয়, কল্পিত অর্থানুসারে 'তত্ত্বমসি'-বাক্যের অর্থালোচনা বা অবিরত 'সোঽহম্'—'আমিই সেই ব্রহ্ম'—এরূপ চিন্তা। সুতরাং জীবেশ্বরের লীলাজনিত আনন্দ ও জীবের ভক্তিচেতনা বা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-ব্যাকুলতার মনোভাব আচার্য শঙ্কর-প্রদর্শিত সাধনায় সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়েছে।

মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে তার কাম্যবস্তু ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চারটি ধারায় বিভক্ত। এগুলিকে তাই বলা হয় পুরুষার্থ বা বর্গ। ক্রম-উৎকর্ষের বিচারে বিন্যস্ত করলে ক্রমটি হয় কাম-অর্থ-ধর্ম-মোক্ষ। লৌকিক জগতের মানুষ-মাত্রেই সুখের প্রত্যাশী। এ সুখ দ্বিবিধ—দৈহিক ও আত্মিক। জগতের অধিকাংশ মানুষই ইন্দ্রিয়-ভোগবিলাস ও বিষয়-ভোগবিলাসে বাহ্য সুখের প্রত্যাশী। এঁদের কাছে পুরুষার্থ হিসাবে বিশেষভাবে আদৃত হয় কাম ও অর্থ। কামের সাধনা হ'ল স্থূল ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের সাধনা, যা একমাত্র

১. দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মা অজ ও অমর—এ সত্য প্রতিপাদন করতে গিয়ে ভাগবতকেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায়:

"ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশঃ স্যাদ্‌যথা পুরা।
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ॥" (ভা॰ ॥ ১২/৫/৫॥)

["যেমন ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ পূর্বের ন্যায় আকাশই হয়, সেইরূপ দেহ মৃত হইলে জীব পুনর্বার পরব্রহ্মসম্পন্ন হয়েন।"—অনুবাদ: শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজ সভাপণ্ডিত)।]

মনুষ্যেতর পশুর মধ্যে এবং পশুতুল্য মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। তাই চতুর্বর্গের মধ্যে কামের সাধনা হ'ল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সাধনা। কাম অপেক্ষা উৎকর্ষব্যঞ্জক অর্থের সাধনা জাগতিক ভোগ-প্রবৃত্তির জন্ম দিলেও তা কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ নয়; সম্মান, যশঃ প্রভৃতি সূক্ষ্ম মানস-সম্ভোগও অর্থের সাধনায় কাম্য হয়ে ওঠে। তাহলেও কাম ও অর্থ—এই দ্বিবিধ পুরুষার্থের সাধনাই ঐহিক সুখভোগের জন্ম দেয়। তৃতীয় স্তরে ধর্মের সাধকদের লক্ষ্য পারত্রিক সুখ,—মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে নিত্য ভোগসুখে অবস্থান। কিন্তু চতুর্থ স্তরের মোক্ষের সাধক পূর্ববর্তী তিন জাতীয় সুখের কোনটাই চান না; তাঁদের একমাত্র কাম্য দুঃখময় পার্থিব জগতের সকল বন্ধন থেকে চিরন্তন অব্যাহতি লাভ করে ঈশ্বরে সাযুজ্য-সামীপ্যাদি যে কোন প্রকার মুক্তি যা অন্য তিন পুরুষার্থের সাধনায় লাভ করা যায় না। ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে ধর্মের ফল শেষ হলে আবার পার্থিব জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, কিন্তু মোক্ষ-প্রাপ্ত সাধক পুনর্জন্মের হাত থেকে চিরন্তন অব্যাহতি লাভ করেন। এ কারণেই ধর্মাচার্যগণের মতে পুরুষার্থ হিসাবে কাম, অর্থ ও ধর্মের সাধনা গৌণ, কেননা তাতে চিরস্থায়ী সুখ জাগে না। সে বিচারে মোক্ষই চতুর্বর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম পুরুষার্থ। পারত্রিক সুখ-প্রত্যাশী জগতের অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায় তাই মোক্ষকেই পরম কাম্য বা চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছেন।

পার্থিব জগতের অগণিত জীব-সাধারণ ভক্তির পথ গ্রহণ করে ভক্তিরসের সাধনাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিণতিতে তাঁরাও জীবেশ্বরের অভেদ প্রাপ্তিকে অর্থাৎ মোক্ষলাভকেই পরম কাম্য জ্ঞান করে লীলারসের গৌরবমাধুর্যকে অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁদের কাছে বাহ্য জগতের দুঃখময়তাই সর্বাধিক প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁরা দেখেছেন—পার্থিব জীবন নানাবিধ ভোগের উপকরণ-জাত সুখ-বিলাসিতায় আপাত উজ্জ্বল বলে মনে হলেও সে সকল একান্তই সাময়িক, প্রকৃতপক্ষে তা দুঃখে পরিপূর্ণ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সহস্রবিধ দুঃখ-বেদনা-গ্লানি-জরা-ব্যাধির অপ্রতিরোধ্য ব্যাপক অস্তিত্বের অভিজ্ঞতাই সে সকল বস্তু-সুখকে আবৃত করে জীবচিত্তে প্রকট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ—'সুখে মোড়া দুঃখে ভরা'—পার্থিব জীবনের স্বরূপজ্ঞানই তাদের এ বিশ্বে পুনর্জন্মের হাত থেকে অব্যাহতি-লাভ ও ঈশ্বরে

সাযুজ্য মুক্তিলাভে অমৃতত্ব অর্জনকেই একান্ত কাম্য জ্ঞান করতে শিখিয়েছে। এই আত্মমুক্তির সাধনারই অপর নাম অদ্বৈত সাধনা। ঈশ্বর-সাযুজ্যের লক্ষ্যে দ্বৈতবাদী ভক্তি-সাধকের সাধনাও তাই পরিণতিতে হয়ে ওঠে অদ্বৈত-সাধনাই। আসলে জ্ঞান-ভক্তি, দ্বৈত-অদ্বৈত যে কোন মার্গই অবলম্বন করা হোক না কেন, ব্রহ্ম-সাযুজ্যের সাধনামাত্রেই অপরিণত পর্বে দ্বৈতবাদী কিন্তু পরিণামে অদ্বৈতবাদী। কেননা, জীব ও ব্রহ্মের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার বা দ্বৈত-সত্তার জ্ঞান না থাকলে পরিণতিতে উভয়ের অদ্বৈততত্ত্বের জ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না। সাধন-লক্ষ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে সেই অদ্বৈতত্ব অর্জনের বাসনা পূরণের জন্যই এ বিশ্বের ধর্মজগতে সাধন-বিধি বিষয়ক নানা ধর্মশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে যেগুলিতে ঈশ্বর-প্রাপ্তির সহায়ক সাধন-পদ্ধতি হিসাবে জপ-তপ, পূজা-পার্বণ, হোম-যজ্ঞ, ব্রত-তীর্থ, বিধিবদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ, অঙ্গলেপন, নানাবিধ মুদ্রা, দেবালয়াদি সংস্কার প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি নির্দেশিত হয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতে এগুলির যথাযথ পালনই প্রকৃত ধর্ম-সাধনা যা ঈশ্বর-প্রাপ্তি বা মুক্তির লক্ষ্যে একান্ত সহায়ক।

বলাই বাহুল্য—এরূপ সাধনায় জীব ও ঈশ্বরের লীলাজনিত রসসম্ভোগ বা আনন্দের আস্বাদ ঘটে না। কেননা আগেই বলা হয়েছে আত্মার পরিপূর্ণ স্বরূপের জাগরণ ও তার পূর্ণ বিকাশের সাধন লক্ষ্যেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ ধর্ম প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ,—অন্তরাত্মার বিকাশ, শাস্ত্র-নির্দেশিত নিতান্তই বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপাদির যথাযথ অনুষ্ঠান নয়। এ সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন যে একেবারে নেই, তা নয়; কিন্তু রসের আস্বাদে 'আনন্দী' হবার লক্ষ্যে মনের একাগ্রতা বিধানের জন্য এগুলি শুধুমাত্র উপলক্ষ্য বা আলম্বন মাত্র। অর্থাৎ মূল লক্ষ্য লীলারসের নিত্য আস্বাদ, হৃদয়ে রসময় পরম সুন্দরের উপলব্ধি। সে উপলব্ধি যতদিন না জাগে, ততদিনই আচারকৃত্যের উপযোগিতা। এ সত্য একান্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে 'কুলার্ণব তন্ত্রে':

"তাবত্তপো ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চনাদিকম্।
বেদশাস্ত্রাগম কথা যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দ্যতে॥" (Tantric Text,
Vol. V, Ed.—A. Avalon.)

অর্থাৎ তপ, ব্রতানুষ্ঠান, তীর্থকৃত্য, জপ, হোম, অর্চনা, বেদশাস্ত্র-আগমাদিপাঠ

ততদিনই করা কর্তব্য যতদিন না তত্ত্ব অর্থাৎ রসময় ভগবানের আস্বাদজনিত আনন্দ হৃদয়ে উপলব্ধ না হয়। ভাগবতে স্বয়ং কৃষ্ণের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছে ধর্মসাধনার এই মর্মগূঢ় কথা :

"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (ভা॰ ॥ ১১/২০/৯ ॥)

["যাবৎকাল পর্যন্ত কর্মাদি বিষয়ে নির্বিণ্ণ না হয়, অথবা যতদিন পর্যন্ত আমার কথাদি শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মে (অর্থাৎ হৃদয়ে রসের আস্বাদ না জাগে), তাবৎকাল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করিবে।"

—অনুবাদ : শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন।]

এ কারণেই একটি সুন্দর উপমার আশ্রয়ে কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হয়েছে—মলয় বাতাস প্রবাহিত হলে তালবৃন্ত সঞ্চালন দ্বারা সৃষ্ট বাতাসের যেমন আর কোনই প্রয়োজন থাকে না, তেমনই পরম তত্ত্বের (রসের) আনন্দানুভূতিতে মন নিমগ্ন হলে শাস্ত্রাচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, যোগ-ধ্যান-নিয়মাদি সকল কিছুই তখন অবান্তর।[২] অথচ জগতের অধিকাংশ ধর্ম-সম্প্রদায় সাধনার যা উপলক্ষ্য, সেই আচারাদি বিধিনিষেধকেই একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞানে পরিণত করায় ধর্ম-সাধনা হয়ে ওঠে নিতান্তই আচার-সর্বস্ব। এক কথায়, এ ধরণের ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির সাধ্য বা চরম লক্ষ্য হ'ল ঈশ্বরে সাযুজ্য মুক্তি, আর তার সাধন হ'ল শাস্ত্র-নির্দেশিত আচার-অনুষ্ঠানাদি ক্রিয়াকলাপ। সমগ্র বিশ্বে দু'একটি ব্যতীত সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ই ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই মতেই বিশ্বাসী। কিন্তু এই সকাম বিধিমার্গীয় সাধনায় ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের গভীর আকর্ষণ ও তজ্জনিত মমত্বময় প্রেমবোধ গড়ে উঠতে পারে না।

এ বিচারে, বৈধী মার্গের মোহমুক্ত যে ক'টি ধর্ম-সম্প্রদায় ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের রাগভক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন, তাদের স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব-মর্যাদা একান্ত বরেণ্য হয়ে উঠেছে। যেমন, খ্রীষ্টীয় মিষ্টিক সাধনা,

২. "সম্প্রাপ্তে জ্ঞানবিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদি সংস্থিতে।
লব্ধে শান্তিপদে দেবি ন যোগো নৈব ধারণা।
পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্।
তালবৃন্তেন কিং কার্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥" (কুলার্ণব তন্ত্র)

সূফী সাধনা, ভারতের আড়বার সাধকগণের প্রেম সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা প্রভৃতি। সাধনক্ষেত্রে বৈধী মার্গের বাহ্য ক্রিয়া-কলাপকে এঁরা প্রাধান্য দেননি, ঈশ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ তত্ত্বজ্ঞান লাভকেও পরমার্থ হিসাবে গ্রহণ করেন নি। এঁরা ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত রাগ-ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে অন্তরে প্রেমরসের অনুভবকেই একমাত্র সাধন জ্ঞান করেছেন। বাইবেলে বর্ণিত রাজা সলোমনের সাধনা, সেণ্ট্ তেরিজা প্রভৃতির খ্রীষ্টীয় মিষ্টিক সাধনা, রাবেয়া-ধূল্‌নান-হল্লাজ-কালাবাজি প্রভৃতি সূফী সাধক-সাধিকাগণের সাধনা, আণ্ডাল-নম্মালোয়ার-পেরিয়ালোয়ার প্রভৃতি দ্বাদশ আলোয়ার বা আড়্বার সাধকের ভক্তিসাধনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে পরম প্রিয় বা প্রিয়া জ্ঞানে তাঁর প্রতি রাগমার্গের প্রেমসম্পর্ক স্থাপনায় হৃদয়ের ব্যাকুল প্রেমাকাঙ্ক্ষাই সাধনক্ষেত্রে প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম ব্যতীত আর সকল দৃষ্টান্তেই সেই প্রেমভাবনা কেবল সাধনমার্গেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, সাধন-লক্ষ্য বা সাধ্যে উত্তরিত হতে পারেনি সেক্ষেত্রে তাঁদের একান্ত কাম্য হয়ে উঠেছে ঈশ্বরসত্তায় জীবসত্তার বিলোপ-সাধনে অদ্বৈত-মুক্তি বা মোক্ষলাভ। এ জাতীয় ভক্তিসাধনা তাই নিরুপাধি অর্থাৎ অহৈতুকী নয়। ঐহিক ভোগবাসনা থেকে মুক্ত হলেও মুক্তিলাভে পারত্রিক আত্মসুখের প্রত্যাশাই এ জাতীয় সাধনার লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্যদেব-আশ্রিত বৈষ্ণব ধর্মসাধনার স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা অপরিসীম, কেননা বৈষ্ণব ধর্ম তার সাধন-ক্ষেত্রে জীব ও ঈশ্বরের লীলারসের আস্বাদ-বাসনাকেই দিয়েছে একমাত্র মর্যাদা। লীলা দ্বৈত অস্তিত্ব ভিন্ন হয় না, সুতরাং মোক্ষের অদ্বৈতচেতনায় দ্বৈতসাধনার সুতরাং লীলার তথা রসাস্বাদেরও সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। এ কারণেই আত্মমুক্তি বা মোক্ষের সাধনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা দূরে থাক, চতুর্বর্গের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট জ্ঞান করা হয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনে :

"তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥" (চৈতন্যচরিতামৃত ॥১/১/৫১॥)

শুধু তাই নয়, ভোগ ও মুক্তি-বাসনাকে পিশাচী জ্ঞান করে মুমুক্ষু বিশ্বের কাছে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন :

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ?॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ
শ্রীরূপ গোস্বামী॥ ১/২/২২॥)

কারণ ধর্মার্থকামের সাধনায় আত্মসুখের চিন্তা প্রবল হলেও ঈশ্বর সেবার বাসনা ও অধিকার কোনটাই লুপ্ত হয় না, কেননা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার ভেদ-বোধ এবং পুনর্জন্মের সম্ভাবনা—এই ত্রি-বর্গের সাধনায় বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু মোক্ষের সাধনায় পরমাত্মায় জীবাত্মার বিলোপ ঘটায় ঈশ্বর সেবার বাসনা ও অধিকার এবং পুনর্জন্মের সম্ভাবনা কোনটাই থাকে না। ফলে মোক্ষপ্রাপ্তদের অতৃপ্ত ভক্তিবাসনা পূরণের সকল পথই সেখানে রুদ্ধ হয়ে যায়,[৩] কেননা সেজন্য স্বতন্ত্র দেহ-আত্মার একান্তই প্রয়োজন। এ কারণে ভাগবতেও মুক্তিকে ভক্তি-মর্যাদা লঙ্ঘনকারী এবং মুক্তিকামীকে মূঢ় বলে ভর্ৎসনা করা হয়েছে :

"ভক্তির্ভগবত সেবা মুক্তিস্তৎপদলঙ্ঘনম্।
স মূঢ়ঃ সেবকাদন্যো মুক্তিং নির্বাণমিচ্ছতি॥"

ভাগবতের এই উপলব্ধিকেই বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ মর্যাদা দিয়ে ভক্তি বা প্রেমকেই চতুর্বর্গের ঊর্ধ্বে করে তুলেছে পরম পুরুষার্থ, যে কারণে তা পঞ্চম পুরুষার্থ হিসাবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় :

"কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

৩. মোক্ষ-প্রাপ্তদেরও (আত্মারাম) ভক্তিবাসনা ভক্তির অনন্য রস-মাধুর্যের কারণে বিলুপ্ত হয় না, ভাগবতের শ্লোকেই সে দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল :

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" (ভা° ॥ ১/৭/১০॥)

["যাঁহারা বন্ধনমুক্ত—আত্মারাম, সেইরূপ মুনিগণও কোন কামনা না করিয়াই ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন—শ্রীহরির এমনই গুণ যে, সকাম নিষ্কাম—সকল পুরুষই তাঁহাকে ভজনা করিতে ভালবাসে।"]

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্যরস করায় আস্বাদন॥"

(চৈ. চ. ॥ ১/৭/৮১, ১৩৭ ॥)

আর এই লীলা-মাধুর্যরসের আস্বাদ কারণেই বৈষ্ণব সাধন-ক্ষেত্রে—

"সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥" (ঐ ॥ ২/৬/২০১ ॥)

ঈশ্বরের সঙ্গে মমত্বময় প্রিয়ত্বের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে যে গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, মোক্ষ বা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির মধ্যে তার কণামাত্রও মেলে না। তাই সর্বত্যাগী মুনি-ঋষিদের যে সাধনপদ্ধতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে বিবেচিত হয়, সেই শান্তরসের সাধনাদর্শকে প্রাথমিক সোপান-স্বরূপ জ্ঞান করে তার ক্রম গভীর বিবর্তনে মমত্ববোধের রাগ-সম্পর্কযুক্ত দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য প্রেমের সাধনা এবং ক্রমে তাকেও অতিক্রম করে প্রেমের সর্বোচ্চ রূপ মধুর রস ও তার সর্বশেষ ঘনীভূত পরিণতি মহাভাবের আদর্শকে খুঁজে পেয়েছেন বৈষ্ণব সাধক, যা রাধাতনু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ সাধনাচরণে প্রকট হয়ে উঠেছিল জগৎবাসীর সমক্ষে।

শ্রীরাধা ও রাধাপ্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির সাধনাকে আশ্রয় করে রাগমার্গের সাধনা বিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ ও রস লাভ করেছে বৈষ্ণব ধর্মসাধনায়। এ সাধনা একদিকে সকল প্রকার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে একান্ত গৌণ জ্ঞান করে রসমাধুর্যময় ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের অতীন্দ্রিয় ও অহৈতুকী প্রেমানুরাগকেই যেমন একমাত্র সাধন বা সাধনপথ হিসাবে গ্রহণ করেছে, তেমনি অপরদিকে সাধ্য বা সাধন-লক্ষ্য হিসাবেও গ্রহণ করেছে মুক্তি নয়, এমনকি জাগতিক দুঃখ-বেদনার অবসানও নয়, শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রীতিবাসনায় তাঁর প্রতি প্রেমসেবার নিত্য অধিকার অর্জন অর্থাৎ লীলার নিত্যত্ব। বৈষ্ণব সাধনায় তাই সাধন ও সাধ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমকেই সর্বস্ব করে তোলা হয়েছে। জাগতিক দুঃখ-বেদনা-জ্বালা-বিচ্ছেদদহন প্রভৃতি বৈষ্ণব-সাধকের চিত্তকে বিমর্ষ করেনি, বরং উল্লসিতই করেছে, কারণ দুঃখ-বেদনা-বিচ্ছেদভারাতুর হৃদয়েই প্রেমরসের আস্বাদ প্রগাঢ় হয়ে ওঠে;—কবি চণ্ডীদাসের পদাবলীতে—"যার যত জ্বালা তার ততই পীরিতি" কিংবা—

"অধিক জ্বালা যার অধিক পীরিতি" প্রভৃতি উপলব্ধি স্মরণীয়। (দ্রঃ চণ্ডীদাসের পদাবলী: সম্পাদনা বিমানবিহারী মজুমদার/ পদ-সংখ্যা—১৭৩, ১৯৫)। ঈশ্বরের প্রতি বৈষ্ণব সাধকের প্রার্থনা আছে, কিন্তু তাও আত্ম-সুখবাসনা-সঞ্জাত নয়, তা কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বা অহৈতুকী ভক্তি-বাসনারই অধিকার প্রাপ্তির প্রার্থনা। তাই বৈষ্ণব সাধকের প্রার্থনায় রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীচৈতন্যদেব জন্মান্তরের হাত থেকে অব্যাহতি চাননি, ধন-জন-যশঃ প্রভৃতি কোন কিছু পার্থিব সম্পদ কামনা করেন নি, বিষ্ণু-পুরাণের ভক্ত প্রহ্লাদের মত একমাত্র কাম্য করে তুলেছেন জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী অহৈতুকী প্রেমভক্তির অধিকার:

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" (শ্রীশিক্ষাষ্টক ॥ ৪ ॥)

["হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।"—অনুবাদ: শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ।][৪]

৪. বিষ্ণুপুরাণে ভক্ত প্রহ্লাদের প্রার্থনাও ছিল অনুরূপ:
"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥" (॥ ১/২০/১৮-১৯ ॥)

["হে নাথ অচ্যুত! যে যে সহস্র যোনিতে পরিভ্রমণ (জন্মগ্রহণ) করি, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি আমার সবদা ঐকান্তিক ভক্তি হয়। অবিবেকী (বিষয়াসক্ত) লোকদিগের বিষয়ভোগে যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তোমার স্মরণে আসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি অপসৃত না হউক; অথবা হে লক্ষ্মীপতে! তোমার স্মরণে একান্ত আবিষ্ট আমার হৃদয় হইতে সেই বিষয়-প্রীতি নির্গত হউক।"—অনুবাদ: আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন।]

বৈষ্ণব সাধনার সর্বস্তরে এই অহৈতুকী প্রেমই পূর্ণ বিকশিত হয়ে মহাভাবের আদর্শে পরিণতি লাভ করেছে যার অধিকারে সাধিকা-শিরোমণি রাধা বিশ্বের সমগ্র ধর্মসাধনার ইতিহাসে হয়ে উঠেছেন অদ্বিতীয়া ও বরেণ্যতমা।

অথচ ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ঈশ্বরের প্রতি এরূপ রাগ-সাধনার ইঙ্গিত ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্র বৈদিক সাহিত্যেই মেলে। যদিও সাধারণভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যায়—বৈদিক সাহিত্যের ধারা অবলম্বনে ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণ মার্গের যে দুটি ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে, সে ধারা দুটি কাম-অর্থ-ধর্ম-মোক্ষ অর্থাৎ চতুর্বর্গের সাধনাতেই সীমাবদ্ধ। বৈদিক সংহিতা অংশে নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম ও সকাম যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐহিক ও পারত্রিক ভোগবাসনায় সাধারণতঃ প্রবৃত্তিমার্গের ধর্মার্থকামের সাধনা এবং পার্থিব ভোগবাসনা ত্যাগ, জীব-ঈশ্বর-সৃষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা তত্ত্বজ্ঞান অর্জন, যোগাচার প্রভৃতির মাধ্যমে উপনিষদ্‌সমূহে নিবৃত্তিমার্গের সাধনা বিকাশ লাভ করেছে। অর্থাৎ সাধারণ বিচারে ঈশ্বরের প্রতি রাগময় প্রেমভক্তির রূপটি বৈদিক সাহিত্যের সংহিতা বা উপনিষদ কোন স্তরেই প্রধান হয়ে ওঠেনি। তাহলেও উপনিষদের জ্ঞানমার্গীয় মন্ত্রসমূহের বিরল ব্যতিক্রম কোন কোন অংশে ঋষির অনুভবে নির্বিশেষ অরূপ ব্রহ্ম সবিশেষ রূপময় ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন এবং প্রচলিত সাধন-ভাবনার বাইরে তাঁর প্রতি রাগময় প্রেমসম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিতও সে সকল অংশে ফুটে উঠেছে। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নির্দেশ শুনি—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।" (॥১/৪/৮॥) অর্থাৎ আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করবে। মুণ্ডকোপনিষৎ সেই অন্তরস্থ আত্মাকেই অমৃতলাভের উপায় হিসাবে জগতের সমস্ত কিছু ভোগ্য অপেক্ষা পরম প্রিয়ত্বে অধিষ্ঠিত করে বলেছেন ঃ

"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥"

(মুণ্ডক উ° ॥ ২/২/৫ ॥)

["(তোমাদের এবং সর্বপ্রাণীর অন্তরস্থ) এক অদ্বিতীয় সেই আত্মাকেই জান এবং তাঁহাকে জানিয়া আত্মজ্ঞানবিরোধী বাক্যাবলী

ত্যাগ কর। এই আত্মজ্ঞানই অমৃত লাভের উপায়।"—অনুবাদ : অতুলচন্দ্র সেন।]

বৃহদারণ্যকের পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রটিরও অংশান্তরে পরমাত্মার বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁকে পুত্র, বিত্ত ও অন্যান্য সকল প্রিয়বস্তু অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করা হয়েছে :

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

এমনকি ভক্তের সাধনায় কান্তাভাবের ইঙ্গিত পর্যন্তও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিম্নোধৃত মন্ত্রটিতে :

"...যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষোক্তা ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং ···।" (বৃ° উ° ॥ ৪/৩/২১ ॥)

["যেমন লোকে প্রিয়া রমণী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানে না, তেমনি এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানিতে পারে না।" —অনুবাদ : মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন।]

কিন্তু একান্ত বিস্ময়ের কথা, সাধনক্ষেত্রে রাগভক্তির এ সকল উপদেশ-নির্দেশ প্রাক্-চৈতন্য যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালে খুব একটা বিবর্তন কিংবা বিকাশ লাভ করেনি। ফলে ঈশ্বরের রসত্ব, আত্মময়তার বহুল সন্ধান উপনিষদ্ দিলেও প্রেমভক্তিমার্গে ঈশ্বরের আনন্দঘন মাধুর্যময় সে রসত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা, লীলারসের আস্বাদ-ঘন পূর্ণ স্বরূপের বিকাশ পঞ্চদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত ধর্ম-বিষয়ক কোন সাধনা কিংবা সাহিত্যেই ঘটেনি।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণ-মার্গভিত্তিক চিরায়ত ধর্মসাধনার ধারা দুটি আমূল রূপান্তরিত হয়ে গেছে বৈষ্ণব ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে। বৈষ্ণব দর্শনের পূর্ববর্তী দর্শনসমূহে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের ভেদ বা অভেদাত্মক সম্বন্ধই শুধু বিচার করা হয়েছে, তার সঙ্গে লীলারসের সংযোগ ঘটেনি। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়কারী গীতায় ভক্তিচেতনার এবং ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ে লীলারসের বিস্তার ঘটলেও পরিণামে উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তিভাবনার প্রাধান্য-বিস্তারে সে ভক্তি বা লীলারসের আস্বাদ চিরস্থায়িত্ব পায়নি। সেই লীলা-

রসকেই চিরস্থায়িত্বের পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা দিয়ে বৈষ্ণব দর্শন কেবল ঐশী শক্তি-সম্পন্ন নির্বিশেষ পরব্রহ্মকে তাঁর সকল ঐশ্বর্যাত্মক দৈবীপদ থেকে মুক্ত করে মর্ত্য-বৃন্দাবনে 'গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর'-মূর্তিতে নরলীলাকারী কেবল মাধুর্যময় কৃষ্ণে রূপান্তরিত করে সাধনক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে স্থাপন করেছেন মিলন-বিরহের অনাদ্যন্ত লীলা,—যা নিত্য নূতন রসাস্বাদে মনকে বিভোর করে তোলে। আর সেই নিত্য-লীলার নিরীখেই 'নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য' প্রেমের প্রতিষ্ঠা, যা যুগপৎ ভেদ ও অভেদাত্মক তথা বিচ্ছেদ ও মিলনাত্মক। একদিকে রসের অসীমতা মিলনের মধ্যেও সাধকের আস্বাদ-বাসনাকে প্রশমিত না করে নিত্য বাড়িয়ে তোলে, রসের ব্যাপ্তি-গভীরতা-রহস্যময়তার অবসান ঘটে না—যে অনুভব অতুলনীয় হয়ে উঠেছে কবি কবিবল্লভের রাধার কণ্ঠে :

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥"

(বৈষ্ণব পদাবলী॥ ৫/২২॥)

অপরদিকে বিরহের নিবিড় ধ্যানলোকে একান্ত কৃষ্ণময়তা ভেদের মধ্যেও অন্তরে জাগিয়ে তোলে মিলনের আস্বাদ-মাধুর্য, যে আস্বাদ নিয়ে কবি গোবিন্দদাসের রাধা বলতে পারেন—"হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল প্রেম প্রহরী রহুঁ জাগি।" বৈষ্ণব দর্শনে জীবেশ্বর সম্পর্ক বিচারে তাই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের প্রতিষ্ঠা, যার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে সাধ্য-সাধনসর্বস্ব

প্রেমলীলারসকেই কেন্দ্রমূলে স্থান দিয়ে। সেই প্রেমরসের আস্বাদ নিয়ে বৈষ্ণব সাধকের মত এমন প্রাণময় কথা আর কেউ বলতে পারেন নি :

"নয়ন-পুতলী করি লইলুঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুলশীল অভিমান ॥
... ...
খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।"
(মুরারি গুপ্ত / পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ॥ ১৬৬ ॥)

এই প্রেমই বৈষ্ণব সাধকের ভক্তি। এ ভক্তি আত্মসুখ কিংবা আত্ম-মুক্তির বাসনায় নয়, শুধু 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'য়। অস্বীকার করা যায় না বৈষ্ণব সাধনার লীলা কাহিনীতে রাধার কৃষ্ণকে দেহ নিবেদনের উল্লেখ মেলে, কিন্তু তাও বিন্দুমাত্র আত্মসুখের বাসনায় নয়, শুধুমাত্র কৃষ্ণেরই সুখের কারণে যা জীব সাধকের সম্পূর্ণ শরণাগতির আদর্শকে, প্রেমাস্পদের প্রীতি বিধানে সমস্ত আত্মাভিমান পরিত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শকেই সুপরিস্ফুট করে। দেহ-দান প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় রাধার উক্তি স্মরণীয় :

"মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ্ দান।" (চৈ. চ. ॥ ৩/২০/৫০ ॥)

সুতরাং বৈষ্ণব-সাধনার এ প্রেম সম্পূর্ণ নিরুপাধি যা বৈষ্ণব ভক্তি-সংজ্ঞার প্রথম কথা :

"সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥"
(ভ. র. সি. ॥ ১/১/১২ ॥ উদ্ধৃত শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র শ্লোক ॥)

["সর্বোপাধি (অন্যাভিলাষিতা)-পরিশূন্য ও ভগবৎপরায়ণ হইয়া (আনুকূল্যময় চেষ্টা দ্বারা) নির্মল (জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত-

ভাবে)—ইন্দ্রিয় (দেহ ও অন্তঃকরণ) দ্বারা হৃষীকেশের (শ্রীকৃষ্ণের) সেবাই মুখ্যতঃ ভক্তি বলিয়া কথিত হয়।"

—অনুবাদ : শ্রীহরিদাস দাস।][৫]

না হলে শ্রীরাধার কণ্ঠে এমন কথা শোনা যেত না ঃ

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥[৬]
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তাঁর রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া কাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ্ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা করোঁ তারে সুখী ॥"

(চৈ. চ. ॥ ৩/২০/৪৫-৪৪ ॥)

মহাভাবের সাধিকা রাধা ব্যতীত প্রেমের এরূপ গৌরব-দৃষ্টান্ত সমগ্র বিশ্বের সাধন-ইতিহাসেই সম্পূর্ণ দ্বিতীয় রহিত।

মুক্তিভাবনা নয়, অনন্য সদৃশ এই নির্মল ও নিরুপাধি প্রেমভাবনাই বৈষ্ণব ধর্মের একমাত্র সাধনা ও সাধন-লক্ষ্য।

---

৫. শ্রীরূপ গোস্বামী-কৃত উত্তমা-ভক্তির সংজ্ঞাও শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের ভক্তি-সংজ্ঞাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে :

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥" (ভ. র. সি. ॥ ১/১/১১ ॥)

৬. অর্থাৎ—সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ বা সর্বাধিক বরণীয় সুখ।

॥ বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাপারম্যবাদ ও কবি জয়দেব ॥

সমগ্র বিশ্বের ভক্তিসাহিত্য ও ভক্তি-সাধনার ইতিহাসে বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমভক্তির সমতুল আদর্শ এ পর্যন্ত দ্বিতীয় আর কোথাও চোখে পড়ে না। অথচ ঈশ্বরের প্রতি রাগাত্মিক প্রেম-সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সুগভীর ভক্তি-সাধনার নজির খুব কম নয়। খ্রীষ্টীয় মিষ্টিক ধর্ম-সাধনায় রাজা সলোমন, সেণ্ট্ তেরিজা, সেণ্ট্ আসিসি প্রভৃতি সাধক-সাধিকা সেই রাগাত্মিক ভক্তি-সাধনার প্রথম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশ্ববাসীর কাছে খ্রীষ্টধর্মকে এক পরম গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অবশ্য রাগাত্মিক ভক্তি-সাধনার স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ বিকাশ না ঘটলেও খ্রীষ্টধর্মেরও বহু পূর্বে তার আভাস সর্বপ্রথম মেলে ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যেই। সকাম যাগ-যজ্ঞ-মন্ত্রোচ্চারণের ব্যাপকতার মধ্যেও বিরল-দৃষ্টান্ত কোন কোন মন্ত্রে সে সকল আনুষ্ঠানিকতার ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর রাগসম্পর্ক স্থাপনের বাসনা কোন কোন ঋষিচিত্তকে উতলা করে তুলেছিল। যেমন, গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষির একটি ঋক্ মন্ত্রে দেখি—দেবতা পূষাকে আপনার কান্ত এবং আপনাকে কান্তের হর্ষকারিণী বা হ্লাদিনী-সত্তা কান্তা জ্ঞান করে তাঁর প্রতি একান্ত প্রার্থনা জানিয়েছেন :

"তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ম্।
বধূয়ুরিব যোষণাম্॥"

(ঋগ্বেদ সংহিতা ॥ ৩/৬২/৮ ॥)

["হে পূষা, আমার সেই স্তুতি গ্রহণ কর। স্ত্রীপ্রিয় ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রীর অভিমুখে আগমন করে, সেইরূপ তুমি হর্ষকারিণী এই স্তুতির অভিমুখে আগমন কর।"— অনুবাদ : রমেশচন্দ্র দত্ত।]

আর নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটিতে অশ্বিদ্বয়কে সম্বোধন করে কক্ষীবৎ-কন্যা ঘোষা-ঋষি যজ্ঞের হবি গ্রহণকারী দেবতার প্রতি অন্তরের অপ্রতিরোধ্য প্রগাঢ় প্রেম-রাগকেই যেন কান্তাভাবের স্বকীয়া ও অবৈধ পরকীয়া উভয়বিধ প্রেমের উপমায় পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন নির্বিশেষ যজ্ঞসাধক মাত্রেরই অন্তরে :

"কো বাং শবুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥"
(ঐ ॥ ১০/৪০/২ ॥)

["যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে, অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞকালে তদ্রূপ সমাদরের সহিত কে তোমাদিগকে আহ্বান করে?"]

এ ধরণের দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর না হলেও বৈদিক সংহিতায় মাঝে মাঝেই কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আরব রাষ্ট্র থেকে ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রম-সম্প্রসারিত সুফী সাধনাদর্শ[১], বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনাদর্শ, দক্ষিণ ভারতের আণ্ডাল প্রভৃতি দ্বাদশ আলোয়ারের ভক্তি-সাধনা, উত্তর ভারতে মীরাবাঈ-এর কৃষ্ণপ্রেমের সাধনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই রাগাত্মিক প্রেম-সম্পর্ক স্থাপন ভক্তি-সাধনার মুখ্য উপজীব্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোথাও বৈষ্ণবের 'সাধিকা-শিরোমণি' রাধার মত সে প্রেমসাধনা পরিণতিতে আত্মমুক্তির বাসনাশূন্য অর্থাৎ শুধুমাত্র কান্তরূপা ঈশ্বরের প্রীতি বা সুখ-সম্পাদনের বাসনামাত্রে পরিণত কেবলা বা অহৈতুকী হয়ে উঠতে পারেনি, পারেনি সেই প্রেম-সাধনাকেই পরম ও একমাত্র পুরুষার্থ জ্ঞান করে সাধন ও সাধ্যকে একাকার করে তুলতে। কেননা, অন্যান্য সর্বক্ষেত্রেই প্রেম সাধনার পরিণতিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে সাধকের মুক্তি-বাসনার পরিপূর্তি। খ্রীষ্টীয় মিষ্টিক সাধনার নাঙ্গা[২], সুফী-

---

১. মূল সুফী-সাধনায় জীবেশ্বর প্রেম সম্পর্কের স্বরূপটি বিপরীত ভাবের অর্থাৎ ঈশ্বরকে সেখানে জ্ঞান করা হয় প্রেমিকা বা কান্তারূপে ('মাশুক'), আর ভক্ত-সাধক আপনাকে জ্ঞান করেন প্রেমিক বা কান্ত ('আসেক')। এ সাধনার লক্ষ্য কান্ত-সত্তার বিলোপে কান্তায় চিরস্থায়ী সাযুজ্য—'ফনা-ওয়া-বাকা।'

২. জীবসাধক ও ঈশ্বরের চিরস্থায়ী মিলন, যে বাসনা সেন্ট্ তেরিজার কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনি :

"Please, Thee to unite me to Thyself
... ...
I will rejoice in nothing
Till I am in Thine arms."

কিংবা বাইবেলে সাধক সলোমনের প্রার্থনা সঙ্গীতে :

"Set me as a seal upon your heart,
as a seal upon your arm ; ...

সাধনার 'ফণা-ওয়া-বাকা'[৩], সহজিয়া বৌদ্ধ-সাধনার প্রজ্ঞোপায়সিদ্ধি বা সহজের উপলব্ধি[৪] —সবই পুনর্জন্ম-রহিত ঈশ্বর-সাযুজ্য বা মুক্তিরই বিকল্প শব্দমালা মাত্র। সাধিকা আণ্ডাল কিংবা মীরাবাঈ-এর প্রেমভক্তিরাগের জীবনকাহিনীও পরিসমাপ্তি লাভ করেছে বিবাহিত স্বামী-জ্ঞানে যথাক্রমে শ্রীরঙ্গম্ বা শ্রীরঙ্গস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে সাযুজ্য প্রাপ্তিতে,—যা প্রেম-সাধনার লক্ষ্য হিসাবে একমাত্র মুক্তি-ভাবনাকেই প্রচার করেছে।

এই পরিস্থিতিতে বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনে বর্ণিত ও বিশ্লেষিত রাধা-প্রেমাদর্শের নিঃসীম ব্যাপ্তি ও গভীরতা, সকল স্বার্থ-কলুষ বাসনামুক্ত তার সুপবিত্রতা, অবিনাশী প্রেম-সংরক্ষণে তার নিত্য বিরহ-গভীর আদর্শ তথা প্রেমের পরম-পুরুষার্থতা প্রভৃতি তাকে সন্দেহাতীত ভাবে করে তুলেছে বিশ্বের বরেণ্যতম ভক্তি-প্রেমাদর্শ। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ জীবনাচরণে সেই রাধাপ্রেমাদর্শই ভাব-কল্পনার বিমূর্ত স্বর্গ থেকে মর্ত্য-কায়ারূপে স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ হয়ে একান্ত প্রামাণ্য হয়ে উঠেছিল বিশ্বজনের কাছে। এই রাধা ও রাধা-প্রেমরস-তনু শ্রীচৈতন্যদেবের রাগাত্মিক কৃষ্ণপ্রেমভক্তির আদর্শকে কেন্দ্রমূল করে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের ধর্ম, দর্শন, সাধনা ও সাহিত্যধারার সুবিশাল বিস্তার, তা বিবর্তনের উচ্চতম গৌরবপ্রাপ্তিতে, স্বাতন্ত্র্যে-মহিমায়-রসোজ্জ্বলতায়

৩. "Fana-wa-baqa—dying to self and living in God. self annihilation in God and subsistence in God."

—Sufism and Vedanta, Part-II : Dr. Roma Choudhury. p. 44

৪. প্রকৃতি প্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞা-পারমিতা ও পুরুষ উপায়ের স্থায়ী মিলনই প্রজ্ঞোপায়-সিদ্ধি বা সহজানন্দলাভ অর্থাৎ মোক্ষ। 'আর্য্যবিমলকীর্তি' নামক বৌদ্ধ শাস্ত্রের নির্দেশ স্মরণীয়—"প্রজ্ঞা সহিত উপায়ো মোক্ষঃ। উপায় সহিতা প্রজ্ঞা মোক্ষঃ।···তাদাত্ম্যং চানয়ো সদ্‌গুরূপদেশতঃ প্রদীপালোকয়োরিব সহজ সিদ্ধিমেবাধিগম্যতে।" অর্থাৎ সদ্‌গুরুর সহায়তায় প্রদীপ ও তার আলোকের অঙ্গাঙ্গিত্বের ন্যায় প্রজ্ঞা ও উপায়ের একাত্মতার উপলব্ধিই সহজানন্দ লাভ। এ কারণেই সহজের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন—"In Sahaja there is no duality, it is perfect like the sky. ···The Sahaja bliss in only oneness of emotions, it is oneness in all." (Obscure Religious Cults / p. 82)

ও সে রসাস্বাদের গভীরতায় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসেই অনন্যসাধারণ মর্যাদার আসনটি চিরস্থায়ী করে নিতে পেরেছে।

শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বৈষ্ণব-ধর্মের এই সর্বাতিক্রমী মর্যাদার মূলে রয়েছে তার সাধ্য-সাধনসর্বস্ব পরম পুরুষার্থস্বরূপ প্রেমভক্তির সর্বাপেক্ষা বিবর্তিত ও ঘনীভূত পরিণতি মহাভাবের আদর্শ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়,

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম মহাভাব॥"[৫]

(চৈতন্যচরিতামৃত॥ ১/৪/৬৯॥)

সন্দেহ নেই এ মহাভাব গৌড়ীয় সাধনাদর্শের একান্ত নিজস্ব, কিন্তু এ মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় উত্তরণের পথে পূর্ববর্তী সাধনা ও সাহিত্যের ভক্তি বা প্রেমের আদর্শ-সমূহকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শ অস্বীকার বা অবহেলা কোনটাই করেনি, বরং তাদের দ্বারা আপনাকে নানাভাবে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। পূর্ববর্তী আদর্শ-সমূহের মধ্যে মহৎ যা কিছু, সেগুলিকে আত্মস্থ করে নিয়েই গৌরবময় বিবর্তনে তার একান্ত স্বাতন্ত্র্য অর্জন। সুতরাং গৌড়ীয় সাধনাদর্শের পরিপোষণ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আদর্শ-সমূহের অবদান খুব কম নয়। পরিপোষণকারী সেই পূর্বাদর্শ-গুলিও তাই বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনে পেয়েছে পরম শ্রদ্ধা-মর্যাদার গৌরবময় আসন। চৈতন্যচরিতামৃতকারের বর্ণনায় সে পূর্বাদর্শের স্রষ্টা কবি ও কাব্যের তালিকাটি হ'ল—"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি[৬], কর্ণামৃত[৭] শ্রীগীতগোবিন্দ।"(২/২/৬৬)। এঁদের মধ্যে কবি জয়দেবের কাব্য 'শ্রীগীত-

---

৫. চৈতন্যচরিতামৃতে মনোজ্ঞ উপমাসহ বিবর্তনের পূর্ণ ধারাটি নিম্নরূপ :

"সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা-সিতা-মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর॥" (॥ ২/১৯/১৫১, ৫৩॥)

৬. রামানন্দ রায় রচিত 'জগন্নাথবল্লভম্' নাটক।

৭. লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্' কাব্য।

গোবিন্দেই সর্বপ্রথম কৃষ্ণের প্রতি স্বাতন্ত্র্যহীন তথা গোষ্ঠীগত প্রেমের অধিকারিণী গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধা শুধু যে স্বাতন্ত্র্যময়ী ও বিশিষ্টা হয়ে উঠেছেন তাই নয়, সমগ্র গোপীকুলের মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্যা ও কৃষ্ণের মুখ্যতমা প্রেয়সী। সে বিচারে বৈষ্ণব সাধনা ও সাহিত্যের মহাজন কবিদের মধ্যে 'শ্রীগীতগোবিন্দম্'-কাব্যের স্রষ্টা কবি জয়দেব নিঃসন্দেহে সে গৌরবের সর্বপ্রথম দাবিদার হিসাবে বরেণ্যতম।

গীতগোবিন্দে কৃষ্ণের জীবনস্বরূপা শ্রীরাধার অনন্যসাধারণ সে মর্যাদার পরিচয় লাভের পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের ও বৈষ্ণব সাহিত্য-বর্ণিত শ্রীরাধার স্বরূপ ও তাঁদের প্রেমাদর্শটিকে একটু গভীরভাবে চিনে নেওয়া প্রয়োজন। বৈষ্ণবের কাছে শ্রীচৈতন্যদেব শুধুমাত্র একজন ধর্মপ্রচারক ঐতিহাসিক সাধক-মাত্র নন। তিনি রাধাপ্রেমরসের মূর্ত বিগ্রহ। অন্যান্য ধর্মগুরুর ন্যায় ধর্ম প্রচারে তাঁকে আমরা কখনও সক্রিয় দেখিনা, যদিও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অনেক ধর্মাচার্যই তাঁর কাছে বিতর্কে পরাস্ত হয়ে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণান্তর প্রথম বারো বছর ব্যাপী তীর্থ-পর্যটনকালের ঘটনা। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সাধক-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ পূর্ণবিকাশ লাভ করেছে তীর্থ পর্যটনের পরবর্তী শেষ বারো বছর ব্যাপী নীলাচল-বাস কালে। এই সময়কালই তাঁর দিব্যোন্মাদ-দশার কাল নামে খ্যাত। এই পর্বেই তাঁর জীবনাচরণে সকল আনুষ্ঠানিকতা-বিরোধী, কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমানুসারী রাগাত্মিক ভক্তিপ্রেমে বিভোর প্রকৃতি-ভাবের সাধনা ছিল অসংখ্য ভক্ত সাধারণের একান্ত প্রত্যক্ষের বিষয়। শ্রীচৈতন্য-প্রত্যক্ষদর্শী কবি কবি-কর্ণপুর পরমানন্দ সেনের বর্ণনা থেকে এরূপ একটি চিত্রের একান্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত :

"স্নানং নো তুলসী নিষেচন বিধির্নো চক্রসন্দর্শনং
নো নামগ্রহণঞ্চ নো নতিততির্নো হন্ত ভিক্ষাপি নো।
শ্রীনীলাচলচন্দ্রমোহনবসর ব্যাজাৎ স্বয়ৈবেচ্ছয়া
স্বীকৃত্য স্ব-বিয়োগ-দুঃখমনিশং নিস্পন্দমাক্রন্দতি ॥"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকং ॥ ১০/৩৮ ॥)

["এই গৌরাঙ্গচন্দ্র স্নান, তুলসীসেবা, চক্রদর্শন, হরিনাম গ্রহণ ও প্রণামাদি কিছুই করিতেছেন না। অধিক কি ভিক্ষা পর্যন্ত

পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল নীলাচলনাথের অদর্শন-ছলে স্বেচ্ছা-বশতঃই বিরহ-দুঃখ অঙ্গীকার করিয়া নিরন্তর রোদন করিতেছেন।"

—অনুবাদ : রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।]

শ্রীচৈতন্যের এই কৃষ্ণপ্রেমাকুতি ও বিরহের বোধে বিক্ষত হৃদয়-যন্ত্রণা রাধা-প্রেমাদর্শকেই যেন মূর্ত করে তুলেছিল ভক্তজনের সমক্ষে, যা চৈতন্য-পার্শ্বচর শিষ্য-কবি প্রবোধানন্দ সরস্বতীর বিস্মিত ও বিমুগ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে নানা প্রশ্নের আকারে :

"প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য ? নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা ? কস্য বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ ?
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকার-মাধুর্যসীমাম্ ?
একশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার ॥"

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ॥ ১০/১৩০ ॥)

যার তাৎপর্য—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যতীত কৃষ্ণ-নামের মহিমা, কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার পরম মাধুর্যরস, শ্রীরাধার অতুলনীয় প্রেমরস-মাধুর্যের স্বরূপ জগদ্বাসীর অজ্ঞাতই থেকে যেত। কেননা,—একমাত্র চৈতন্যচন্দ্রের পরম করুণায়ই জগদ্বাসীর পক্ষে সে সকল আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে। বলাই বাহুল্য,—কোন গ্রন্থ-রচনা কিংবা ভক্ত-সমাবেশে বক্তৃতার মাধ্যমে নয়, শ্রীচৈতন্যের রাগাত্মিক প্রত্যক্ষ সাধনাচরণের মাধ্যমেই সে সকল বিশ্ববাসীর গোচরীভূত হয়েছে।

এক কথায়, শ্রীচৈতন্যদেবের এ সাধনাও ছিল বিপ্রলম্ভাত্মক মধুর-রসের সর্বোচ্চ-বিবর্তন মহাভাবের সাধনা যা ব্রজগোপীদের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধার অধিকারভুক্ত এবং যে অধিকারে কৃষ্ণগোপীদের মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠা ; শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র ভাষায় :

"... ... ... রাধিকা সর্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥" (॥ শ্রীরাধাপ্রকরণ/৩ ॥)

সুতরাং শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের অধিকার অর্জন সেই শ্রীরাধার ভাবতনু হিসাবে ;

অর্থাৎ স্বকৃত লীলাচরণে শ্রীরাধার প্রেমভক্তিরসের অশেষ সীমাই[৮] তিনি জগদ্বাসীকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। এ কারণেই শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বৈষ্ণবধর্মের দর্শন, সাধনা, সাহিত্য প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই মধ্যমণি হিসাবে কেন্দ্রমূলে স্থাপিত হয়েছেন কৃষ্ণ নয়,—শ্রীরাধা। তাঁকে বাদ দিয়ে সে বৈষ্ণবধর্মের কোন অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। এককথায়, চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবধর্মে শ্রীরাধাই হয়ে উঠেছেন সমস্ত কিছুর বিকাশ-সাধিকা।

অথচ সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বহু শতাব্দী আগে থেকেই 'রাধা'-নামটি জনমানসে যথেষ্ট পরিচিতি ও সমাদর লাভ করেছিল। কিন্তু 'রাধা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তাকে এমন তত্ত্বমাধুর্যে মণ্ডিত করে কেন্দ্রমণি করে তোলার ও দার্শনিক দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দানের আদর্শ একমাত্র গৌড়ীয় সাহিত্য দর্শনেরই অবদান। বৈষ্ণব দর্শনে 'রাধা' শব্দের অর্থ হ'ল রাধ্ অর্থাৎ আরাধনা করেন যিনি,—'রাধয়তে ইতি রাধা'। আবার কখনও বলা হয়—'রাধ্ সংসিদ্ধৌ', অর্থাৎ আরাধনা বা মাধুর্যরসের সাধনায় যিনি চরম সিদ্ধি লাভ করেন,—তিনিই রাধা। এক কথায় রাগাত্মিক ভক্তিমার্গের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—সর্ববিধ প্রেমেরই ব্যাপ্তি ও গভীরতার পরমতম আদর্শ একটিমাত্র শব্দে যদি প্রকাশ করা সম্ভব হয় তবে সে শব্দ—'রাধা'। বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনে মাধুর্য-রসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশের আদর্শরূপে শ্রীকৃষ্ণের যে পরম গৌরব-বিস্তার, সে গৌরবের মূল কিন্তু কৃষ্ণ নন,—এই শ্রীরাধাই। বৈষ্ণব ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধার প্রতি উক্তিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠেই শ্রীরাধা-সম্পর্কে সেই একান্ত গৌরবের স্বীকৃতি উচ্চারিত হয়েছে :

"কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্॥"

(॥ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড/১৪/৬২ ॥)

৮. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় কৃষ্ণের উক্তি স্মরণীয় :

"রাধা-প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাই ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥" (॥ ১/৪/১১১ ॥)

রাধাসাহচর্য বিহীন অবস্থায় কেবল 'কৃষ্ণ' রাধা-সাহচর্যে একই লোকসমাজের কণ্ঠে গৌরবমণ্ডিত হন 'শ্রীকৃষ্ণ'-নামে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রী বা মাধুর্যের প্রতিষ্ঠা একমাত্র রাধারই প্রেম হেতু। বৈষ্ণবাদর্শ-পুষ্ট আদিপুরাণেও গোপীশ্রেষ্ঠা একমাত্র শ্রীরাধারই প্রেম-সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশস্থল হেতু বৃন্দাবনকে এবং একমাত্র বৃন্দাবনের অস্তিত্বের জন্যই স্বর্গাদি তিনলোকের মধ্যে পৃথিবীকে সর্বাপেক্ষা ধন্য বলে অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনি।[৯] আর সেই সর্বাতিশায়ী রাধা-প্রেমগৌরব হেতুই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব-সাধক ও কবি শ্রীমদ্ রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী তাঁর কাব্যে বৃন্দাবনকে দিয়েছেন কৃষ্ণের সর্বাধিক প্রিয় স্থানের মর্যাদা :

"সর্বস্মাদ্ গোকুলং শ্রেষ্ঠং তস্মাদ্ বৃন্দাবনং বরম্।
বৃন্দাবনাৎ পরং স্থানং ন কৃষ্ণস্য প্রিয়ং ক্বচিৎ॥"

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ॥ ৩/২॥)

বৈষ্ণব সাহিত্যে এ ভাবেই প্রেমময়ী ভক্তিসাধিকার গৌরব ভক্তির পাত্র কৃষ্ণের মহিমাকেও ম্লান করে দিয়েছে। চৈতন্যোত্তর কালের সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য এই রাধা-গৌরবের প্রতিষ্ঠাদানেই মুখর হয়ে উঠেছে, কৃষ্ণের নয়। কত ভাবেই না সে গৌরবের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বৈষ্ণব কাব্যে, নাটকে, অলঙ্কার-শাস্ত্রে, পদ-সাহিত্যে। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী সে গৌরবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন তাঁর 'গোবিন্দলীলামৃত'-কাব্যে, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের পূর্বোদ্ধৃত বাক্যকেই :

"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥"

(গোবিন্দলীলামৃত॥ ৮/৩২॥)

একই রচনায় সরাসরি বাচ্যার্থেও প্রকাশ করেছেন শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণয়-মহিমার কথা :

"কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা।
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা॥" (ঐ॥ ১১/১২২॥)

৯. "ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥" (আদিপুরাণ॥ উত্তরখণ্ড/১০॥)

অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রণয়োৎসারকারিণী একমাত্র এই শ্রীরাধিকাই—

"কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু-পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ পূর্ণ-কলেবর॥"

(চৈ. চ. ॥ ২/৮/১৪১-'৪২ ॥)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার এই অনুরাগাত্মক প্রেমের জয় ঘোষণা করতে গিয়ে তাকে কবি-সাধক শ্রীরূপ গোস্বামী ভূষিত করেছেন ভূমা-রসের গৌরব মর্যাদায় যা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েও সম্মানাদি গৌরব-বিহীন, যা মুহুর্মুহুঃ বক্রিমাভাব ধারণ করেও ক্রম-বিশুদ্ধতর :

"বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং গুরুরপি গৌরবচর্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিত বক্রিমাপি শুদ্ধো জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥"

(দানকেলিকৌমুদী ॥ ২ ॥)

যে রাধাপ্রেম বিভু হয়েও নিত্য বর্ধনশীল, তার পূর্ণ স্বরূপ ভাষায় রূপদান দূরে থাক, কল্পনারও অগোচর। জীবভক্ত কবির পক্ষে সেই রাধাপ্রেমের গুণ-বর্ণনায় একান্ত দীনতা অনুপম কাব্যরূপ লাভ করেছে কবিরাজ গোস্বামীর রচনায় :

"যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার"

(চৈ. চ. ॥ ২/৮/১৪৩-'৪৫ ॥)

শুধু জীব সাধকের পক্ষেই নয়, চৈতন্য-প্রত্যক্ষদর্শী কবিদের অনুভব থেকে বৈষ্ণব দর্শনে যে শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাব তত্ত্বের সূচনা দেখা গেছে, সেখানে স্বয়ং কৃষ্ণের পক্ষেও রাধার গুণ-গৌরবের পরিমাপে অসামর্থ্যকেই শ্রীচৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণের প্রথম ও প্রধান কারণ হিসাবে জ্ঞান করা হয়েছে—'শ্রীরাধায়া :

প্রণয়মহিমা কীদৃশো··· ··· ···' ইত্যাদি শ্লোকে। (দ্রঃ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়্চা)। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় স্বয়ং কৃষ্ণকণ্ঠে তার অনবদ্য ভাষ্যরূপ ঃ

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥
··· ··· ··· ···
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥"

(চৈ. চ. ॥ ১/৪/১০৬-'০৯, ১৭ ॥)

সুতরাং বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন, সাধনার সর্বস্তরে কৃষ্ণ নয়, শ্রীরাধাই হয়ে উঠেছেন সর্বস্বরূপিণী। এই রাধাপারম্যবাদের দিকে তাকিয়েই বৈষ্ণবাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ লেখেন ঃ

"শ্রীরাধাভজন ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণভজন হইতে পারে না, রাধা-বিরহিত মাধব বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না ;··· ।" (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ও সমাধান-সম্পদ, পৃ. ১ম খণ্ড / ১৩৪)

এই রাধাপারম্যবাদের সৃজন-মূলে বৈষ্ণব সাহিত্য দর্শন যাঁদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে, কবি জয়দেব তাঁদের মধ্যে বরেণ্যতম মহাজন,—কেন না, তাঁর 'গীতগোবিন্দ'-কাব্যেই রাধাপারম্যের সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে। কৃষ্ণ-প্রণয়িনী হিসাবে রাধা ও অন্যান্য গোপীবৃন্দ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক কিংবা তারও আগে থেকেই ভারতীয় জনমানসে একটি সুপরিচিত আসন দখল করেছিল। প্রথম শতকের কবি কবি-বৎসল হাল-সঙ্কলিত 'গাহা সত্ত-সঈ' অর্থাৎ 'গাথা-সপ্তশতী' থেকে শুরু করে কবি শ্রীবিদ্যাকর নন্দী-সঙ্কলিত 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়' বা 'সুভাষিত-রত্নকোষ', শ্রীধর-সঙ্কলিত

'সদুক্তিকর্ণামৃত', এ ছাড়া 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থ-চিন্তামণি' 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল', 'দশাবতার-চরিত্র' প্রভৃতি সংস্কৃত, প্রাকৃত কিংবা অবহট্ট ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ কবিতা-সমূহের সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে এবং অপরদিকে বিষ্ণু, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ সাহিত্যে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম প্রসঙ্গের যথেষ্টই পরিচয় মেলে। প্রকীর্ণ কবিতাসমূহে বর্ণিত রাধা ভক্তি বা সবপ্রকার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বর্জিত নিতান্তই আদিরস-বিহ্বলা অতি সাধারণ এক লৌকিক নারীমাত্র। তার বিশিষ্ট প্রেম-ভাবনার পরিচয় সে সকল ক্ষেত্রে একান্তই বিরল। আসলে, লৌকিক সমাজ-পরিবেশের গণ্ডিবদ্ধ বিভিন্ন নর-নারীর ইন্দ্রিয়জ প্রেম-ভাবনা অবলম্বনে সৌন্দর্য-সম্ভোগের কাব্য রচনা-প্রয়াসেই এ জাতীয় প্রকীর্ণ কবিতা সমূহের জন্ম। এ স্তরে কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে গ্রহণ করেছেন অন্যান্য নর-নারী যুগলের সঙ্গেই সম আসনে রেখে। তাই এ সকল কাব্য-কবিতায় কোন বিশেষ স্বাতন্ত্র্য কিংবা প্রেম-গৌরবের প্রতিষ্ঠা যেমন রাধার ক্ষেত্রে ঘটেনি, তেমনই ধর্মবোধ বা ভক্তিবাদের সঙ্গেও তার কোন বিশেষ সংযোগ চোখে পড়ে না। তাহলেও যে রাধাপারম্যবাদের সূচনা কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে, সে কাব্য এই লৌকিক প্রেমাখ্যান-ধারারই পরিণতি, —কেননা, জয়দেবের কাব্যেও লৌকিক প্রেমভাবনার সুরটি কিন্তু বেশ স্পষ্ট। এ বিচারে জয়দেবের গীতগোবিন্দ পর্যন্ত সমগ্র লৌকিক প্রেমোপাখ্যান ধারাটিকেই বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাপারম্যবাদের পশ্চাৎভূমি হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। তবু, পূর্ববর্তী কাব্য-কবিতায় যেখানে অন্যান্য নারীদের সঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রাধার প্রেম-প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, জয়দেবের কাব্য সেখানে সেই বিক্ষিপ্ততার মধ্যে এনেছে সংহতি, রাধাকেই কেন্দ্রে স্থাপন করে গীতগোবিন্দের কবি তাকেই দান করেছেন কাব্যের একমাত্র নায়িকার মর্যাদা। ব্যক্তি চরিত্রের একান্ত অবহেলার যুগে শ্রীরাধা তাঁর একান্তই নিজস্ব কাম, প্রেম, বিলাস, রূপ, গুণ, যৌবন, সৌন্দর্য, মাধুর্য, মিলন, বিরহ, মান-অভিমান —সমস্ত কিছু নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে, একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যের মুখ্য নায়িকা হিসাবে বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে উদ্ভাসিতা হয়ে উঠেছেন শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যেই সর্বপ্রথম। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যের পশ্চাৎ পটে মহাজন কবি হিসাবে জয়দেবের যে শ্রদ্ধা-মর্যাদাপূর্ণ বিশিষ্ট

আসন, তার অধিকার জয়দেব-পূর্ববর্তী লৌকিক কাব্যধারার কোন কবিকেই দেওয়া চলে না।

অপরদিকে, জয়দেব-পূর্ববর্তী পুরাণ সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র শ্রীমদ্-ভাগবত পুরাণেই কৃষ্ণের ব্রজলীলা-বৃত্তান্ত সর্বপ্রথম সংহত রূপ-লাভ করে দশম স্কন্ধের বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে। গোপীপ্রেম-প্রসঙ্গের প্রথম পরিচয় আমরা সেখানে পাই শুকদেবের কণ্ঠে উক্ত স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে।[১০] প্রাসঙ্গিক স্কন্ধের পরবর্তী প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন নানা অধ্যায়েই গোপীপ্রেম-প্রসঙ্গ বিক্ষিপ্তভাবে এলেও তা একটা বিস্তৃত অংশ জুড়ে কেন্দ্রী-ভূত হয়েছে রাস-পঞ্চাধ্যায়ে অর্থাৎ একোনত্রিংশ থেকে ত্রয়স্ত্রিংশ পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে। কিন্তু সে অংশে প্রকাশিত গোপীপ্রেম-প্রসঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের সাধারণ বা গোষ্ঠীগত-প্রেমেরই বিস্তার ঘটেছে। দু' একটি মাত্র বিচ্ছিন্ন শ্লোকে নামহীনা জনৈকা প্রধানা গোপীর বিশিষ্ট বা অ-সাধারণ প্রেমের প্রকাশ আভাসিত হলেও তিনি সমগ্র গোপীকুলের মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট প্রেমচেতনার বিস্তারের মাধ্যমে আপনার স্বাতন্ত্র্যকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারেননি, যদিও অন্যান্য গোপীদের কথায় সেই অনামা গোপীর প্রতি কৃষ্ণের অধিকতর আকর্ষণের ইঙ্গিত মেলে দু' একটি শ্লোকে, যেমন ঃ

"কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা॥
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥
... ...
তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্তুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্॥"

(ভা°॥১০।৩০।২৭-২৮, ৩০॥বসুমতী সং)

যাঁর বিশেষ প্রেম-পূজায় আরাধিত শ্রীকৃষ্ণ সমবেত গোপীগণকে পরিত্যাগ করে আরাধনাকারিণী একমাত্র গোপীসহ রাসলীলাস্থল থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানরতা গোপীগণ কৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে যে

১০. "গো-গোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ···॥" -ইত্যাদি পঁচিশ-সংখ্যক শ্লোক

বিশেষ গোপীটির পদচিহ্ন দর্শনে ঈর্ষান্বিতা হয়েছিলেন এবং সকল গোপীর ধনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধর একা পান করেছিলেন বলে যে বিশেষ গোপ-নারীটি সমবেত গোপীবৃন্দের চিত্তক্ষোভের কারণ হয়েছিলেন, সেই বিশেষ গোপরমণীটিই যে কৃষ্ণের মুখ্যা প্রেয়সী শ্রীরাধা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু রাধার সেই প্রেম-মহিমার চিত্র ভাগবতকার কোথাও আঁকেননি। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক যে ক'টি অধ্যায় আমরা ভাগবতে পাই, সেগুলির সর্বত্রই গোষ্ঠীগত সাধারণ গোপীপ্রেমেই শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছেন, ব্যক্তি-চিত্তের প্রেম-গভীরতার আদর্শে নয়। অর্থাৎ ভাগবতে মধুর-রসাত্মক ব্রজ-লীলার বিস্তার অ-বিশিষ্ট গোপীবৃন্দকে আশ্রয় করে, বিশিষ্টা গোপীশ্রেষ্ঠাকে কেন্দ্র করে নয়। যে স্বাতন্ত্র্যময় রাধাপ্রেমকে একমাত্র অবলম্বন করে বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনের পরিপূর্ণ বিস্তার, ভাগবতে সেই রাধাপ্রেম একান্তই অনুপস্থিত।

পক্ষান্তরে কবি জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ' গোপী-সাধারণের নয়, শ্রীরাধার একান্ত ব্যক্তি-চিত্তের বিশেষ প্রণয়েরই কাব্য। বারোটি সর্গে বিভক্ত এ কাব্যের নায়িকা শ্রীরাধা নায়ক কৃষ্ণের একান্ত প্রেয়সীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা। আর সে কারণেই এ কাব্যের দৃষ্টান্তে দেখতে পাই, গোপী-সাধারণের সঙ্গে বন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ প্রণয়ে আপনার বিশিষ্ট প্রেমের মর্যাদাহীনতার উপলব্ধি ক্ষুব্ধ রাধাকে করে তুলেছে প্রবল অভিমানিনী, যা মদীয়াত্মক প্রেম-গভীরতারই পরিচয় বহন করে। সেই অভিমানবশতঃই কৃষ্ণসঙ্গ পরিত্যাগ করে গীতগোবিন্দের রাধাকে দেখতে পাই ভ্রমর-গুঞ্জিত নির্জন লতাকুঞ্জে সখির নিকট আপনার আহত প্রেমের বেদনা ব্যক্ত করতে। কবি স্পষ্ট বাচ্যার্থেই বর্ণনা করলেন মানিনী রাধার সে অপূর্ব চিত্র :

"বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ
বিগলিত-নিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী—
মুখর-শিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্।"

(গীতগোবিন্দ ॥ ২য় সর্গ/১ ॥)

এই অভিমানের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি অনিবার্য প্রেমের উপলব্ধি প্রবলতর হয়ে উঠেছে সখীর প্রতি রাধার এই উক্তিতে :

"গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ।
যুবতিষু বলদ্বেষে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্॥"

(ঐ॥ ২/১০॥)

["আমাকে ছেড়ে তিনি অন্য যুবতীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে বিহারে রত, তবু সেই কৃষ্ণেই আমার মন অনুরক্ত, কী করব? আমার মন তাঁর গুণরাশিকেই বড়ো করে দেখছে, ভুলেও রুষ্ট হচ্ছে না, তাঁর দোষ দূরে সরিয়ে রেখে সন্তোষই বহন করছে।"
—অনুবাদ: জ্যোতিভূষণ চাকী / সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ৬ষ্ঠ খণ্ড।]

এ উক্তি আমাদের অনায়াসেই পৌঁছে দিতে পারে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের রাধার কাছে, গভীর প্রেমানুরাগে যাঁর কণ্ঠে বেজে ওঠে সুতীব্র আক্ষেপ:

"যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু-পথে ধায় রে॥
... ...
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥"

(বৈষ্ণব পদাবলী [চয়ন], ১০/২)

কেবল রাধার মানসিকতায় কৃষ্ণের অনিবার্যতার কথাই নয়, কৃষ্ণের কাছেও রাধার অপরিহার্যতার প্রথম সন্ধান গীতগোবিন্দের স্রষ্টাই দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের দৃষ্টান্তে শ্রীরাধা ব্যতীত কৃষ্ণের অন্যান্য অসংখ্য গোপীর উপস্থিতি ও তাদের সম্মিলিত প্রেমমাধুর্যেও রাসলীলা-রসের বিন্দুমাত্র বিকাশ ঘটে না। কাব্যের তৃতীয় সর্গের প্রথম শ্লোকেই কৃষ্ণের পরম জীবাতু রাধার সেই অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকে কবি উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা দিলেন:

"কংসারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধ-শৃঙ্খলম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"

(গীতগোবিন্দ॥ ৩/১॥)

কৃষ্ণ-হৃদয়ে সংসার-বাসনা তথা রাসলীলা-বাসনাকে আবদ্ধ করার শৃঙ্খলস্বরূপা

হলেন একমাত্র শ্রীরাধাই। তাই একমাত্র রাধাকেই হৃদয়ে ধারণ করে রাস-লীলারস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য শত-সহস্র গোপীকেও পরিত্যাগ করেছিলেন। আবার এই তৃতীয় সর্গেই বর্ণিত হয়েছে—অন্যান্য গোপীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত কৃষ্ণকে দেখে অভিমানিনী রাধা কৃষ্ণসঙ্গ ত্যাগ করে ক্রোধ-ভরে দূরে সরে গেলে সম্মিলিত গোপীপ্রেমে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও রাধাহীন কৃষ্ণের কণ্ঠে ফুটে ওঠে নিঃসীম শূন্যতার বেদনা :

"কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ—
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব ॥ (ঐ ॥ ৩/৪ ॥)

["তাঁকে ছাড়া আমার ধনে-জনে-জীবনে বা ভবনে কী কাজ? হরি! হরি! তিনি নিজেকে অনাদৃতা মনে করে যেন কুপিতা হয়েই চলে গেলেন।"]

একমাত্র রাধা তাঁর প্রেমস্বাতন্ত্র্যে যে প্রগাঢ় আনন্দরস দান করতে পারে, অজস্র গোপী সম্মিলিতভাবেও কৃষ্ণকে সে আনন্দদানে ব্যর্থ।

কৃষ্ণের কাছে রাধার সর্বস্বতা এমনভাবে প্রাক্-জয়দেব কালের লৌকিক সাহিত্য কিংবা পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে কোথাও মেলে না। তৃণক্ষেত্রের একটি তৃণের মতই গোষ্ঠীপ্রেমের স্বাতন্ত্র্যহীনতায় অন্যান্য গোপী কিংবা লৌকিক নারীর মত রাধাও সে সকলের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যূথচারিণী। কৃষ্ণের প্রশস্তি রচনা কিংবা আশীর্বাদ প্রার্থনাকালে তাঁর ঐশী-সত্তার পরিচয়বহ অন্যান্য গুণাবলীর বর্ণনার সঙ্গে দু'টি ক্ষেত্রের একটিতে কুপিতা রাধার অনুগমন-কালে তার পদচিহ্নে আপনার চরণ পতনে কৃষ্ণের রোমাঞ্চিত হওয়ার[১১] এবং দ্বিতীয়টিতে রাধামুখমধু পানকারী হিসাবে তাঁর ভ্রমরবর-সদৃশ সত্তার[১২] উল্লেখ

---

১১. ভট্টনারায়ণ রচিত 'বেণীসংহার'-নাটকের 'কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু···ইত্যাদি নান্দীশ্লোক। (১/২)। প্রাসঙ্গিক অংশটি হ'ল—"তৎপাদপ্রতিমানিবেশিত-পদন্যোদ্ভূত-রোমোদ্গমে।"

১২. 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে' সঙ্কলিত অবহট্ট ভাষায় রচিত 'জিনি কংস বিনাসিঅ কিত্তি পআসিঅ ···" ইত্যাদি পদ। প্রাসঙ্গিক অংশ—"রাহামুহ-মহু পান করে জনি ভমরবরে।"

(দ্রঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড/পূর্বার্দ্ধ—ডঃ সুকুমার সেন, পৃ.৫৯)

থাকলেও রাধার প্রেমভাবনার বা তাঁর পরমতার কোন পরিচয়ই সেখানে নেই নিছক কাব্যভাবনাই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ দুটি দৃষ্টান্তের বাইরে অসংখ্য চূর্ণ কবিতাবলীর মধ্যে দু'টি মাত্র বিচ্ছিন্ন শ্লোকে রাধাপ্রেমের গৌরবাধিক্য কৃষ্ণের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে দেখা যায়। তার একটি দশম-একাদশ শতকের কবি বাকৃপতি রচিত "যল্লক্ষ্মীবদনেন্দুনা ন সুখিতং···"ইত্যাদি, অপরটি 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' সঙ্কলিত কবি উমাপতিধর রচিত "রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত জলধৌ মন্দিরে···"—ইত্যাদি শ্লোক। শ্লোক দুটিতে নারায়ণ বা কৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী যথাক্রমে লক্ষ্মী ও রুক্মিণীর প্রেমের প্রেক্ষাপটে শ্রীরাধার অধিকতর প্রেমগৌরবের স্মৃতি কৃষ্ণের মুগ্ধতা সম্পাদন করেছে।[১৩] এ হিসাবে শ্লোক দু'টির রাধাপারম্য-সঞ্চারে বীজ-মূল্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু রাধার সে প্রেম-গৌরবের চিত্র শ্লোক দু'টিতে নেই যা কবি জয়দেবের রচনায় অজস্র চিত্রে, বর্ণনায়, সংলাপে, স্মৃতি-প্রসঙ্গে, কৃষ্ণ ও ব্রজগোপীদের আচরণে পূর্ণ-বিকাশ লাভ করেছে। তাছাড়া অন্যান্য অসংখ্য-ব্রজগোপীর পরকীয়া প্রেমের প্রেক্ষাপট, কৃষ্ণের কাছে রাধার অপরিহার্যতার নানা প্রসঙ্গ-চিত্র

১৩. (ক) "যল্লক্ষ্মীবদনেন্দুনা ন সুখিতং যন্নাহার্দিতম্বারিধে—
বারা যন্ন নিজেন নাভিসরসীপদ্মেন শান্তিঙ্গতম্।
যচ্ছেষাহিফণা সহস্রমধুরশ্বাসৈর্ন চাশ্বাসিতং
তদ্রাধাবিরহাতুরং মুররিপোর্বেল্লদ্বপুঃ পাতু বঃ॥"

[লক্ষ্মীর মুখচন্দ্র দ্বারা যা সুখিত হয় না, সমুদ্রের জলরাশি দ্বারা যা অপ্রশমিত, যা আপনার নাভিসরসী পদ্ম দ্বারাও শান্তিলাভে অসমর্থ, শেষনাগের সহস্র ফণা-নির্গত মধুর শ্বাসের দ্বারাও যা আশ্বাসিত হয়নি, এমন যে মুর-রিপুর রাধা-বিরহাতুর উদ্বেলিত বপু,—তা তোমাদের রক্ষা করুক।]

(খ) "রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত-জলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া
রুক্মিণ্যাপি প্রবল পুলকোদ্ভেদয়ালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পায়ান্ মসৃণযমুনাতীরবানীর কুঞ্জে
রাধাকেলিভর পরিমলধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ॥"

[রত্নচ্ছায়া বিচ্ছুরিত সমুদ্রতীরে দ্বারকার মন্দিরে একান্ত পুলকিতা রুক্মিণীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েও শ্যামল যমুনা-তীরবর্তী বেতসলতাকুঞ্জে রাধার সঙ্গে প্রেমক্রীড়ার মহিমা ও সৌরভের ধ্যানে মুরারির যে মূর্ছা, তা বিশ্বকে পালন করুক।]

প্রভৃতি জয়দেবের রাধাকে সমগ্র কাব্য জুড়ে যে সর্বস্বতার গৌরব-মর্যাদা দিয়েছে, তার পরিচয় বিচ্ছিন্ন শ্লোক দুটিতে খোঁজা বৃথা। বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনে রাধা-সখী এই গোপীবৃন্দের ভূমিকা রাধাপ্রেমের পরিপোষণ ক্ষেত্রে একটা মুখ্য স্থান দখল করেছে। কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি স্মরণীয়:

"সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
... .
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তাঁর পল্লব পুষ্প পাতা॥"

(চৈ. চ.॥ ১৬৩-'৬৪, ১৭০॥)

জয়দেবের কাব্যে গোপীবৃন্দ সেই মুখ্য ভূমিকাই পালন করে শ্রীরাধার 'কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা'-স্বরূপটিকেই প্রগাঢ় করে তুলেছে যা জয়দেব-পূর্ব কবিদের রচনায় মেলে না।

তাছাড়া, বিপ্রলম্ভাত্মক গৌড়ীয়-প্রেমাদর্শের পরম গৌরবের পরিচায়ক যে ভাবসম্মিলন,—গভীর বিচ্ছেদেও ধ্যানের একাগ্রতায় হৃদয়ে নিত্য মিলনের তীব্র অনুভূতি, জয়দেবের কাব্যে রাধাবিরহী কৃষ্ণের অনুভবে আপন হৃদয়ে রাধার সে সম্মিলন একদিকে রাধার শ্রেষ্ঠত্বকে অপরদিকে গৌড়ীয় প্রেমা-দর্শের অন্যতম উৎস-মূলকে অনায়াসেই চিহ্নিত করে দেয় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি:

"তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি॥" (॥৩/৬॥)

["তিনি (রাধা) আমার হৃদয়ে সন্নিহিতা বলে প্রগাঢ়ভাবে আমি তাঁর সঙ্গে নিত্য রমণশীল। তাই তাঁকে বনে অনুসরণ করছি কেন? কেনই বা বৃথা তাঁর জন্য বিলাপ করছি?"]

এর সঙ্গে "ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি··" ইত্যাদি শ্লোকে (দ্রঃ ৩/৯) রাধাবিরহখিন্ন অনুতপ্ত হৃদয়ে রাধার নিকট কৃষ্ণের ক্ষমা-প্রার্থনা, সমগ্র কাব্য জুড়ে একমাত্র রাধার কাছেই কৃষ্ণের প্রেম ও রতিভিক্ষার বর্ণনা, একমাত্র রাধার সঙ্গেই কৃষ্ণের মিলন ও বিরহের বর্ণনা জয়দেবের কাব্যে রাধা-মহিমাকে নিঃশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

বৈষ্ণব-দর্শনে শ্রীরাধার দৃঢ় দার্শনিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকার হ্লাদিনী-শক্তির মূর্তিমতী বিগ্রহরূপে। 'হ্লাদয়তে ইতি হ্লাদিনী',—কৃষ্ণকে হ্লাদ্ বা আনন্দ দান করাই এই হ্লাদিনী শক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার এই শক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ জগতেরও আনন্দ সম্পাদন করেন। (দ্রঃ চৈ. চ. ॥ ১।৪।৫২-৫৩ ॥)। মহাভাব এই হ্লাদিনী-সত্তারই সর্বাধিক ঘনীভূত পরিণতি, আর একমাত্র শ্রীরাধাই তার অধিকারিণী। তাই বৈষ্ণব দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত :

"মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি॥" (চৈ. চ. ॥ ১/৪/৬০ ॥)

গীতগোবিন্দে শ্রীরাধা এরূপ দার্শনিক তত্ত্বের আকর হয়ে ওঠেননি সত্য, কিন্তু তিনি যে 'সর্বগুণ খনি কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি' হয়ে উঠেছেন সে বিষয়ে কোনই সংশয় নেই। সেখানে রাধাপ্রেমমুগ্ধ কৃষ্ণের দীন কাতরোক্তিতে কৃষ্ণের পরম ভূষণ-স্বরূপতায়, জীবনসর্বস্বতায়, সমগ্র ভুবনসার রত্নস্বরূপতায় রাধা অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়ে যান সে মর্যাদায় :

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥" (গীত॰ ॥ ১০/৪ ॥)

এরূপ দীনতার প্রকাশে কৃষ্ণমাধুর্য ও রাধাগরিমা সর্বোচ্চ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে যখন কৃষ্ণ স্মরগরল হরণকারিণী শ্রীরাধার পদপল্লব শিরোভূষণ করে আপনার শিরে স্থাপনের মিনতি জানান রাধার কাছে :

"স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্॥" (ঐ ॥ ১০/৮ ॥)

এই রাধাই বৈষ্ণবের ধর্ম-সাধনা-সাহিত্য-দর্শনের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হয়ে বৈষ্ণবাদর্শের সর্বাত্মক ও সর্বমূল, সর্বাশ্রয় ও সর্বনিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে।

সন্দেহ নেই বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শন তার প্রেমভক্তিরসের বিবর্তনে ভাগবতকে একান্তভাবে অনুসরণ করেছে এবং তা যথার্থই যুক্তিযুক্ত। ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্রজগোপীপ্রসঙ্গে রাগাত্মিক প্রেমভক্তির সুমহৎ আদর্শ ভাগবতের নানা

অংশে ব্যক্ত হয়ে তাকে ভক্তি-সাধনার ইতিহাসে পরম গৌরবজনক পদে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু যে রাধা-কেন্দ্রিকতা বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনের বিস্তারে মুখ্য ভূমিকার অধিকারী, তা কিন্তু ভাগবত বা অন্য কোন পুরাণ কিংবা কোন ধর্ম বা দার্শনিক মতাশ্রিত নয়, তা কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য-ধারাকেই আশ্রয় করে বিবর্তনে বৈষ্ণব ধর্মসাধনায় পরম রাধা-ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হয়েছে আর ভাগবতাদির ভক্তি-আদর্শ সে রাধাপ্রেমের মহাসঙ্গমে মিলিত হয়ে তার গৌরবপুষ্টির সহায়ক হয়েছে। এই প্রাচীন সাহিত্য-ধারারই মূল ও প্রধান নিদর্শনটি হ'ল কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ। এ ধারার অন্যান্য কবিগণ, যথা—জয়দেব-সমসাময়িক শরণ, ধোয়ী, গোবর্দ্ধনাচার্য, অভিনন্দ, শতানন্দ, লক্ষ্মণসেন, গোপীক প্রভৃতি এবং জয়দেব পরবর্তী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যের কবি বড়ু চণ্ডীদাস, পদাবলীর কবি বিদ্যাপতি (অভিনব জয়দেব) জয়দেবেরই প্রভাব-পুষ্ট হয়ে জয়দেব-কাব্যের রাধা-কেন্দ্রিকতাকে দান করেন বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট ধারা যা পূর্ণস্ফুট রূপ লাভ করেছে সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে। লৌকিক প্রেমকাব্যের ধারায় সৃষ্ট গীতগোবিন্দের ইন্দ্রিয়পরতা বা স্থূলত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ অসংখ্য সমালোচকের যতই অভিযোগ থাক না কেন[১৪], সে অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেও বলা চলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে রাধার একান্ত পারম্যবিকাশে জয়দেবের স্থান বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনে চির অম্লানই থাকবে।

গীতগোবিন্দের এই রাধাকেন্দ্রিক প্রেমাদর্শই মহাভাবের সাধক শ্রীচৈতন্যদেবকে গীতগোবিন্দের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল এবং শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদিত হওয়ার একান্ত গৌরবকে আশ্রয় করেই বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের বিস্তৃতির মাধ্যমে নিখিল বঙ্গ ও সমগ্র ভারতবর্ষে কবি জয়দেব ও তাঁর কাব্য গীতগোবিন্দের পুণ্য প্রতিষ্ঠা। আর সেই হেতুই লৌকিক প্রেমকাব্যের ধারায় আগত গীতগোবিন্দ কাব্যের অধ্যাত্ম-পরিমণ্ডলে উত্তরণ ও মর্যাদাপূর্ণ সমাদর। এ সমাদর যথার্থ যোগ্যতারই, যার বিচারে সমাজ-ইতিহাসের ধারা পর্যবেক্ষণে গীতগোবিন্দ সম্পর্কে গবেষক পণ্ডিতগণের অকুণ্ঠ সিদ্ধান্ত :

---

১৪. "ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব।" (বিবিধ প্রবন্ধ/বিদ্যাপতি ও জয়দেব)। "যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব।" (কৃষ্ণচরিত্র/২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।)

"...it has been regarded not only as a great poem, but also a religious work of mediaeval Vaisnava Bhakti." (A History of Sanskrit Literature, Classical Period : S. N. Dasgupta & S. K. Dey, Vol. I, p. 389)

রাধাপারম্যবাদের সঞ্চারে কবি জয়দেবের অবদানের কথা স্মরণে রাখলে গীতগোবিন্দে এই ভক্তিমর্যাদা আরোপের সিদ্ধান্তকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান চলে।

॥ বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব ॥

শ্রীচৈতন্যদেব শুধুমাত্র বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসেই নয়, ভারতবর্ষের সমগ্র ধর্ম সাধনার ইতিহাসেই একটি অবিস্মরণীয় নাম। অধ্যাত্মভূমি ভারতবর্ষে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ঐতিহ্য সুপ্রাচীন কাল থেকে গড়ে উঠলেও উভয়েরই পরম রস-স্বরূপের আবিষ্কার একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবেরই রাগমার্গীয় ভক্তিসাধনায় গভীরতর অবগাহনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। বৈদিক সংহিতার মন্ত্রে যে বৈষ্ণব ধর্ম ও আরাধ্য হিসাবে ঐশী-সত্তা বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পদধ্বনি শোনা যায়,[১] নানা উত্থান-পতন ও বিবর্তনের স্তর পার হয়ে এসে শ্রীচৈতন্যদেবের রাগমার্গীয় ভক্তিসাধনার মধ্য দিয়েই তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এবং কেবল মধুররসের আকর পরমকান্ত-স্বরূপ 'গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর'—শ্রীকৃষ্ণে। এই শ্রীকৃষ্ণই সমগ্র ভারতবর্ষের ধর্মসাধনক্ষেত্রে ত্রি-দেবতার মধ্যমণি, পরতত্ত্ব, পরমাত্মা, পরমেশ্বর—বিশ্বজগতের পালক ও নিয়ামক। সুতরাং বলা যেতে পারে—সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মিক রূপ তার যে ধর্মসাধনা—আধ্যাত্মিক বোধির পরিপূর্ণ জাগরণের কামনা,—শ্রীচৈতন্যদেবই সেই পরম জাগরণ। স্বর্গীয় আচার্য ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চিরায়ত ভারতবর্ষের ধর্ম ও সাধনার জগতে শ্রীচৈতন্যদেবের এই সহজ স্বাভাবিক রূপটিকে চিহ্নিত করে গেছেন প্রাণবন্ত ভাষায় :

> "বহুযুগ যাবৎ ভারতবর্ষ হোমকুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া পুনরায় তাহা নির্বাণ করিয়া অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া যে সিদ্ধি চাহিয়াছিল, চৈতন্যদেবই সেই সিদ্ধি। অপরাপর সাধুদের জীবনে তপস্যা আছে,—কিন্তু চৈতন্য সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধি, অতি সহজ, বাল্মীকির কাব্য, চণ্ডীদাসের গান। রবীন্দ্রের গীতাবলি যেমন সহজ—ইহা তেমনই সহজ। শ্রমজাত একটি বিন্দুও তাহার নাই, ধর্মজগতের সম্যক্

---

১. দ্রঃ যথাক্রমে শুক্ল যজুঃ ॥ ৫/২১, ২২, ২৫ ইত্যাদি সংখ্যক মন্ত্র ॥ এবং ঋক্ ॥ ১/১৬-২১, ১৫৪-'৫৬, ৬/৬৯, ৭/৪৪, ৪৯, ৮/৩৫, ১০/১৮৪ প্রভৃতি সংখ্যক সূক্ত ॥

বিকশিত পদ্ম, ইহা সৃষ্টি করিতে যে জাতীয় কত যুগের তপস্যার দরকার হইয়াছে তাহার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। তিনি খুব কমই উপদেশ দিয়াছেন, তিনি কোন কঠিন পন্থা দেখান নাই—তাহাকে দেখামাত্র লোকে ভুলিয়াছে।" (বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড/পৃ. ৬৮৫)

শুধু তাই নয়, প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের কামশূন্য প্রেমে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব-সাধক-পণ্ডিতগণ দেখেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল চেতনাময় আত্মার একান্ত স্বাভাবিক নিত্যধর্মের পরিস্ফুটন,[২] যা সমগ্র বিশ্বের ধর্মসাধনায় এমনভাবে আর কোথাও বিকাশলাভ করেনি।

ভারতবর্ষের সাধক সম্প্রদায় সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের প্রাণদেবতা পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে গেছেন সাধনার অতল গহনে আত্মসমাহিত হয়ে। যুগে যুগে তাঁরা পরম-দেবতার বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, শ্রীরঙ্গম্, বিট্‌ঠল, ভেঙ্কটেশ্বর, মুরুগোপাল, শ্রীরাম, বদরীবিশাল—প্রভৃতি সহস্রবিধ স্বরূপের মধ্যে সে পরতত্ত্বের অনন্ত গুণ-শক্তি-লীলামাহাত্ম্যের অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। অনুসন্ধানের সে ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে রামায়ণে, মহাভারতে, গীতায়, বিষ্ণু-ভাগবতাদি পুরাণসাহিত্যে, আড়বার-পাঞ্চরাত্র-একান্তী-ভাগবত প্রভৃতি সাধক-সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীতে, সর্বোপরি বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের (শ্রী-ব্রহ্ম-সনক-রুদ্র) রচনাপঞ্জীতে। কিন্তু সকল কিছুর আস্বাদন করে গৌড়ীয় প্রেমভক্তিরসের সাধক উপলব্ধি করেছেন :

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেষ্টা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুপুরাণের কথিত শ্রীকৃষ্ণ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শ্রীকৃষ্ণ, আধুনিক আনুকরণিক নিম্বার্কানুগধ্রুব সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণ বা বল্লভানুগ-গণের শ্রীকৃষ্ণ যে পরিমাণে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নতনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত পার্থক্য লাভ করিয়াছেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-ধারণায় অসম্পূর্ণতা আছে।" (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ও সমাধান-সম্পদ : ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ/২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮)

এ সিদ্ধান্ত ভক্তি-আবেগ প্রসূত নয়, একান্তই সত্য। সাধনাক্ষেত্রে

দ্রঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ও সমাধান-সম্পদ/২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৫.

ঈশ্বরের নানাবিধ অলৌকিক শক্তিপূর্ণ ঐশ্বর্যময় সত্তা সাধকের অন্তরে ঈশ্বর সম্বন্ধে জাগিয়ে তোলে একপ্রকার ভীতি-সম্ভ্রম-গরিমাবোধ। ফলে তাঁর প্রতি অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমবোধ যথাযথ বিকশিত হতে পারে না। ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনকর্তৃত্বের রূপ, কর্মফল-দাতৃত্বের রূপ, অনন্ত শক্তি-গুণ-মহিমার চিন্তা অন্তরে লালিত হওয়ায় ভক্ত-সাধক আপনাকে তাঁর তুলনায় একান্তই-দীন-হীন-নগণ্য জ্ঞান করে, ফলে ঈশ্বর-সম্পর্কে প্রিয়ত্বজ্ঞান, মদীয়তাময় প্রেমবোধ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। যেমন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে সখ্য-রসের সাধক অর্জুনের মনে হয়েছিল কৃষ্ণের প্রাত তাঁর অসঙ্কোচ সখ্যপ্রীতির ব্যবহার অসঙ্গত ও ধৃষ্টতার পরিচায়ক এবং সে কারণে তাঁকে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করে বলতে শুনি :

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥"

(গীতা॥ ১১/৪১-৪২॥)

["আপনার এই জগদাকার রূপের মাহাত্ম্য না জানিয়া প্রমাদহেতু বা প্রণয়বশতঃ আপনাকে সখা-ভাবিয়া হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে এইরূপ অবিনয়ে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছি, এবং হে অচ্যুত, বিহার শয়ন আসন ও ভোজনকালে আপনার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে, একাকী বা বন্ধুজনসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে আপনাকে যে অসম্মান বা অমর্যাদা করিয়াছি, হে অপ্রমেয়, আপনার নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।"—অনুবাদ : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।]

এমন কি পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকী পর্যন্ত কৃষ্ণ-বলরামের প্রণামের বিনিময়ে তাদের আলিঙ্গন ও স্নেহ-চুম্বন দান করতেও ভীত হয়েছিলেন

তাদের প্রতি ঈশ্বরবোধ জাগ্রত হওয়ার জন্যই,—ভাগবতে শুকদেবের কণ্ঠে তার বর্ণনা পাই :

"দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সম্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥"

(ভাগবত ॥ ১০/৪৪/৫১ ॥)

["বসুদেব ও দেবকী রাম-কৃষ্ণ অভিবাদন করিলেও ইহারা জগদীশ্বর, ইহা জানিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে আলিঙ্গন করেন নাই। পরন্তু শ্রদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।" অনুবাদ : শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন ॥]

ঐশী-জ্ঞান হেতু এরূপ প্রীতিসঙ্কোচের কারণেই রসসত্তা ঈশ্বরের রসস্বরূপটিও সাধকের চিত্তে যথাযথ ধরা পড়ে না, ফলে রসাস্বাদের বিভোরতা থেকে সাধক বঞ্চিত হন। একমাত্র শ্রীচৈতন্য-উপদিষ্ট ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের ঐশ্বর্যাত্মক দৈবী-গুণসত্তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে কেবল মাধুর্যময় প্রেমরসসত্তার পরিপূর্ণবিকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের সিদ্ধান্ত স্মরণীয় :

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু : শ্রীরূপ গোস্বামী ॥ ১/২/৫৯ ॥)

["পরব্যোমাধিপ মহানারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহদ্বয়ে তত্ত্বতঃ ঐক্য থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমময়রসে উৎকর্ষ প্রাপ্তি করিতেছে অর্থাৎ যোগ্য ভক্তে শ্রীশ হইতেও উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইতেছে।"]

উপাসনাক্ষেত্রে তাই তাঁরা ঈশ্বরের ঐশী-সত্তার বাহক চতুর্ভুজ নারায়ণ-বিষ্ণু-বাসুদেবাদির মূর্তি গ্রহণ করেন নি, এমনকি বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা বা মথুরার কৃষ্ণকেও গ্রহণ করেননি, কেননা দ্বারকা-মথুরার ক্ষেত্রে যুদ্ধ-পরিচালন, শত্রুনাশ প্রজাপালন প্রভৃতি রাজকীয় কর্মে কৃষ্ণের ঐশী ক্ষমতার পরিচয় যথেষ্ট,—তাঁরা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন একমাত্র বৃন্দাবনের নিত্য রসময়, নরলীলাকারী, রাধাপ্রেমবিলাসী গোপিকা-কান্ত দ্বিভুজ কৃষ্ণকে,—যা তাঁর কেবল মাধুর্য-

সত্তার পরিপূর্ণ স্বরূপকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।[৩] অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে একমাত্র ব্রজবিহারী কিশোর কৃষ্ণেই পরম রসের সন্ধান মেলে, যে কারণে 'বরাহ সংহিতা'য় সকল দেবতার মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্রকে জীবন, সকল প্রকার বিষ্ণুমন্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণমন্ত্রকে কারণ এবং সর্বপ্রকার কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে কৈশোর-কৃষ্ণমন্ত্রকে সর্ববিধ মন্ত্রের হেতু বা মন্ত্র-চূড়ামণি বলে সম্বর্ধনা জানান হয়েছে :

"সর্বদেবস্য মন্ত্রাণাং বিষ্ণুমন্ত্রস্তু জীবনং।
শ্রী বিষ্ণোঃ সর্বমন্ত্রাণাং কৃষ্ণমন্ত্রস্তু কারণম্॥
সর্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং কৈশোরমতিহৈতুকীং।
কৈশোরং সর্বমন্ত্রাণাং হেতুশ্চূড়ামণির্মনুঃ॥"

অপরদিকে যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমসাধনার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-রসস্বরূপের বিকাশ ঘটেছে এবং সেই রসমহিমার প্রচার ও তার আস্বাদ-বিভোরতাই ছিল শ্রীচৈতন্যের একমাত্র সাধনা, তাই তিনি কেবল শ্রীচৈতন্য নন, —শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সন্ন্যাস-দীক্ষাদাতা আচার্য কেশবভারতী এই নামকরণ করে যথার্থই বলেছিলেন :

"যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্বলোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥"

(শ্রীচৈতন্য ভাগবতঃ শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুর॥ মধ্যখণ্ড / ২৬শ অধ্যায়॥) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের আর এক গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে গৌড়ীয় ধর্ম-দর্শনে। গৌড়ীয় দর্শনমতে শ্রীচৈতন্যদেব প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্যরূপী কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভাবতনু শ্রীচৈতন্য। শ্রী কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে একারণেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের কণ্ঠে শুনি—"কৃষ্ণস্বরূপং চৈতন্যসঙ্গীতঃ।"

---

৩. মাধুর্যরসের ক্রমভেদ হেতুই শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' মহাকাব্যে বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে পূর্ণতম, মথুরার কৃষ্ণকে পূর্ণতর এবং দ্বারকার কৃষ্ণকে কেবল পূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন :

"কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্‌গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু॥" (॥২/১/২২৩॥)

(॥ ৪/৯ ॥,) অর্থাৎ যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তিনি চৈতন্যরূপী, তাই শ্রীচৈতন্যদেব প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

এ মতের পিছনে রয়েছে ঐতিহাসিক পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-বিষয়ক বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্ব,—যার মধ্য দিয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তাঁদের প্রেমের পরম সৌন্দর্য-মাধুর্যের রূপটি বিশ্ববাসীর যুগপৎ দর্শনগম্য ও অনুভূতি-গোচর হয়েছে। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমসাধনা কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমাদর্শকেই বিশ্ববাসীর প্রত্যক্ষগোচর করিয়েছে কিংবা সে প্রেমাদর্শকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। চৈতন্য-প্রত্যক্ষদর্শী কবিদের পদসমূহে, কাব্য-নাটকের শ্লোকাবলীতে, চৈতন্য-জীবনচরিতসমূহে সে দৃষ্টান্ত অজস্র। শ্রীচৈতন্যদেব তাই একাধারে ঐতিহাসিক তথ্যের আকর, আবার দর্শনের ভাবসমৃদ্ধ তত্ত্বের উৎস। ঐতিহাসিক পর্যায়ে তিনি রাধাকৃষ্ণের দীন ভক্ত, আবার দর্শন-পর্যায়ে তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ', —'অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং'। এই রহস্যময়তার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে কবি কর্ণপুরের শ্রীঅদ্বৈতাচার্য দ্বিধাগ্রস্ত। স্বরূপ কোন্‌টি—গৌর না কৃষ্ণ! আচার্য শ্রীঅদ্বৈতের তাই সংশয়ান্বিত স্বগতোক্তি ঃ

> —"কিমত্র ব্রূমহে মহেচ্ছং প্রতি যদি তবৈতদেব স্বরূপং তদা দর্শনীয় শ্যামসুন্দর বিগ্রহাভিলাষো বিশ্রান্তঃ যদি স এব স্বরূপমিত্যুচ্যতে তদাস্মিন্ প্রেমহানিরিতি ক্ষণং পরামৃশতি।"
>
> (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকং ॥ ২ / ৫০ ॥)
>
> ["আহা! আমি এক্ষণে কি বলিব! যদি বলি—'আপনার এই গৌররূপই স্বরূপ; তাহা হইলে পরমসুন্দর সেই শ্যামসুন্দর রূপ দেখিতে যে বাসনা হইয়াছিল, তাহা বৃথা হয়। আর যদি 'কৃষ্ণরূপই তোমার স্বরূপ'—ইহা বলি, তাহা হইলে এই গৌররূপে প্রণয়ের ন্যূনতা প্রতীত হয়। তবে আমি কি করি!"
>
> —অনুবাদ ঃ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।]

ভারতবর্ষের চিরায়ত ধর্মসাধনার ইতিহাসে নির্বিশেষ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের আনন্দ বা হ্লাদিনীসত্তার পরিপূর্ণ জাগরণের মধ্য দিয়ে পরম প্রেমময় মধুর রসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ মাধুর্যসত্তার আবিষ্কারই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের

সর্বাপেক্ষা বড় অবদান। গৌড়ীয় কবির নাটকে ভগবান অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব ও ভক্তচূড়ামণি শ্রীরায়রামানন্দের সংলাপে এই গৌড়ীয় কৃষ্ণতত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে শ্রীরায়রামানন্দের কণ্ঠে ঃ

"ভগবান—'কা বিদ্যা ?'
রামানন্দ—'হরিভক্তিরেব ন পুনর্বেদাদিনিষ্ঠাততা ॥'
ভগবান—'কীর্তিঃ কা ?'
রামানন্দ—'ভগবৎ পরোহয়মিতি যা খ্যাতির্ন দানাদিজা ॥'
ভগবান—'কা শ্রী ?'
রামানন্দ—'তৎপ্রিয়তা ন বৈ ধনজনগ্রামাদি ভূয়িষ্ঠতা ॥'
... ...
ভগবান—'ক্ব স্থেয়ং ?'
রামানন্দ—'ব্রজ এব ॥'
ভগবান—'কিং শ্রবণয়োরানন্দি ?'
রামানন্দ—'বৃন্দাবন-ক্রীড়ৈকা ॥'
ভগবান—'কিমুপাস্যমত্র ?'
রামানন্দ—'মহসী শ্রীকৃষ্ণরাধাভিধে ॥'

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকং ॥ ৭/১৩-১৪ ॥)

এই কৃষ্ণতত্ত্বই মহাকবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যে আরো বিশদ ও রসবাহী হয়ে উঠেছে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ সংলাপে। দীর্ঘ হলেও প্রাসঙ্গিক অংশটুকু শ্রীচৈতন্য-সৃষ্ট বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণমাধুর্যসার সাধনাদর্শের আন্তর-রূপটিকে নিঃশেষে তুলে ধরে এবং সে কারণেই তা উদ্ধারযোগ্য ঃ

প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা, বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥
কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥
সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম যার সেই বড় ধনী ॥

দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাই আর॥
মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত-শিরোমণি॥
গান-মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে-গীতের মর্ম॥
শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিনা শ্রেয় নাহি আর॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ॥
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান-প্রধান॥
সর্ব ত্যজি জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলা রাস॥
শ্রবণ-মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥"

(চৈ. চ. ॥ ২/৮/১৯৯-২১০ ॥)

'প্রেমাবেশে মত্তসিংহ'-প্রায় শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তনে এই কৃষ্ণ নামই ছিল এক এবং অদ্বিতীয় মন্ত্র এবং তার মধ্য দিয়েই একান্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণ-প্রেমভক্তিরসের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থতা। কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন ঃ

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥ (ঐ॥ ২/৮/২১২-'১৩॥)

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কোন দর্শন বা শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করে জীব ভক্তের পরম

পুরুষার্থস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমদর্শনের প্রচার করেন নি, গৌড়ীয় গোস্বামিগণের রচনায় যে অতল অপার কৃষ্ণমাধুর্য ও রাধাপ্রেম-গভীর গৌড়ীয় দর্শনের রস-বিস্তার ঘটেছে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ লীলাচরণই ছিল তার সর্বপ্রধান উৎস। কখনও বা আপন হৃদয়ে উপলব্ধ পরম রসের সত্যকে উপরি-উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের মত রায়রামানন্দাদি পার্ষদগণের অন্তরে সঞ্চার করে দিয়ে নানা তত্ত্বজিজ্ঞাসার ছলে তাঁদের দ্বারাই ব্যক্ত করেছেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপামুগ্ধ রায়রামানন্দের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

"কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পঢ়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে॥"

(ঐ ॥ ২/৮/২১৭-'১৯ ॥)

কৃষ্ণমাধুর্যের সেই পূর্ণতম রূপ অনুসন্ধানেই শ্রীচৈতন্যদেবের রাধার ভাব-কান্তি গ্রহণ, কেননা একমাত্র শ্রীরাধার প্রেমের ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন স্বরূপ মাধুর্যসত্তার পূর্ণ বিকাশ। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় :

"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥"

(গোবিন্দলীলামৃত ॥ ৮/৩২ ॥)

শুধু তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনে শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্যও নিত্য বৃদ্ধিশীল, আবার সেই অভিঘাতে কৃষ্ণরসমাধুর্যও লাভ করে অনন্ত বৃদ্ধি। বৈষ্ণব দর্শনে একে বলা হয় অসমোর্ধ্বমাধুর্য।[৪] এই অসমোর্ধ্বমাধুর্যের পথেই শ্রীরাধার

৪. চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি স্মরণীয় :

"রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাই ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥
... ...
মোর মাধুর্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে—কেহ নাহি হারি॥" (॥১/৪/১১১, ১২৪ ॥)

প্রেমের 'সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী' মাদনাখ্য মহাভাবে পরিণতি। শ্রীচৈতন্যদেবই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের একমাত্র পথ হ'ল সেই মাদনাখ্য মহাভাব, যা শ্রীরাধা ব্যতীত ব্রজপরিকরদের মধ্যে আর কারও অধিকায়ভুক্ত নয়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রদত্ত মাদনের সংজ্ঞার মধ্যেই সে পরিচয় পাই :

"সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎ পরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥"

(উজ্জ্বলনীলমণি॥ স্থায়িভাব-প্রকরণ/২১৯॥)

["রত্যাদি মহাভাব-ভেদের অধিরূঢ় মোদন পর্যন্ত যাবতীয় ভাবের যে প্রাকট্য, তাহা হইতেও অধিক উৎকর্ষবিশিষ্ট, অতএব শ্রেষ্ঠ মোদন-মহাভাব হইতেও অত্যুৎকৃষ্ট যে হ্লাদিনী-নামক মহাশক্তির স্থিরাংশ—যাহা কেবল শ্রীরাধাতেই সদাকাল বিরাজ করে, তাহাকে 'মাদন' বলে। এই মাদন কিন্তু ললিতাদিতেও উদয় হয় না।"

—ভাবানুবাদ : শ্রীহরিদাস দাস।]

এই মাদনের অন্তঃস্বরূপ এতই সূক্ষ্ম ভাবরসে পূর্ণ রহস্যময় ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত যে তার স্পষ্ট লক্ষণ কারও যুক্তি কিংবা অনুভবেরও গোচর নয়[৫], যে কারণে শ্রীরাধার প্রেমস্বরূপও নিত্য নূতন ভাববৈচিত্র্যে অশেষ মাধুর্যে স্পষ্ট অনুভবের অগোচর। শ্রীরূপ গোস্বামী সেই প্রেম বা উজ্জ্বলরসের আলোচনায় সুবিশাল মহাকাব্য 'উজ্জ্বলনীলমণি' সমাপ্ত করেও সম্পূর্ণতার অভাবে তাই তৃপ্তি পান নি, উপসংহারে জানিয়েছেন :

"অতুলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্বিগ্রাহতাম্।
স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো ময়া॥

(উ. নী.॥ উপসংহার/১॥)

["ঐ মধুর রসসমুদ্রের কেবল তটে স্থিত হইয়া (উদাসীনভাবে) আমি যৎসামান্য স্পর্শমাত্রই করিলাম, কিন্তু উহাতে প্রবেশ করিতে পারি নাই। যেহেতু ঐ রসসমুদ্র—অতুল (অপরিমিত) এবং

৫. স্মরণীয় : "মাদনস্য গতিঃ সুষ্ঠু মদনস্যেব দুর্গমা।
ন নির্বক্তুং ভবেচ্ছক্যা তেনাসৌ মুনিনাপ্যলম্॥" (উ. নী.॥স্থায়ি° ২২৬॥)

অপার (সমাপ্তি-রহিত) বলিয়া দুর্বিগ্রাহ্য অর্থাৎ সম্যক্‌প্রকারে বোধগম্য হইতে পারে না।"]

রাধাভাবতনু হিসাবে শ্রীচৈতন্যদেবও ছিলেন মহাভাবের সুতরাং মাদনাখ্য মহাভাবেরও সাধক। নীলাচলে তাঁর শেষ দ্বাদশ বৎসরের দিব্যোন্মাদ দশায় একদিকে প্রকাশ পেয়েছে রাধার রহস্যগভীর সূক্ষ্ম-ভাবরসপূর্ণ অনন্যসদৃশ প্রেমস্বরূপ, কৃষ্ণমাধুর্য-রসের আস্বাদে রাধারই প্রেমবিহ্বলতার,—বাহ্যচেতনা-হীন রসবিভোর মানসিক অবস্থার উন্মাদ স্বরূপ, অপরদিকে সে সকল আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে কৃষ্ণের অশেষ মাধুর্যসত্তার পরিচয়। শ্রীচৈতন্যের এই সাধনা প্রত্যক্ষ করেই শ্রীস্বরূপ গোস্বামী তাঁর 'কড়্‌চা'য় শ্রীচৈতন্যের প্রতি প্রণাম জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন :

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥"

["রাধা স্বরূপতঃ কৃষ্ণপ্রেমই. তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা ও কৃষ্ণের সত্তা ভিন্ন নয়, কিন্তু লীলার জন্যই তাঁরা ভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন আবার তাঁরা চৈতন্যের মধ্যেই এক হয়েছেন, প্রকট হয়েছেন চৈতন্যরূপে। রাধার গৌরকান্তি ও কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন—সেই চৈতন্যকে নমস্কার করি।"—অনুবাদ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার।]

শুধু তাই নয়, নিত্য পার্শ্বচর শ্রীস্বরূপ গোস্বামীই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে বৈষ্ণব-সাধনায়, সাহিত্যে, দর্শনে চৈতন্যতত্ত্বের সর্বপ্রথম অবতারণা করে গেছেন ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি অপূর্ণ বাসনার উল্লেখ করে :

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ—
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

অর্থাৎ, শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধার প্রেমের আলোকপাতে কৃষ্ণ-মাধুর্যরসের চমৎকারিত্ব কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের অনুভবে শ্রীরাধার আনন্দ-লাভের স্বরূপ কেমন—এই তিন বাসনা পরিপূরণের জন্যই শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভরূপ সিন্ধু থেকে উত্থিত হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত বাস্তব কৃষ্ণপ্রেমভাবের সাধনাই তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত বা মতবাদ গ্রহণে প্রত্যক্ষদর্শী পার্ষদবৃন্দ ও বৈষ্ণব সাধকদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, সুতরাং সে সিদ্ধান্ত কবিকল্পনার কিংবা ভক্তি-আবেগের ফল নয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর দৃষ্টিতেও তিনি ছিলেন ব্রজগোপীদের সমগ্র প্রেমের সারভাগ বা নির্যাসস্বরূপ।—"বিনির্যাসঃ প্রেম্নোনিখিলপশুপালা-ম্বুজদৃশাং…।" (স্তবমালা॥ চৈতন্যস্তব ১/২॥) বাস্তবিক প্রেমভক্তির সর্বোচ্চ-রূপ মাদনাখ্য মহাভাবের একমাত্র অধিকারিণী শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমানুভবের প্রতিটি অভিব্যক্তি একান্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থার কালে, আর সেই আস্বাদের বিভোরতা হেতুই তিনি একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন রাধাতনুর সঙ্গে। তাঁর জীবনচরিত বিষয়ক বিভিন্ন রচনা থেকে তাঁর আচরণে মাদনাখ্য মহাভাববতী রাধার রূপটিকে চিনে নিতে তাই কোন অসুবিধা হয় না। চৈতন্যপার্ষদ কবি মুরারি গুপ্তের 'কড়্চা' নামে পরিচিত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' কাব্যে প্রত্যক্ষ-দর্শনসঞ্জাত শ্রীচৈতন্যের বিশেষণা-ত্মক শব্দগুলি স্মরণীয়, যথা—'রাধারসবিলাসী', 'রাধাভাবমাপন্নং', 'রাধারসা-বেশঃ', 'শ্রীরাধিকা প্রেমভরাতিমত্তঃ', 'শ্রীরাধাভাবমাধুর্যপূর্ণঃ' ইত্যাদি।[৬] তাই বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ-লীলাকাহিনীর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে গৌর-চন্দ্রিকা ও সাধারণভাবে গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়ক অজস্র পদ, তাই চৈতন্যলীলা-কেন্দ্রিক অজস্র কাব্য-নাটক-জীবনচরিত বৈষ্ণব ধর্মের বেদরূপে পরিগণিত হয়েছে।

বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্যদেব তাই ধর্মাচার্য বা ধর্মসাধক হিসাবে পূজিত হননি, রাধাপ্রেমতনু হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়াও বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁকেই পরতত্ত্ব এবং বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণেরই রূপান্তর হিসাবেও গ্রহণ করেছেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।" (চৈ. চ.

৬. দ্রঃ যথাক্রমে ৩/৫/১৪, ৩/১৫/২৩, ৪/৫/১৫, ৪/২০/১৪ ও ৪/২৪/১.

॥ ১/১/৩ ॥)। অর্থাৎ—কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্য থেকে পরতত্ত্ব আর কিছুই নেই আর বারাণসীর কবি ও অন্যতম চৈতন্য-পরিকর শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকে শঙ্কর-নারদাদি ও ব্রজপরিকরবৃন্দসহ বৃন্দাবন-কৃষ্ণেরই আবির্ভাব বলে বর্ণনা করেছিলেন তাঁর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' কাব্যে।[৭] শুধু তাই নয়, কবি-কর্ণপুর জানিয়েছেন বৃন্দাবনের গোপীবৃন্দই নবদ্বীপলীলায় চৈতন্য-পার্শ্বচর হিসাবে পুরুষদেহ ধারণ করে বৃন্দাবনের স্বভাব অনুযায়ী শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে লীলা করেছিলেন :

"গৌরেণ তৎপ্রিয়ৈঃ সার্ধং ধৃতপুরুষবিগ্রহাঃ।
খেলান্ত স্ম স্বভাবানুসারাত্তাঃ ক্রমশো যথা ॥
(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ॥ ১৯৮ ॥)

এ আদর্শই ভক্তি-আতিশয্য ও আবেগাতুর কবিকল্পনায় অতিরঞ্জিত হয়ে নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ বসু প্রমুখ চৈতন্য-সমসাময়িক কবিগণের রচনায় গৌরপারম্যবাদ ও গৌরনাগরভাবের বিকাশ ঘটিয়েছিল। যেমন,—বাসুদেব ঘোষের একটি পদ :

"যখন দেখিনু গোরাচাঁদে।
তখনই পড়িনু প্রেমফাঁদে ॥
তনুমন তাঁহারে সঁপিনু।
কুলভয়ে তিলাঞ্জলি দিলুঁ ॥"
(শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ॥ ৩/২/১২ ॥)

কিংবা শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণে কবি রামানন্দের নাগরীভাবের বিরহ-কাতরতা :

"পাপী মাঘে পহুঁ কয়ল সন্ন্যাস।
তবহি গেও মঝু জীবন-আশ ॥

---

৭. "সর্বে শঙ্কর-নারদাদয় ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি প্রাপ্তা দেব
হলায়ুধোঽপি মিলিতোজাতাশ্চ তে কৃষ্ণয়ঃ।
ভূয়ঃ কিং ব্রজবাসিনোঽপি প্রকটা গোপালগোপ্যাদয়ঃ
পূর্ণ প্রেমরসেশ্বরেঽবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥" (চৈতন্যচন্দ্রামৃত ॥১১৮॥)

দিনে দিনে ক্ষীণ তনু ঝরয়ে নয়ন।
গোরা-বিনু কতদিন ধরিব জীবন॥
অবহুঁ বসন্ত বহুত সুখময়।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয়॥" (ঐ॥ ৫/৪/২৬॥)

এ ধরণের অজস্র গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ সঙ্কলিত হয়েছে 'শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি সঙ্কলন গ্রন্থে। স্পষ্টই বোঝা যায় দার্শনিক তত্ত্ব-বিশ্লেষণ কিংবা ঐতিহাসিক তথ্য-বিতরণ এ সকল পদের উদ্দেশ্য নয়, উৎকট তারল্যে শালীনতার সীমাও এ সকল পদে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি, যে কারণে অনেক কবিই ভর্ৎসনার্হ ;—তাহলেও বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্যদেবের স্থানটিকে এগুলি থেকে অনায়াসেই চিনে নেওয়া যায়। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ রচিত কাব্য-দর্শনাদিতে প্রকাশিত বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি যে অমূলক নয়, তার একাংশের প্রমাণ যে এই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন যে অজস্রবিধ ধর্মসাধনা ও ধর্মসাধকসম্প্রদায়-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল,—তার পশ্চাতে কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সাধন-মহিমা নয়, বাহ্যিক কতকগুলি কারণও ছিল। অবশ্য সেগুলিও শ্রীচৈতন্যদেবকেই নিঃশেষ গরিমা দান করে। সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণটি হল শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্মের সাম্প্রদায়িক মনোভাবশূন্যতা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই শ্রীচৈতন্যদেব প্রবাহিত করে দিয়েছেন উদার প্রেমভক্তিধর্মের রসস্রোত। মূর্তিপূজার বা ঈশ্বরের সাকার অস্তিত্বজ্ঞানের বিরোধী মুসলমান ধর্মাবলম্বী সাধকগণ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের উদার প্রেমধর্মের প্রভাবে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্তে পরিণত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে দৃষ্টান্ত হিসাবে অন্যতম হলেন যবন হরিদাস। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ্ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ না করলেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা থেকে দেখা যায়, সুলতান হুসেন শাহ্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর বলেই মনে করতেন :

"হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে।
সে-ই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্বজনে॥" (অন্ত্য খণ্ড/৪র্থ অধ্যায়)

এবং আপনার রাজ্যে আগত শ্রীচৈতন্যদেবের অবাধ স্বাধীনতার আজ্ঞা জানিয়ে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে॥
সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।
কি বিরলে থাকুন, যে লয় তাঁর মন॥
কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোনো জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥" (ঐ/ঐ)

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত উদার প্রেমধর্মের সাম্প্রদায়িক মনোভাব-শূন্যতার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ বহু মুসলমান কবি কর্তৃক রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক অজস্র পদ রচনা। অথচ মুসলমান ধর্মাবলম্বিগণ মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। যেমন সৈয়দ মর্তুজার নিবেদনের পদে শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণের বাসনা ঃ

"সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে
জীবন-মরণ ভরি॥"
(বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি ঃ
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য/পদসংখ্যা-১১২)

অবথা কবি ইরকানের অন্তিম আকুতি—"শ্যামের চরণ যেন পাই।" (ঐ/১৭) কিংবা কবি নশীর মামুদের ভণিতা ঃ

"নশীর মামুদ করত আশ,
চরণে শরণ দানরি॥" (ঐ/৫২)

এ সকল পদ মুসলমান কবিগণের নিষ্ঠাভক্তিপূর্ণ বৈষ্ণবপ্রাণতাকেই অনাবৃত প্রকাশ করেছে। অথচ এঁরা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন নি, আপন ধর্ম-সমাজে বাস করেই উদার প্রেমমন্ত্রে অন্তরকে আলোকিত করে তুলেছিলেন। কবি

বামন উদাসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমরাগ প্রতিকূল পরিবেশে যেন করুণ রাগিণী হয়ে ফুটে ওঠে নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে :

"হিন্দুরা বলে তোমার রাধা, আমি বলি খোদা।
রাধা বলিয়া ডাকিলে মোল্লা মুন্সীতে দেয় বাধা॥"

এ সকল মুসলমান কবি পদ-রচনায় মহাজন কবি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসকে অনুসরণ করেছেন সত্য, কিন্তু এই বৈষ্ণব-মনস্কতার পশ্চাৎ ভূমিতে একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের গৌরবময় অবদানটিকে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। মুসলমান কবিগণও তাঁদের কর্ণে প্রেমমন্ত্রদাতা এই প্রেমময় মানুষটির প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, নিষ্ঠা নিঃশেষে অর্পণ করে দিতে তাই দ্বিধা করেন নি। ভক্ত হুছনকে বলতে শুনি :

"গউর চান্দ আমার।
তোমার লাগি আমি ঘরের বার॥" (ঐ/১২১)

আর, "আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।…"(ঐ/৯৩)-পদের গায়ক-কবি লালন ফকির শুধু শ্রীচৈতন্যের নতুন ভাবরসে বিভোরই হননি, সেই ভাবরসকেই জীবন-সাধনায় রূপান্তরিত করে হয়ে উঠেছিলেন জাতি-নির্বিশেষে সূফী-প্রেমসাধক। তাই তো গাইতে পেরেছিলেন—"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে ?…" এমন কি তৎকালীন দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহ্ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমাদর্শে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রেম ভিক্ষা করে ব্রজবুলি ভাষায় গৌরাঙ্গস্তোত্র রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন :

"জীউ জীউ মেরে মন-চোরা গোরা।
আপহিঁ নাচত আপন রসে ভোরা॥
… … … …
ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারী।
শাহ্ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী॥"

(গৌ. প. ত. ॥ ৪/২/২৯ ॥)

শ্রীরূপ গোস্বামী-সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি হিসাবে ধৃত একটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের জাতিভেদ-নিরপেক্ষ সার্বজনীন মনুষ্যত্বের পরিচয়টি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে :

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নো বা বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে—
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥" (পদ্যাবলী॥ ৭২॥)

["আমি বিপ্র, নরপতি, বৈশ্য বা শূদ্র নই। আমি ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমের কোনটির ব্রতী নই। কিন্তু যিনি পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রের ন্যায় পূর্ণরূপে বিকশিত,—সেই গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদ্বয়ের দাসেরও দাসানুদাস।"]

ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র বক্তব্য ছিল—কৃষ্ণপ্রেমভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং একমাত্র সেই ভক্তির মানদণ্ডেই মানুষের মূল্যবিচার। ভাগবতের —"শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।" (॥ ৩/৩৩/৭॥) অর্থাৎ 'যাঁর রসনায় তোমার নাম, তিনি চণ্ডাল হলেও পূজ্য'—এ কথা তিনি বারবার উচ্চারণ করেছেন এবং আজীবন আপনার আচরণেও প্রকাশ করেছিলেন তার সত্যতা। বৈষ্ণব ধর্মের সারকথা হিসাবে শ্রীসনাতন গোস্বামী তাই লিখেছিলেন—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।" (হরিভক্তিবিলাস)। শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম প্রকৃতপক্ষে এরূপ উদার প্রেমভক্তিধর্ম যে কারণে তা সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মাকে প্লাবিত করে সৃষ্টি করেছিল ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় রেনেসাঁস, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিবোধ ছিল যার মূলকথা। এই উদার প্রেমভক্তিধর্মে আন্তর-দীক্ষা নিয়ে মুসলমান কবি লালমামুদ কৃষ্ণ-সম্বোধনে খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন অন্ধকারমুক্ত আলোর পথ ঃ

"তুমি দয়া করে ঘুচাও নাথ মনের অন্ধকার।
হিন্দু কিম্বা হৌক মুসলমান,
তোমার পক্ষে সবই সমান,
আপন সন্তান জাতির কি বিচার?
ভক্ত সকলজাতির শ্রেষ্ঠ চণ্ডাল কি চামার।
জন্ম নিয়া মুসলমানে বঞ্চিত হব শ্রীচরণে
আমি মনে ভাবি না একবার।
(এবার) লালমামুদে হরেকৃষ্ণ নাম করেছে সার॥"

(বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি॥ ৯৫॥)

প্রেমভক্তির বিতরণক্ষেত্রে এই সর্বনিরপেক্ষতাই শ্রীচৈতন্যদেবকে বৈষ্ণব-ভক্তের দৃষ্টিতে কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও গৌরবাধিক্য দান করেছে। কেননা, ভাগবতের দৃষ্টান্তে দেখা যায় প্রেমভক্তি দানের ক্ষেত্রে সেই উদারতা শ্রীকৃষ্ণের ছিল না। তিনি তাঁর ভজনাকারীদের বরং মুক্তিদান করেন, কিন্তু প্রেমভক্তি সকলকে দেন না — "…ভজতাং মুকন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥" (॥ ৫/৬/১৮ ॥) শ্রীচৈতন্যদেব সেক্ষেত্রে নির্বিশেষ ধর্ম-পরায়ণকেই শুধু নয়, বরং বিশেষভাবে পাপী ব্যক্তিদের প্রতি অধিকতর কৃষ্ণ-ভক্তি-বিতরণের আজ্ঞা দিয়েছিলেন শিষ্যমণ্ডলীকে। চৈতন্যভাগবতে জগাই-মাধাই উদ্ধারকালে নিত্যানন্দের কথায় তার পরিচয় মেলে :

"প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঁই॥
সভাবে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ॥" (॥ মধ্য/১৩শ ॥)

আবার অপরদিকে, বৈষ্ণব সাধনক্ষেত্রে যেহেতু সম্ভোগ বা মুক্তিবাসনার প্রেমলাভ ঘটে না, কেননা প্রেমরস-মাধুর্যের আস্বাদবিভোরতা বিরহ বা বিপ্রলম্ভাদর্শের কৃষ্ণতন্ময়তায়, এবং শ্রীচৈতন্যলীলায় সেই বিপ্রলম্ভাত্মক প্রেম-মাধুর্যেরই নিত্যপ্রকাশ, সে হিসাবেও বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যদেব অধিকতর বরণীয় হয়ে উঠেছেন। বৈষ্ণব সাধকগণের অনুভবে ধরা পড়েছে :

"শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ। বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ গৌরসুন্দরের সম্ভোগময়ী লীলাই শ্রীকৃষ্ণলীলা। …আবার সম্ভোগময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভময়ী লীলাই গৌর-লীলা।" (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ ও সমাধান সম্পদ ২য় খণ্ড/পৃ. ৭০)

সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করা ব্যতীত কৃষ্ণমাধুর্যরস বৈষ্ণবদের নিকট পুষ্টিলাভ করতে পারে না। তাই শ্রীচৈতন্য-বিতরিত প্রেমভক্তিরস লাভের জন্য বৈষ্ণব ভক্তগণ ব্যাসদেব, উদ্ধব প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপেক্ষাও অধিকতর

সৌভাগ্যসুখের অধিকারী বলে বর্ণিত হয়েছিলেন কবি প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত'-কাব্যে।[৮]

শ্রীচৈতন্যদেবের এই উদার প্রেমমহিমা ও বিরাট ঐতিহাসিক মর্যাদাই তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মকে বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে পঞ্চম সম্প্রদায় হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করে। শ্রীচৈতন্যদেব তাই ভারতবর্ষের সমগ্র বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণদাতা প্রাণপুরুষ তো বটেই[৯], তাঁর মর্যাদার দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে—তিনি সমগ্র ভারতের রসময় আধ্যাত্মিক প্রাণসত্তারও পরম জাগরণ,—ভাষান্তরে যা আমরা আচার্য দীনেশ-চন্দ্র সেনের কণ্ঠে পূর্বেই শুনেছি।

৮. "ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তি-বর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ॥"

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ॥ ১৮ ॥)

["ব্যাসদেবাদি মহর্ষিগণও যে মধুর ভক্তিমার্গে বিভ্রান্ত হয়েছেন, পূর্বে যে ভক্তি পৃথিবীর কারও বুদ্ধি দ্বারা প্রকাশিত হয়নি এমনকি স্বয়ং ঋষি শুকদেবেরও অজ্ঞাত ছিল, যা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ কোন ভক্তের নিকট উদ্ঘাটিত করেন নি,—সেই উজ্জ্বল বা মধুর ভক্তিপথে গৌরাঙ্গপ্রিয় ভক্তগণ সুখে ক্রীড়ারত।"]

৯. শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যপ্রণাম স্মরণীয় :

"নমশ্চৈতন্যরূপায় পুরন্দরসুতায় চ।
বৈষ্ণব প্রাণদাত্রেব গৌরচন্দ্রায় তে নমঃ॥" (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্/পৃ.৪৪
—চক্রতীর্থ / পুরী সংস্করণ।)

॥ বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন ঃ বীজ ও বিবর্তন ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাধনা শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেই নয়, —এককথায় সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-দর্শন-সাধনার ক্ষেত্রেই বিবর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। ভক্তিরসের এমন বিশাল ব্যাপ্তি, প্রগাঢ়তা, ঔজ্জ্বল্য ও গৌরবমণ্ডিত আদর্শ,—যা এ ধর্ম-দর্শন-সাধনার প্রাণবায়ু,—তার সমতুল আদর্শ আর কোথাও নেই। এ আদর্শ কেবলমাত্র 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা'য় উদ্বুদ্ধ রাগময় প্রেম,—যার বিবর্তনের উচ্চতম মহিমালোক—'মহাভাব'।[১] তাই এ ধর্মের আর এক নাম প্রেমধর্ম, এ দর্শনের নামান্তর প্রেমদর্শন, এ সাধনার বিশেষ পরিচিতি প্রেম-সাধনা হিসাবে। এ প্রেম সম্পূর্ণরূপে আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাসনাশূন্য, নির্মল, নিরুপাধি, অকৈতব, অহৈতুকী। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত এই নিত্য প্রেমরসকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন এক সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করে তাকে একদিকে যেমন চিরকাল সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে, তেমনি অপরদিকে অজস্র শাস্ত্রীয় সমর্থনে সে প্রাণরসের পরম পরিপুষ্টি ও বিবর্তন ঘটিয়ে দর্শনজগতে তার মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব ও একান্ত উপযোগিতাকে সপ্রমাণ করেছে।

জীবের পরম কল্যাণ-বিধানে তাদের প্রকৃত সত্যের পথে পরিচালনার লক্ষ্য নিয়েই জীবজগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াসে দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি। ভারত-সভ্যতার ব্রাহ্মলগ্নে আর্যশাস্ত্রের প্রাচীনতম অধ্যায়েই আমরা দেখি—ব্যবহারিক জগতের নানা চিত্তবিক্ষিপ্ততা ও বস্তুসুখমগ্নতার মধ্যেও ব্রহ্ম ও জীবজগৎ সম্বন্ধে এক প্রগাঢ় কৌতূহল মাঝে মাঝেই আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। তাই, পার্থিব জগতের বহুবিধ ভোগ্য-বস্তুর প্রার্থনায় ও সে জীবনের কল্যাণ-কামনায় নানা সকাম যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে তাঁরা লিপ্ত থাকলেও সেই বহির্মুখিনতার মধ্যেও কোন কোন আর্য-

১. "প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ॥২/১৯/১৫২॥)

ঋষিচিত্ত জীব-ব্রহ্মের পারস্পরিক সম্পর্কজ্ঞানের স্পৃহায় অন্তর্মুখী চিন্তা ও উপলব্ধির জগতে লীন হয়ে যাবার একান্ত বাসনায় আকুল হয়ে উঠেছিল। কর্মকাণ্ডী বৈদিক সংহিতায় তাঁরা সংযোজন করতে চেয়েছেন তাঁদের পরম তত্ত্বোপলব্ধির সেই আভাসিত রূপটিকে। যেমন নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রাংশটি :

"ন ঘা ত্বদ্রিগপ বেতি মে মনস্তে ইৎকামং পুরুহূত শিশ্রয়।"

(ঋগ্বেদ সংহিতা ॥ ১০/৪৩/২ ॥)

["হে ইন্দ্র! তোমার দিক হইতে আমার মন অন্যত্র যায় না, আমি তোমার উপর আমার অভিলাষ সংস্থাপন করিয়াছি।"—অনুবাদ : রমেশচন্দ্র দত্ত।]

কৃষ্ণাখ্য ঋষি-উচ্চারিত মন্ত্রাংশটিতে দেবতা ইন্দ্রের প্রতি পার্থিব বাসনা-বিমুক্ত নির্মল আত্মিক সংযোগ-স্থাপনের ঐকান্তিক প্রয়াস লক্ষ্যণীয়ভাবেই ফুটে উঠেছে। ভারতবর্ষে ধর্মের আনুষঙ্গিক হিসাবে দার্শনিক প্রত্যয়ের সূচনা হয়তো সংহিতার এ ধরণের মন্ত্র বা মন্ত্রাংশগুলিতেই। বিরল-ব্যতিক্রম হলেও সমগ্র সংহিতা-সাহিত্যে এদের সংখ্যা খুব কম নয়।[২]

এই আভাসিত ব্রহ্মজ্ঞান সংহিতার পরবর্তী যুগে প্রথম বিকাশলাভ করে বিভিন্ন উপনিষদ্ রচনার মধ্য দিয়ে। এ কারণেই উপনিষদের অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা. যে অভিধা আচার্য শঙ্কর প্রাচীন দ্বাদশ উপনিষদ সম্পর্কে[৩] প্রয়োগ করেছিলেন :

২. দ্রষ্টব্য—ঋক্ ॥ ১/১৬৪/২০, ২/১০/১, ৩/৬২/৮, ৫/৮৬/৪, ৭/৮৮/৩-৬, ৮/৪/১, ১০/৪০/২, ১০/৪৩/১ ; সাম ॥ উত্তরার্চিক /২১/৮/৩ ; কৃষ্ণ যজুঃ ॥ ১/১/৪ ১/১/৭, ১/২/৮-৯, শুক্ল যজুঃ ॥ ৫/৭৭ ; অথর্ব ॥ ১১/৩।১-৩ ॥ প্রভৃতি সংখ্যক মন্ত্র।

৩. আচার্য শঙ্কর যদিও তাঁর বিভিন্ন ভাষ্য রচনায় চৌদটি উপনিষদের নামোল্লেখ করেছেন. তাহলেও ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্বাদশসংখ্যক উপনিষদের উপর ভিত্তি করে,—তাই সেগুলিই হল প্রাচীন বা মূল বৈদিক উপনিষদ। (দ্রঃ উপনিষদ ২য় খণ্ড [হরফ প্রকাশিত] 'প্রকাশকের নিবেদন' ও 'মুখবন্ধ'।) এগুলি হল—ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষীতকি. কঠ, কেন, ঈশ, ঐতরেয়, প্রশ্ন, মুণ্ডক মাণ্ডক্য, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর। সুতরাং আচার্য শঙ্করকথিত ব্রহ্মবিদ্যা অভিধাও এই দ্বাদশ উপনিষদ্ সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

"সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ॥ ১/১/১-এর শাঙ্কর-ভাষ্য ॥)

আর এই ব্রহ্মবিদ্যার মাধ্যমেই সেদিনের আর্যগণ পার্থিব বস্তুসুখমগ্নতার ঊর্ধ্বে সন্ধান পেয়েছিলেন এক অমৃত রসলোকের,—যার আস্বাদকে পরম লক্ষ্য জ্ঞান করে সেদিন সমগ্র আর্যচিত্তের বাসনা দ্বিধামুক্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদিনী পত্নীর কণ্ঠে :

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং ?" (বৃ° উ° ॥ ২/৪/৩ ॥)

ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর এ প্রশ্নেই সেদিন অধ্যাত্মগরিমায় আলোকিত ভারতবাসী পেয়েছিলেন আস্বাদের জগতে এক পরম রসের সন্ধান,—যা সমস্ত সঙ্কীর্ণতা-বোধের ঊর্ধ্বস্থিত অনাদি, অনন্ত ও নিত্যসুখের বস্তু, যা—'ভূমা'। বৈদিক সাহিত্যের সর্বশেষ যুগে এই পরম সত্যদর্শনের অধিকার ও আনন্দেই আর্য-ঋষিগণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে পুরোভাগে স্থাপন করে গড়ে তুললেন সকল উপ-নিষদের সার সঙ্কলন—বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র। জীবকণ্ঠে সেদিন সর্বপ্রথমেই ধ্বনিত হ'ল ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানের বাসনা—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" (ব্রহ্ম-সূত্রম্ ॥ ১/১/১ ॥), এবং জীবজগৎ ও ব্রহ্মসম্পর্কে নানাবিধ তত্ত্বজ্ঞান ও অনুভূতি সঞ্চারিত হ'ল ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্তদর্শনে। পরবর্তী স্তরে ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে নানা মতের সমন্বয়সাধন ও পুষ্টিবিধান করে গড়ে উঠল শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন দ্বাদশ উপনিষদ, দ্বিতীয় স্তরে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন এবং তৃতীয় স্তরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—এই ত্রি-ধারার সমন্বয়ই পূর্ণাঙ্গ বেদান্তশাস্ত্র। উল্লিখিত তিনটি ধারা তাই বেদান্তের প্রস্থানত্রয় হিসাবে প্রসিদ্ধ ; – উপনিষদ্সমূহ বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র তর্কপ্রস্থান এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গীতা বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান। অতএব বেদান্ত-দর্শনের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতিও এই প্রস্থানত্রয়কে নিয়েই।

ভারতাত্মার প্রাণবাণীটি ধারণ করে এই বেদান্তদর্শন যুগে যুগে অধ্যাত্ম-ভূমি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত ও সুগঠিত করেছে। বেদান্ত-অসমর্থিত কোন ধর্মীয় মতবাদ তাই ভারতবর্ষে কোনকালেই গ্রাহ্য হয়নি বেদান্তেরই "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥" (ব্রহ্মসূত্র ॥ ২/১/২৭ ॥)—অর্থাৎ, 'একমাত্র শ্রুতিই হল সমস্ত সিদ্ধান্তের মূল'—এই সূত্রানুসারে। পরবর্তীকালে

আচার্য-সম্প্রদায়ের জীব-ব্রহ্ম সম্পর্কের স্পষ্টীকৃত ভাষ্য বা ব্যাখ্যারচনাসমূহেও এই বেদান্ত-মতকেই তাই কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে। আচার্য-সম্প্রদায় সৃষ্ট বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের অদ্বৈতবাদ, বিভিন্ন প্রকারের দ্বৈত বা ভেদবাদ, দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ—সবই উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রেরই স্ব স্ব মতে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা। তাই এ সকলই ব্রহ্মসূত্রভাষ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য' বা 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'ও জীব ও ব্রহ্মের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াসেই গড়ে উঠেছে। গোড়ার দিকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোন ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ছিল না, এ সম্প্রদায়ের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য হিসাবে 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য' রচনা করেন শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের দু' শতাব্দীকাল পরে। জীব-ব্রহ্ম সম্পর্কবিচারে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই এ ভাষ্যের মূল তত্ত্ব। তার পূর্বে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এবং গৌড়ীয় সাধক ও আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতা মহর্ষি ব্যাসদেবেরই রচিত পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতকেই আপন সম্প্রদায়ের মূলবেদ ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।[৪] আর গৌড়ীয় সাধনা বিকাশের যুগে সেই ভাগবতের রাগভক্তি-আদর্শেরই পরি-পোষণ ও বিবর্তন ঘটিয়ে আচার্যগণ তাকে চতুর্বর্গ ধর্মার্থকামমোক্ষের ঊর্ধ্বে পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থ হিসাবে দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তিদান এবং দর্শনের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম-সাধনা-সাহিত্য সমস্ত কিছুরই কেন্দ্রে সে রাগভক্তিকে একান্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ মতের পুষ্টিবিধান করেন। শুধু তাই নয়, যে মোক্ষ বা অদ্বৈতমুক্তিকে জগতের সকল ধর্ম-দর্শন-সাধনার ক্ষেত্রেই পরম লক্ষ্য বা সাধন জ্ঞান করা হয়েছে, সেই মোক্ষচিন্তাকে এঁরা

৪. স্মরণীয় ভাগবত সম্বন্ধে গরুড় পুরাণের উক্তি: "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং···" আর স্বয়ং ভাগবতকারের অভিমত: "সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।' (ভা° ॥ ১২/১৩/১৫ ॥)

এ কারণেই চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের উক্তি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি:

"অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ ॥" (চৈ. চ. ॥ ২/২৫/১১০ ॥

পুরুষার্থ হিসাবে সর্বনিকৃষ্ট এবং পিশাচীজ্ঞানে একান্ত ঘৃণাসহকারে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেহেতু মুক্তি বা আত্মসুখভোগের চিন্তায় ভক্তি বা প্রেমের অবসান ঘটে। মুক্তিকামীদের ভক্তিশূন্যতাকে তাঁরা একান্ত প্রকট করে তুললেন তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে :

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ? ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥ ১/২/২২ ॥)

বৈষ্ণব সাধকেরা তাই মুক্তি চান নি, জন্মান্তর গ্রহণের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের কামনা করেননি,—তাঁরা 'নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য' তথা অহৈতুকী ভক্তি বা প্রেমানুভবেই চিরন্তন অবস্থান চেয়েছেন। জগদীশ্বরের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র প্রার্থনা ছিল :

"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥" (শ্রীশিক্ষাষ্টক ॥ ৪ ॥)

অর্থাৎ 'আমার জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী যেন তোমার প্রতিই অহৈতুকী ভক্তি থাকে।' ঈশ্বরকে তাঁরা দেখেছেন তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্যাত্মক গুণ, চেতনা ও শক্তি থেকে মুক্ত করে কেবল মাধুর্যরসের পরিপূর্ণ আকর হিসাবে। আর সেই রসের আস্বাদবাসনায় ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যকালের লীলাসম্পর্ক স্থাপনই বৈষ্ণব সাধকের একমাত্র সাধনা। একমাত্র লীলার মাধ্যমেই নিত্যনূতন বৈচিত্র্য-মণ্ডিত অনাদি অনন্ত সে মাধুর্যরসের আস্বাদন সম্ভব। মুক্তিতে অদ্বয়সত্তা বা একত্বপ্রাপ্তি সে লীলার সম্পূর্ণ অবসান ঘটায়, ফলে সে রসাস্বাদও আর ঘটে না, কেননা সে অবস্থায় আস্বাদ্য রস-সত্তায় আস্বাদক জীব-সত্তার বিলোপ ঘটে। তাই এঁরা অদ্বয় বা মুক্তিচেতনার বিরোধী। তবে রসাস্বাদকালে রসের সঙ্গে যে একাত্মতা বা অদ্বয়বোধ গড়ে ওঠে, এঁরা সে তত্ত্বের বিরোধী নন। এদিক থেকে তাঁরা অদ্বয়কে স্বীকার করেছেন। তবে বলাই বাহুল্য —এ অদ্বয়বোধ মুক্তি নয়। দ্বৈতভাবে কেবল মাধুর্যরসময় ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের সুতীব্র আকর্ষণ বা প্রেমানুভবে মানসলোকে যে নিবিড় ধ্যানময়তা এবং তার দ্বারা সেই পূর্ণরসব্রহ্মের নিত্য অনুভবজনিত যে রসানন্দলাভ,—তাকেই এঁরা সাধনার পরম প্রাপ্তি তথা পরম সাধ্য বা পুরুষার্থ জ্ঞান

করেছেন। এ অনুভবে ভেদ ও অভেদবোধ যুগপৎ জড়িত হয়ে আছে, অর্থাৎ ভেদের মধ্যেও অভেদবোধ আবার অভেদের মধ্যেও ভেদবোধ,—বৈষ্ণব দর্শনের রসভাষ্য বৈষ্ণব কাব্যাদিতে যাদের উপলব্ধি করানো হয়েছে যথাক্রমে ভাবসম্মিলন ও প্রেমবৈচিত্ত্য হিসাবে। যুক্তি-বুদ্ধি-তর্ক বা চিন্তার মাধ্যমে এ তত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ পায় না, তাই এ তত্ত্বের নাম দেওয়া হয়েছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। বেদান্তে মুক্তি বা অদ্বৈত-ভাবনাকে, ঈশ্বরের ঐশীসত্তাকে এবং সাধনক্ষেত্রে জ্ঞানবাদকেই সাধারণভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে বলে এবং এ সকল ধারণাকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন দর্শন ও বেদান্তভাষ্য গড়ে উঠেছে বলে ভক্তিরসবাদী গৌড়ীয় দর্শন-ধর্ম-সাধনাকে অসাম্প্রদায়িক, বেদান্তবিরোধী ইত্যাদি নানা কটূক্তি বা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সে সমালোচনা যে একান্তই ভ্রান্ত,—বেদান্ত-সিদ্ধান্তের সমর্থনের উপরেই যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, পরবর্তী আলোচনাসমূহে আমরা সে পরিচয় পাব।

দুই

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তার দর্শন-সাধনা-সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে যে রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে প্রেমভক্তিকেন্দ্রিক অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সূচনা ও পরিপূর্ণ বিবর্তন সাধন করেছে,—তার মূল ভিত্তি বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্বে। গৌড়ীয় দর্শন সৃষ্টিব্যাপারে বেদান্তমতকেই পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছে। সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত একক ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সে অবস্থায় ঈশ্বরেরও একমাত্র চিৎ-শক্তি ব্যতীত অন্য কোন শক্তির বিকাশ ছিল না। উপনিষদের বর্ণনায় পাই—সেই কেবল চিৎ-শক্তির দ্বারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি একমাত্র আপন আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই দেখতে পান নি:

"সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ॥" (বৃ॰॥ ১/৪/১॥)

বা: "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।"

(ঐতরেয়॥ ১/১/১॥)

ভাগবতের বর্ণনায়ও এ কথার সমর্থন মেলে—"ভগবানেক আসেদমগ্র" (॥ ৩/৫/২৩ ॥) বা :

"স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।" (ঐ ॥ ৩/৫/২৪ ॥)

সেই একরাট্-সত্তায় পরব্রহ্ম কোন আনন্দই খুঁজে পান নি, কেননা একক সত্তায় আনন্দ লাভ করা যায় না। তাই তাঁর দ্বিতীয়কে লাভ করার, বহু হবার বাসনা :

"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।"

(বৃ° ॥ ১/৪/৩ ॥) ;

"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।" (ছান্দোগ্য ॥ ৬/২/৩ ॥) ;

"সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়।" (তৈত্তিরীয় ॥ ২/৬/৩ ॥) ;

"স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।" (ঐতরেয় ॥ ১/১/১ ॥)

অথবা : "সোঽকাময়ত দ্বিতীয় ম আত্মা জায়েত।" (বৃ° ১/২/৪ ॥)

এবং সে বাসনা চরিতার্থ করার জন্যই—"স ইমাঁল্লোকানসৃজত।" (ঐত° ॥ ১/১/২ ॥)। তিনি প্রাণ সৃষ্টি করলেন, তা থেকে শ্রদ্ধা, তা থেকে ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য, তপস্যা, বেদসমূহ, কর্ম ও লোকসমূহ সৃষ্টি করলেন।[৫] আর, এ সকল সৃষ্টিই মূলতঃ আনন্দলাভের জন্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদ তাই বললেন :

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" (তৈ° ॥ ৩/৬ ॥)

আনন্দলাভ হেতুই এ জগতের জন্ম বা সৃষ্টি, আনন্দের মাধ্যমেই এর জীবন-বিকাশ এবং আনন্দে নিত্য সংস্থিতিতেই এ জগতের বিনাশ। এই আনন্দ-লাভের জন্য পুরুষ-প্রকৃতিসম্পৃক্ত একীভূত ঈশ্বর লীলারসাস্বাদের উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাকে দ্বিধাবিভক্ত করে স্ত্রী ও পুরুষ হলেন :

"স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌস ইমমেবাত্মানং দ্বেধা-পাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।" (বৃ° ॥ ১/৪/৩ ॥)

অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির পর ঈশ্বর জগতের বাইরে অবস্থান করেননি, তার মধ্যেই

---

৫. "স প্রাণমসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ অন্নম্, অন্নাদ্বীর্যং, তপো, মন্ত্রাঃ, কর্ম, লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ।" (প্রশ্ন উ° ॥ ৬/৪ ॥)

আপনাকে নানাভাবে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। সে কারণেই জগৎ নিত্য ব্রহ্মময়। বিভিন্ন উপনিষদে সে কথা নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে, যথা—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্" (ঈশ ॥ ১ ॥), "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" (ছা° ॥ ৬/১৩/৩ ॥), "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ঐ ॥ ৩/১৪/১ ॥) ইত্যাদি। উপনিষদের এ সকল তত্ত্বকেই ব্রহ্মসূত্রকার সূত্রাকার দিলেন—"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ।" (ব্র° সূ° ॥ ১/৪/২৬ ॥), "আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ হি।" (ঐ ॥ ২/১/২৮ ॥) "প্রয়োজনবত্ত্বাৎ।" (ঐ ॥ ২/১/৩২ ॥), "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।" (ঐ ॥ ২/১/৩৩ ॥) প্রভৃতি।

বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনের রাধাকৃষ্ণ বেদান্তের এই আনন্দমূল সৃষ্টিতত্ত্বকে অবলম্বন করেই বিকাশলাভ করেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পুরুষ ও প্রকৃতি হিসাবে দ্বিধাবিভক্ত ঈশ্বরই বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনের কৃষ্ণ ও রাধা। আনন্দময় লীলারসাস্বাদের জন্যই তাঁদের এই দুইরূপে আবির্ভাবের কথা শুনিয়েছেন বৈষ্ণব দর্শন :

"রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥

(চৈ. চ. ॥ ১/৪/৮৩-৮৫ ॥)

বলা বাহুল্য, বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্বকে অবলম্বন করেই এ তত্ত্বের জন্ম। এ তত্ত্ব অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব - "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য ॥ ৬/২/১ ॥)-মন্ত্রের কিংবা চতুর্বেদীয় অদ্বয় মন্ত্রসমূহের[৬] বিরোধী নয়, বরং বিবর্তনে সে মন্ত্রগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ

৬, ঋগ্বেদীয় অদ্বয়-মন্ত্র—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" (ঐতরেয় ॥ ৩/১/৩ ॥), সামবেদীয়—"তত্ত্বমসি।" (ছান্দোগ্য ॥ ৬/৮/৭ ॥), যজুর্বেদীয়—"অহং ব্রহ্মাস্মি।" (বৃহদারণ্যক ॥ ১/৪/১০ ॥) এবং অথর্ববেদীয় অদ্বয় মন্ত্র—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" (মাণ্ডুক্য ॥২॥)।

মাধুর্যের তথা আনন্দরসের উৎস হিসাবে প্রেমের ব্যাখ্যা করে তাদের গৌরবকে সর্বোচ্চে স্থাপন করেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন :

"তত্ত্বমসীত্যাদি শাস্ত্রমপি তৎপ্রেমপরমেব জ্ঞেয়ম্।"

(প্রীতিসন্দর্ভ : শ্রীজীব গোস্বামী ॥ ১ ॥)

বৈষ্ণব দর্শনমূল অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের বিশ্লেষক পণ্ডিত এই বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন :

> "জীব ও পরব্রহ্ম উভয়ই চিৎস্বরূপ ; দুইটি চেতন বস্তু সম্বন্ধের বন্ধনে, প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ ; 'তত্ত্বমসি'—জীবতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব উভয়ের সংযোগ-ব্যঞ্জক বলিয়া তাহা প্রীতিকর—প্রেমতাৎপর্যসূচক।" (অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ : শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, পৃ. ৬২-৬৩)

সমস্ত কিছুর মধ্যে এই প্রেম ও আনন্দরসের নিষ্কাশনই গৌড়ীয় দর্শনের পরম শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। আর এই আনন্দরসের নিত্য আস্বাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই তার সমস্ত দর্শনসিদ্ধান্তের বিকাশ।

ব্রহ্মসূত্রের "অংশো নানাব্যপদেশাৎ।" (॥ ২/৩/৪৩), "আভাস এব চ।" (॥ ২/৩/৫০ ॥) ইত্যাদি সূত্রানুসারে এ জগতের সব কিছুই ব্রহ্মের অংশ, সুতরাং জীবও তাই ব্রহ্মাংশই। বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান গীতাতেও জীব সম্পর্কে পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শুনি—"মমৈবাংশো···জীবভূতঃ।" (গীতা ॥ ১৫/৭ ॥) গৌড়ীয় দর্শনও জীবের এই অংশত্ব স্বীকার করেন—"জীবাদয়াস্তু তদ্‌বশ্যাঃ।" (শ্রীগোবিন্দভাষ্যম্ : শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ।) অথবা :

> "অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
> তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে ॥"
>
> (চৈ. চ. ॥ ১/২/১৩ ॥)

সুতরাং বৈষ্ণব দর্শনের জীবতত্ত্ব মূলতঃ বেদান্ততত্ত্বেই প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে ঈশ্বর হলেন অংশী, নিত্যই পরিপূর্ণ ও অখণ্ড ;—এমনকি তাঁরই দেহাংশ দ্বারা জীবজগৎ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও। বৃহদারণ্যক, ঈশ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উপনিষদের শান্তিমন্ত্রে তাই ব্রহ্মের সেই পরিপূর্ণত্বের বর্ণনা শুনি :

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

["উহা (পরব্রহ্ম) পূর্ণ, ইহা (নামরূপে স্থিত ব্রহ্ম) পূর্ণ ; এই সকল সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে উদ্গত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে ; আর সেই পূর্ণস্বভাব ব্রহ্ম হইতে পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অর্থাৎ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।"—অনুবাদ : অতুলচন্দ্র সেন।]

এ তত্ত্বেরই আলোকে বৈষ্ণব দর্শনের আদ্যন্ত পরমভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই পূর্ণস্বরূপত্বই ব্যাখ্যাত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানে কৃষ্ণকেই একমাত্র অংশী করে অন্যান্য ঈশ্বরস্বরূপকেও সেই কৃষ্ণের অংশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা সে সিদ্ধান্ত ও তার যৌক্তিকতার পরিচয় পাব।

এ কথা সত্য যে, বেদান্তের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল নির্বিশেষ অক্ষর পরব্রহ্ম। আর, বৈষ্ণব দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ হলেন সবিশেষ এবং পরম মাধুর্যময় শ্রীভগবান। এ স্বাতন্ত্র্য আপাতদৃষ্টিতে বেদান্তবিরোধী বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বেদান্তে সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই ত্রিবিধ শক্তির সমন্বয়েই ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির পূর্ণতা :

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥" (রামমোহন রায়ের 'বেদান্তসার' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)[৭]

["আমি অন্য দেবস্বরূপ নই, আমি শোকরহিত সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ আমি নিত্য মুক্তস্বভাবের অধিকারী।"]

বেদান্তবাক্য সমর্থনেই ঈশ্বর সম্বন্ধে বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্রহ্মসংহিতা লেখেন :

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥" (ব্রহ্মসংহিতা ॥ ৫/১ ॥)

গৌড়ীয় দর্শন বিষ্ণুপুরাণের শ্রীভগবানের প্রতি ধ্রুবের—"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ॥" (॥ ১/১২/৬৯ ॥)—উক্তি অবলম্বনে উক্ত সৎ,

৭. দ্রঃ রামমোহন রচনাবলী, পৃ. ৬৫. (হরফ)।

চিৎ ও আনন্দ এই তিন রূপে যথাক্রমে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—এই ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ ব্যাখ্যা করেন :

"সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥" (চৈ. চ. ॥ ২/৮/১১৮-'১৯॥)

এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে সদংশের সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাসম্বন্ধিনী শক্তির দ্বারাই ঈশ্বর জীবজগতের ও আপনার সত্তা রক্ষা করেন :

"সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥" (ঐ ॥ ১/৪/৫৬ ॥)

এই সত্তাই তাঁকে সবিশেষ ভগবানরূপে ব্যক্ত করে, তাঁকে মূর্ত ও মর্ত্য করে তোলে, তাঁকে গতিশীলতা দান করে। বেদান্তে ঈশ্বরের এই মূর্ত-মর্ত্য-সবিশেষ সত্তা বিকাশলাভ না করলেও এ সত্তার জন্ম কিন্তু বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান উপনিষদেই :

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।" (বৃহদারণ্যক ॥ ২/৩/১ ॥)

অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই রূপ—মূর্ত ও অমূর্ত, স্থিতিশীল ও গতিশীল, সৎ (ব্যক্ত) ও ত্যৎ বা অব্যক্ত। তাছাড়া ঋগ্বেদ সংহিতায় দেবতা ইন্দ্রের বিভিন্ন রূপধারী মূর্তি পরিগ্রহ করার কথা স্পষ্ট ব্যক্ত হতে শোনা যায়—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।" (ঋক্ ॥ ৬/৪৭/১৮ ॥) ইত্যাদি মন্ত্রে। এমনকি আচার্য শঙ্করও ১/১/১১-সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের ('শ্রুতত্বাচ্চ') ভাষ্যে স্বীকার করেন—"দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে।" এবং তার একটি হ'ল—"নামরূপভেদোপাধিবিশিষ্টং",—অর্থাৎ নাম-রূপ-ভেদ ও উপাধিবিশিষ্ট সবিশেষ রূপ। আর "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।" (ব্র° সূ° ॥ ২/১/৩৩ ॥) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র তো স্পষ্টতঃই ঈশ্বরের সবিশেষ মূর্তরূপের ইঙ্গিত বহন করে। ঈশ্বরস্বরূপে এই মূর্ত ও অমূর্তরূপের যুগপৎ সহাবস্থান বলেই তিনি অচিন্ত্য শক্তির অধিকারী। মূর্ত হিসাবে তিনি গতিশীল, জীবের নিকটে এবং

জগতের অভ্যন্তরে স্থিত, আবার অমূর্তরূপে তিনি জড়, দূরবর্তী এবং জগতের সমুদয়ের বহিঃস্থিত :

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" (ঈশ ॥ ৫ ॥)

ভাগবত অনুসরণে বৈষ্ণব দর্শন শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান—এই তিনরূপের মধ্যে[৮] লীলারসমাধুর্যের সঞ্চারকারী বলে একমাত্র সবিশেষ ভগবানরূপকেই সর্বশ্রেষ্ঠত্বের ও অংশীত্বের বা পূর্ণত্বের মর্যাদা দান করেছেন :

"প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান॥
... ...
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তাঁর রূপ॥" (চৈ. চ. ॥ ১/২/৭, ৫৩ ॥)

আর ব্রহ্ম ও আত্মা রূপদ্বয়কে বর্ণনা করা হয়েছে অংশ বা অপূর্ণ হিসাবে :

"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কান্তি॥
... ...
আত্মা-অন্তর্য্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়॥" (ঐ ॥ ১/২/১০, ১২ ॥)

উপনিষদে 'রসো বৈ সঃ' হিসাবে যে ঈশ্বরের বর্ণনা মেলে, সে রসেরও পূর্ণ বিকাশ এই ভগবানসত্তায় এবং সে রস আস্বাদনের একমাত্র পথ ভক্তি বা প্রেম। ভক্তের কাছে ঈশ্বরের মাধুর্যময় শ্রীভগবানস্বরূপের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে একমাত্র ভক্তি বা প্রেমসাধনার দ্বারাই, জ্ঞান-যোগাদি অন্যবিধ সাধনায় নয় :

"জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥" (ঐ ॥ ২/২০/১৩৪ ॥)

ভাগবতে স্বয়ং কৃষ্ণের কণ্ঠেই আমরা তাই উচ্চারিত হতে শুনি—"অহং ভক্ত-

৮. "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (ভা ॥ ১/২/১১ ॥)

পরাধীনো" (॥ ৯/৪/৬৩ ॥), অথবা "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (॥ ১১/১৪/২১ ॥) ইত্যাদি। বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান, তাই পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণানন্দের পরম মহত্ত্বও একমাত্র তাঁরই মধ্যে বর্তমান :

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥" (চৈ. চ. ॥ ১/২/ ॥)

বৈষ্ণব দর্শনের এই মাধুর্যরসময় ঈশ্বরের দিকে তাকিয়েই ঈশ্বরের পরমরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ লেখেন :

"The chief character of God is love and the power of joy. ....God assumes infinite forms of which the chief is that of Krsna, whose supreme delight is in love." (Indian Philosophy, Vol.-II, p. 762.)

স্বরূপশক্তিমান শ্রীভগবান হিসাবে পরব্রহ্মের নৃসিংহ, বাসুদেব, নারায়ণাদি অনন্ত রূপের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণকে ব্যাখ্যা করার মধ্যেও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বৈষ্ণব দর্শনে। শ্রুতিসমূহের 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ' (তৈত্তি° ॥ ৩/৬ ॥), 'রসো বৈ সঃ' (ঐ ॥ ২/৭/২), "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥" (মুণ্ডক ॥ ২/২/৮ ॥) ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ ব্যতীত পরবর্তীকালের বিভিন্ন উপনিষদে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের রস, আনন্দ বা প্রেমাস্পদসত্তার কথা যদিও বর্ণনা করা হয়েছে বারবার, যথা :

"ত্বমেব পরিপূর্ণানন্দঃ ত্বমেব নিরতিশয়ানন্দঃ।" (মহানারায়ণ উ° ॥ ১ম অধ্যায় ॥),
"অস্মাৎ সর্বস্মাৎ প্রিয়তম আনন্দঘনং হি।" (নৃসিংহোত্তরতাপনী উ° ॥ ২/১ ॥),
"স্বপ্রকাশমানন্দঘনং" (ঐ ॥ ৬ ॥),
"ব্রহ্মমেব মধু।" (নারায়ণ উ° ॥ ৩৮ ও ৩৯ অনুবাক ॥),
"ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পর-প্রেমাস্পদং যতঃ।" (পঞ্চদশী ॥ ১/৮ ॥),
"চিদানন্দময় ব্রহ্ম" (ঐ ॥ ১/১৫ ॥)।

কিন্তু সেই রস বা আনন্দের যথাযথ স্বরূপ এবং বিকাশ কোথাও তুলে ধরা হয়নি। শ্রুতিনির্ভর অন্যান্য দর্শনসমূহও তা করেননি। বিষ্ণু-বাসুদেব-রাম-

নারায়ণাদি বিভিন্ন রূপের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে মিললেও সে সকল ক্ষেত্রে লীলাজনিত পরম রস ও আনন্দের জাগরণ ঘটেনি। ঐশীগুণের ও জ্ঞান-বাদের প্রবল জোয়ারে লীলারস, প্রেমভক্তি অবহেলিতই থেকে গেছে। সেই অপূর্ণতাকেই পূর্ণতা দিয়েছেন গৌড়ীয় দর্শন। শ্রুতিবর্ণিত আনন্দময় ও রসময় ঈশ্বরসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়েছে বৈষ্ণব দর্শনের বৃন্দাবনতত্ত্বে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই আনন্দ ও রসের বিকাশক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা···।" (২/২১/৮৩)। সেই নরলীলার পূর্ণ বিকাশস্থল বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে সকল ঐশীগুণমুক্ত কেবল মাধুর্যরসে পূর্ণ। তাই কৃষ্ণের পূর্ণতমত্ব বৈকুণ্ঠে নয়, একমাত্র এই বৃন্দাবনলীলায়। এমনকি মর্ত্যের মথুরা বা দ্বারকালীলাতেও নয়, কেননা মাধুর্যরস সে সকলে ক্রম-হ্রাসমান। বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্র তাই প্রচার করেন :

"কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু॥" (ভ. র. সি. ॥ ২/১/২২৩ ॥)

বৈষ্ণবভাবনায় অনুপ্রাণিত পদ্মপুরাণে বৃন্দাবনকে তাই ব্রহ্মাণ্ডেরও উপরে স্থান দিয়ে তাকেও কৃষ্ণের মতই সর্বব্যাপকত্ব ও অংশীত্ব দান করা হয়েছে।[৯] আর বৈষ্ণবতন্ত্রের ভাষায় :

"নিত্য বৃন্দাবনং স্থানং পূর্ণাতিপূর্ণমুচ্যতে।
লীলাঃ পূর্ণাতিপূর্ণাশ্চ তূরীয়াস্তত্র কীর্তিতাঃ॥"

(শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্র ॥ ১১৩ ॥)

এ কারণেই অন্য কোন ঈশ্বরস্বরূপ নয়, একমাত্র বৃন্দাবনবিহারী গোপী-বল্লভ কৃষ্ণই বৈষ্ণব সাধকের আরাধ্য হয়ে উঠেছেন। বৈষ্ণব-দর্শনপ্রকাশ শ্রীজীব গোস্বামীর 'গোপালপূর্বতাপনী'র একেবারে আদিতেই তাই—"কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি?"—এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হিসাবে জানানো হয়েছে—"গোপীজনবল্লভ-জ্ঞানেন তজ্‌জ্ঞানং ভবতি॥" (॥ ১/১ ॥)

---

৯. "নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরিসংস্থিতম্॥
পূর্ণব্রহ্মসুখৈশ্বর্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ম্।
বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি॥ (পদ্মপু॥ পাতালখণ্ড /৩৮/৮-৯॥)

আর এ কারণেই গৌড়ীয় সাহিত্য বৃন্দাবনকেও বর্ণনা করেছে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়স্থান হিসাবে :

"সর্বস্মাদ্‌গোকুলং শ্রেষ্ঠং তস্মাদ্‌বৃন্দাবনং বরম্।
বৃন্দাবনাৎ পরং স্থানং ন কৃষ্ণস্য প্রিয়ং ক্বচিৎ॥"

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ : শ্রীমদ্‌রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী ॥৩/৭॥)

ঐশীচেতনামুক্ত পরম আনন্দরসের আকর বলে পৃথিবী ও মানুষকে বৈদিক সাহিত্য পরম মধুময় জ্ঞানে একান্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।[১০] সেই মাধুর্য-রসের চরম উৎকর্ষের জন্যই গৌড়ীয় দর্শন ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন :

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসে স্থিতিঃ॥"

(ভ° র° সি°॥ ১/২/৫৯॥)

শুধু তাই নয়, 'কৃষ্ণ'-নামেও সেই রস-তাৎপর্যই বর্ণিত হয়েছে। মাধুর্যরসে যিনি জগদ্বাসীর কর্ষিত চিত্তকে আপনার প্রতি নিত্য আকর্ষণ (<√কৃষ্) করেন,—তিনিই কৃষ্ণ :

"The designation of Krsna (√Krs) implies one who draws to himself his devotees...." (God in Indian Religion : H. K. Deychowdhury, p. 73)

বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন-সাধনার মত বেদান্তমতের এরূপ গৌরবময় বিবর্তন অন্য কোন ধর্ম-দর্শন-সাধনার ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে না।

তিন

পরম মাধুর্যময় এই কৃষ্ণের মাধুর্যরসের আস্বাদের জন্য রসসত্তা থেকে ভিন্ন এক আস্বাদক-সত্তার তথা দ্বৈতসত্তার প্রয়োজন অনিবার্য, নইলে রসের আস্বাদ

•. দ্রঃ "ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু···ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধু···"ইত্যাদি মধুবিদ্যা—বৃহ॰ ॥ ২/৫ অধ্যায় ॥, ঋগ্বেদের "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ···" ইত্যাদি মধুমতী সূক্ত (ঋক্ ॥ ১/১০/৬-৯ ॥) ইত্যাদি।

গড়ে উঠতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রসাস্বাদের এ তত্ত্বটির একটি চমৎকার উপমাগর্ভ ভাষ্য পাওয়া যায় :

"একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।"

(কাহিনী/গানভঙ্গ)

রস ও রসিক, আস্বাদ্য ও আস্বাদক—রসের আস্বাদক্ষেত্রে এই দুই সত্তার পারস্পরিক ভেদ একান্ত প্রয়োজন। সাধনক্ষেত্রে রসাস্বাদ-বাসনায় তাই সনাতন ভেদবাদের কথা বলেছেন গৌড়ীয় দর্শন :

"ভিদ্যন্তে বহবো জীবাস্তেন ভেদ সনাতনঃ।"

(প্রমেয় রত্নাবলী : বলদেব ॥ ৪/৫ ॥)

এই সনাতন ভেদবাদও বেদান্ত-অসমর্থিত নয়। উপনিষদের "একাকী ন রমতে", "তদৈক্ষত—বহুস্যাম্" ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রে জীবজগতের সৃষ্টিমূলে সেই নিত্য দ্বৈতভাবনার ইঙ্গিত অনায়াসে উপলব্ধ হবে। পরম রসস্বরূপ ঈশ্বরের রসমাধুর্য আস্বাদনের মাধ্যমে জীবকে আনন্দ-রসাস্বাদের সন্ধান দেওয়ার কথা তো সেখানে আমরা পূর্বেই শুনেছি—"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রে। তাছাড়া শ্রুতিসমূহে ভেদসূচক বা দ্বৈতবাদী মন্ত্রসংখ্যাও স্বল্প নয় ;—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া···" (মুণ্ডক ॥ ৩/১/১ ॥ ও শ্বেতা॰ ॥ ৪/৬ ॥), " ··যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা···" (বৃ॰ ॥ ২/১/২০ ॥), "যমেবৈষ বৃণুতে তেন···" (কঠ ॥ ১/২/২৩ ॥ ও মুং ॥ ৩/২/৩ ॥), "একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা···" (কঠ ॥ ২/২/১২ ॥), "নিত্যো নিত্যানাং চেতন-শ্চেতনানাং···" (ঐ ॥ ২/২/১৩ ॥), "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ···" (শ্বেতা॰ ॥ ১/৯ ॥) ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রসমূহে এই দ্বৈতবাদের প্রকাশ দেখা যায় বা তার বীজের সন্ধান মেলে। গীতার সিদ্ধান্তেও শ্রুতিরই অনুবর্তন দেখা যায়—"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।" (গীতা ॥ ১৫/১৬ ॥) ইত্যাদি নানা অংশে। আর শ্রুতি-স্মৃতি সমর্থিত এই ভেদবাদ বেদান্তদর্শন ব্রহ্মসূত্রে সুস্পষ্টভাষায় উচ্চারিত হয়েছে—"ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।" (ব্র॰ সূ॰

॥ ১/১/২১ ॥), "শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে।" (ঐ ॥ ১/২/২০ ॥), "অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ।" (ঐ॥ ৩/৩/৩৬ ॥) ইত্যাদি নানা সূত্রে।

বলা বাহুল্য, সর্বক্ষেত্রে রসের আস্বাদের জন্যই এই ভেদবাদ স্বীকৃত। প্রস্থানত্রয়ে সমর্থিত ব্রহ্মের এই রসস্বরূপত্ব ও সে রসের আস্বাদ বাসনার পরিপূরণে দ্বৈত-সাধনার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তাকেই বীজ হিসাবে গ্রহণ করে বৈষ্ণব দর্শন তার পূর্ণ বিকাশ সাধন করেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণের উক্তি শুনি :

"আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥"

(চৈ. চ. ॥ ১/৪/১২৫-২৭ ॥)

এ উক্তিও রসের আস্বাদক্ষেত্রে দ্বৈতসত্তার অনিবার্য স্বরূপকেই প্রকাশ করেছে। রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের পরম বিষয়, আর শ্রীরাধা হলেন সেই প্রেমরসাস্বাদনের পরম আশ্রয়। সুতরাং আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ না করলে রসাস্বাদনের গভীর আনন্দ চির-অলভ্যই থেকে যায়। এ কারণেই শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে তাঁর আক্ষেপের কথা শুনি :

"বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥"

(ঐ ॥ ১/৪/১১৫-'১৭ ॥)

এই আশ্রয়সত্তাই রসিকসত্তা। অতএব বেদান্ত কেবল অদ্বৈতবাদী নয় তা যুগপৎ দ্বৈতবাদীও। আর এই উভয়রূপ নিয়েই গৌড়ীয় সম্প্রদায় তাঁদের

দর্শনসিদ্ধান্তে যুগপৎ ভেদাভেদবাদী অচিন্ত্য-মতাদর্শের গঠন ও তার পূর্ণ বিকাশসাধন করেছেন।

ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবর্তন করেন আচার্য ঔড়ুলোমি এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে শ্রীনিয়মানন্দ নিম্বার্কাচার্যের (খ্রীঃ ১১০০-১১৬২) 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' অবলম্বনে তা বহুল প্রচার ও প্রসার লাভ করে। তাঁদের মতে স্বর্ণপিণ্ড ও স্বর্ণালঙ্কার যেমন উপাদান হিসাবে অভিন্ন, কিন্তু আকার ও মূল্যবিচারে ভিন্ন, তেমনি ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভেদ উভয়ই বর্তমান। স্বর্ণপিণ্ডের স্বর্ণালঙ্কারে পরিণতির মতই ঈশ্বরসত্তা জীবসত্তায় পরিণত হয়। আচার্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মের এই জীব-পরিণতির কারণ—'অসাধারণ শক্তিমত্বাৎ।' *গৌড়ীয় দর্শন সে পরিণতির ক্ষেত্রে 'অচিন্ত্য' শব্দ ব্যবহার করেন:* "*অচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।*" (শ্রীসর্বসম্বাদিনী: শ্রীজীব গোস্বামী, পৃ, ১৪৯) এ বিচারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একটা বীজসূত্র বেদান্ত-আশ্রিত শ্রীনিম্বার্কমতে বা 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভে' খুঁজে পাওয়া যাবে। এঁদের মতেও জীবভাব অবিনাশী,—এমন কি মোক্ষপ্রাপ্ত অবস্থাকালেও। তবে সে অবস্থায় ঈশ্বরসাধনা তথা রসাস্বাদ আর থাকে না। সেই সাধনাশূন্য ভক্তি-শূন্য রসাস্বাদবিহীন মোক্ষ অর্জনই তাঁদের পরম সাধ্য বা কাম্য। তাই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী হলেও নিম্বার্কমতকে গৌড়ীয় দর্শন অগ্রাহ্য করেছে। কেননা গৌড়ীয় দর্শনের লক্ষ্য ঈশ্বরের প্রতি নিত্য প্রেমভক্তির সাধনা ও তজ্জাত আনন্দময় প্রেমরসসৌরভকে অবিনাশী করে তোলা। আর এখানেই নিম্বার্কীয় বা সনকপন্থী ভেদাভেদবাদ অপেক্ষা গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের গৌরবতর বিবর্তন এবং বেদান্ত-মতবাদেরও পূর্ণতা ও পুষ্টিসাধন। মোক্ষ অর্জন উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্বকেই ব্যর্থ করে দেয়, জীবের অস্তিত্ব ও সাধনার উপযোগিতা তাতে মিথ্যা হয়ে যায় এবং আনন্দ উৎসারের কোন পথই আর তাহলে থাকে না। ফলে মোক্ষলাভে সৃষ্টিপূর্ব সেই দ্বৈতত্বহীন একাত্মার আনন্দশূন্যতার পরম বেদনাই পুনরায় সর্বব্যাপী ও সত্য হয়ে ওঠে। সুতরাং বৈষ্ণব দর্শনের মোক্ষভাবনাহীন নিত্য প্রেমসাধনা বেদান্তের লীলা-কৈবল্য আনন্দবাসনাকেই পরিপূর্ণতা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বেদান্তেরও পুষ্টিসাধন করে গৌড়ীয় দর্শনে বেদান্তেরই গৌরবময় বিবর্তন ঘটিয়েছেন

গৌড়ীয় সম্প্রদায়। 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' (তৈ° ॥ ২/৭/২ ॥) বা 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।' (ব্র° সূ° ॥ ১/১/১২ ॥) প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণকারী বেদান্তশাস্ত্র সুতরাং অদ্বৈত মোক্ষভাবনাকেই সর্বস্ব করে তোলেন নি, প্রেম-ভক্তি-লীলারসের ও তজ্জনিত আনন্দাস্বাদের কথা বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-রূপ বিশাল মহীরুহেরই যোগ্য বীজ বপন করে গেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন-সাধনা-সাহিত্যের কেন্দ্রমূলে অধিষ্ঠিতা শ্রীরাধা—যিনি সেই প্রেম-ভক্তি-লীলারসের পরম আশ্রয়স্বরূপিণী এবং যাঁর মহাভাবের আদর্শ সমগ্র বিশ্বেই প্রেমসাধনার চরম, তাঁর সৃষ্টিমূলও খুঁজে পাওয়া যাবে বেদান্ততত্ত্বেই। সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টিপূর্বকালের কেবল চিৎ-শক্তির অধিকারী ঈশ্বর সৎ ও আনন্দশক্তিরও অধিকারী হলেন—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।" (তৈ° ॥ ২/৭/১ ॥) ইত্যাদি। শ্রীরাধা হলেন পর-ব্রহ্মের আনন্দাংশের মূর্তিমতী হ্লাদিনীশক্তি। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর 'কড়্চা'র ভাষায়—"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিঃ ··।" কৃষ্ণকে আহ্লাদদান করেন বলেই এ শক্তির নাম হ্লাদিনী—"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।" (চৈ. চ. ॥ ২/৮/১২০ ॥), অথবা শ্রীজীব গোস্বামীর ভাষায়ঃ

> "হ্লাদরূপোঽপি যয়া সংবিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা হ্লাদিনী।" (ভগবৎ সন্দর্ভ ॥ ১০২-১০৩ অনুচ্ছেদ ॥)

প্রেম এই হ্লাদিনীশক্তিরই সারভূত রূপ যার সর্বশ্রেষ্ঠ বিবর্তন শ্রীরাধার মহাভাবেঃ

> "হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
> ভাবের পরম কাষ্ঠা—নাম মহাভাব ॥
> মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
> সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥" (চৈ. চ. ॥ ১/৪/৫৯-৬০ ॥)

গৌড়ীয় দর্শনে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বরের কেবল আনন্দস্বরূপ এবং তদংশের হ্লাদিনীশক্তিই স্বরূপশক্তির ত্রিবিধ রূপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিগণিত। প্রেমতত্ত্বের চরম বিকশিত রূপ যে মহাভাব, তা এই হ্লাদিনীরই সম্পদ এবং একমাত্র রাধা ব্যতীত সে সম্পদের অধিকার আর কারও নেই। তাই হ্লাদিনীর মূর্তিমতীরূপ শ্রীরাধা ব্যতীত গৌড়ীয় দর্শনের কোন তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তই

বিকশিত কিংবা সম্পূর্ণ হতে পারে না। পূর্বালোচনায় মাধুর্যরসের পূর্ণতম বিকাশস্থল বলে বৃন্দাবনকে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়স্থান হিসাবে যে বর্ণনা পাই, তা মূলতঃ শ্রীরাধারই প্রেমের জন্য যা গভীরতা ও ব্যাপ্তি উভয়ক্ষেত্রেই অপরিমেয়। চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণের কণ্ঠেই কবি বর্ণনা করেছেন :

"না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥" (॥ ১/৪/১০৭ ॥)

এ কারণেই গৌড়ীয় সাহিত্যে রাধা বর্ণিতা হয়েছেন 'জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী' রূপে[১১] এবং শ্রীকৃষ্ণেরও মদনমোহনরূপের একমাত্র উৎস হিসাবে[১২], আর বৈষ্ণব ভাবনানুপ্রাণিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণকে 'শ্রী'-গৌরবদায়িনী হিসাবে[১৩]। রাধার সে প্রেমগৌরবের কথাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সখা অর্জুনের কাছে কৃষ্ণ ব্যক্ত করেছিলেন এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর শ্রেয়ঃ ও প্রেয়োতম আকর্ষণটির কথা :

"ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥"

(আদিপুরাণ॥ উত্তর/১০॥)

যে রাধা প্রেমকেই সর্বস্ব করে প্রেমগৌরবে কেবল কৃষ্ণসুখেই সুখী হয়ে এমন কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারেন :

"যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তাঁর রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া কাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ্ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা করোঁ তারে সুখী॥"

(চৈ. চ.॥ ৩/২০/৪৪॥)

১১. "শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা সুশীলতা নর্তনগান চাতুরী।
গুণালি সম্পৎ কবিতা চ রাজতে জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী॥" (গোবিন্দ-লীলামৃত : শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। ১৩/৩০॥)

১২. বর্তমান গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'রাধাসঙ্গে যদা ভাতি···' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১৩. দ্রঃ ব্র. বৈ. পু.॥ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড/২৫/৬২॥ (বর্তমান গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তাঁর সম্পর্কে কৃষ্ণের সে স্বীকৃতি একান্তই স্বাভাবিক। একমাত্র তাঁর কাছেই তো শ্রীকৃষ্ণ পরম শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারেন—"দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলে, যেমনটি আমরা পাই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালের 'রাধাতন্ত্রে'র বর্ণনায় প্রেমস্বরূপিণী রাধা কৃষ্ণের কাছে হয়ে উঠেছেন পরাক্ষরবিশিষ্টা, দেবেশী গৌরীর কাছে মহাদেবের উক্তিতে কৃষ্ণকে তাই নিত্য 'রাধা রাধা'—এই পরাক্ষর ধ্যান করতে শুনি :

"বাসুদেবস্তু দেবেশি গোপীসর্বস্ব সম্পুটং।
চিন্তয়েদনিশং কৃষ্ণো রাধা-রাধাপরাক্ষরম্॥"

(রাধাতন্ত্রম্ : সঙ্কলন—যোগাচার্য কামিক্ষ্যানাথ মুখোপাধ্যায় ॥ ২২শ পটল/৬ ॥)

এই রাধাধ্যান কৃষ্ণের অগৌরবের সূচক নয়, বরং তাঁর রসময়-স্বরূপের একান্ত গৌরববৃদ্ধির সহায়ক। সুতরাং বেদান্তের লীলাকৈবল্য সৃষ্টিতত্ত্বের লীলারস-আস্বাদের পূর্ণবিকাশ নিঃসন্দেহে গৌড়ীয় দর্শনের হ্লাদিনীস্বরূপা শ্রীরাধার প্রেমসাধনায়।

চার

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের 'অচিন্ত্য' শব্দটিও শ্রুতিসমূহে বহুল পরিচিত, তবে তা ঈশ্বরের অচিন্ত্য বা অবিচিন্ত্য শক্তিসম্পর্কিত। কৈবল্য উপনিষদের বর্ণনায় তিনি—'অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপম্' (১/৬), মুণ্ডকোপনিষদের বর্ণনায় —'বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং' (৩/৭); এছাড়া মাণ্ডুক্যের—"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং ·"[১৪], শ্বেতাশ্বতরের—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা···"[১৫],

১৪. "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃশ্যম্ অব্যবহার্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একান্তপ্রত্যয়সারং···স আত্মা।" (মাণ্ডুক্য ॥ ৭ ॥

১৫. "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"
(শ্বেতা ॥৩/১৯॥)

ঈশোপনিষদের—"তদেজতি তন্নৈজতি…"[১৬] ইত্যাদি মন্ত্রসমূহেও পরমাত্মার সেই অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় ব্যক্ত কিংবা আভাসিত হয়েছে। গীতায় কৃষ্ণকণ্ঠেও 'ধাতারমচিন্ত্যরূপং' (৮/৯) ব্যাখ্যাত হয়েছে। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের অচিন্ত্যত্ব এ জাতীয় নয়, যদিও ঈশ্বরের এই অবিচিন্ত্য শক্তিকে গৌড়ীয় দর্শন অস্বীকার করেনি।[১৭] গৌড়ীয় দর্শনে 'অচিন্ত্য' শব্দের ব্যবহার মুখ্যতঃ জীব ও ব্রহ্মের পারস্পরিক সম্পর্কের বিচারক্ষেত্রে প্রযুক্ত। কারণ, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদে অভেদ, আবার অভেদে ভেদ—যুগপৎ এই পরস্পর-বিরোধী জ্ঞানই অচিন্ত্য। তাই ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের মতে এ অচিন্ত্য unthinkable বা অলীক অর্থে প্রযুক্ত নয়, তা inexplicable অর্থাৎ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে অনির্ণেয়, কেননা সে জ্ঞান একমাত্র গভীর অনুভবের বিষয়। (দ্রঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ১ম খণ্ড/ভূমিকা পৃ. ১৪১)। ব্রহ্মস্বরূপ থেকে জীবকে একদিকে যেমন ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না, তেমনই আবার বিপরীত যুক্তির দ্বারা অভিন্নরূপে চিন্তা করাও অসম্ভব। তাই উভয়ের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ দুইই বর্তমান :

> "স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্ত্যয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ ; ভিন্নত্বেন চিন্ত্যয়িতুম-শক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গী-কৃতৌ, তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি।" (শ্রীসর্বসম্বাদিনী : শ্রীজীব গোস্বামী, পৃ. ৩৬-৩৭)

শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা এ তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু তর্ক কিংবা বুদ্ধির দ্বারা তা আয়ত্ত করা যায় না। অচিন্ত্যভাবের লক্ষণ সম্পর্কে মহাভারতকারও এ কথাই লিখেছেন :

১৬. "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥" (ঈশ ॥৫॥)

১৭. "অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান। ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অধিকারী। প্রাকৃত-চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ॥"
(চৈ. চ. ॥১/৭/১১৭-'২০॥)

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" (॥ ভীষ্মপর্ব/৻/১১ ॥)[১৮]

উপলব্ধির জন্য শ্রুতিরই সহায়তা গ্রহণ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা ও বেদান্ত সমর্থন দুইই প্রদর্শন করা যায় মুণ্ডকোপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রটির সাহায্যে ঃ

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥"
(মু° ॥ ১/১/৭ ॥)

ঊর্ণনাভ আপনার শরীরাংশ নাভিতে উৎপন্ন বহিরঙ্গরসকে ঊর্ণাতন্তুতে পরিণত করে এবং সেই তন্তুদ্বারা জাল নির্মাণ করে স্বয়ং তার মধ্যেই অবস্থান করে, কিন্তু নিজে অবিকৃতই থাকে। আপনারই দেহাংশসৃষ্ট ঊর্ণজালে অবস্থান করায় জাল ও ঊর্ণনাভের মধ্যে এক হিসাবে কোন ভেদ নেই। অর্থাৎ উভয়ের সম্পর্ক অভিন্নাত্মক। আবার অপরদিকে জাল ত্যাগ করে সে অন্যত্র যেতে পারে, সে হিসাবে উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সংযোগ কিছুমাত্র না থাকায় উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নত্বগুণও অর্জন করে। অতএব ঊর্ণা এবং ঊর্ণনাভের মধ্যে যুগপৎ ভেদাভেদসম্পর্ক বিদ্যমান এবং বলা বাহুল্য এ সম্পর্ক অচিন্ত্য। মুণ্ডক উপনিষদের উপরি-উদ্ধৃত মন্ত্রে এ দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করেই বলা হয়েছে—ঊর্ণনাভ যেমন নিজ শরীর থেকে তন্তুসমূহকে বিস্তার করে আবার সেই তন্তুসমূহই স্বীয় শরীরে গ্রহণ করে, তেমনই অক্ষরব্রহ্ম ও তা থেকে উৎপন্ন এ বিশ্বপ্রকৃতি যুগপৎ ভেদাভেদসূচক—অচিন্ত্য।

এ ছাড়া ব্রহ্মসূত্রের "উভয়ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ" (॥ ৩/২/২৮ ॥) সূত্রটিকেও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বীজ হিসাবে গ্রহণ করা চলে। জীব ও ব্রহ্মের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারপ্রসঙ্গে সূত্রটির বক্তব্য হল—যেমন 'সর্পের কুণ্ডল' বললে সর্পের সঙ্গে কুণ্ডলের স্পষ্টতঃই একটা ভেদ অনুভূত হয়, আবার একই কালে 'সর্পস্বরূপ কুণ্ডল' বললে উভয়ের মধ্যে অভেদবোধের জাগরণ

---

১৮. শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য মুনির 'পঞ্চদশী'-তেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত দেখা যায় ঃ
"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ।
অচিন্ত্যরচনারূপং মনসাপি জগৎ খলু॥" (॥ ৬/১৫০ ॥)

ঘটে, তেমনই জীব ও ঈশ্বরের মধ্যেও একই কালে ভেদ ও অভেদ উভয়ই বর্তমান। জীব-ব্রহ্মের সম্পর্কক্ষেত্রে অচিন্ত্যত্বের ভাবনা এখানেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং গৌড়ীয় দর্শন যখন রাধাকৃষ্ণের নিত্য ভেদাভেদস্বরূপের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মৃগমদ ও তার গন্ধ, আগুন ও তার উত্তাপ প্রভৃতি উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেন,[১৯] তখন সেগুলি এই সাপ ও তার কুণ্ডলী, মাকড়সা ও তার জাল প্রভৃতি উপমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠে যেন বিকল্প দৃষ্টান্তেরই সূচনা করে। সুতরাং নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে মুণ্ডক উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্রাদির বীজাত্মক অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তই বিবর্তনে বিশাল ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিয়ে গৌড়ীয় দর্শনে পরম গৌরবমণ্ডিত পরিণতি লাভ করেছে। আর এই গৌরবের কারণেই বেদান্তের সঙ্গে গৌড়ীয় দর্শনের সম্পর্ক অঙ্গী ও অঙ্গের সম্পর্ক হওয়া সত্ত্বেও পরিণতিতে গৌড়ীয় দর্শন হয়ে উঠেছে মৌলিক ও সার্বভৌম।

পাঁচ

গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের সর্বাতিশায়ী বিকাশ তার সাধনায়। বৈষ্ণব সাহিত্য সেই সাধনারই পরম বাণীরূপ। এ প্রেমাদর্শ পার্থিব কাম-বাসনা বা কোন-প্রকার আত্মসুখভোগতাড়িত মানবীয় প্রেম নয়, তা দিব্য ও অকৈতব অর্থাৎ আত্মসুখভোগবাসনাশূন্য,—কৃষ্ণপ্রীতিবাসনাই এ প্রেমের একমাত্র হেতু। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়ঃ

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।" (॥ ২/২/৩৮ ॥)

কিংবা:

"কৃষ্ণ-প্রেম সুনির্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।" (॥ ২/২/৪২)

---

১৯. "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥" (চৈ. চ.॥ ১/৪/৮৪-৮৫॥)

এ প্রেম তত্ত্বজ্ঞান ও আচারাদি কর্মের অপেক্ষা রাখে না, কোন বাহ্যানুষ্ঠান-নির্ভর নয়, তা একমাত্র রাগনির্ভর। বেদান্তবর্ণিত নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দই সবিশেষত্ব ও সগুণত্ব লাভ করে ক্রমবিবর্তিত হয়ে গৌড়ীয় দর্শনে শান্তভক্তি থেকে ক্রমে ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায় মধুররসাত্মক প্রেমভক্তির স্তরে এবং তারও শেষ বিবর্তন মাদনাখ্য মহাভাবে পরিণতি লাভ করেছে। তাই ব্রহ্মানন্দ-জনিত সুখাস্বাদ অপেক্ষা ভক্তিরসাস্বাদজনিত সুখ অসংখ্যগুণে বেশি, কেননা তা অসীম। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন :

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্বোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥"

(ভ. র. সি. ॥ ১/১/৩৮ ॥)

অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দসুখকে পরার্দ্ধগুণীকৃত করলেও তা ভক্তিসুখসমুদ্রের পরমাণু-তুল্যও হয় না।

অথচ এই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ধ্যানাত্মক নিষ্কাম পরাভক্তিরও সূচনা শ্রুতিবাক্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। কৈবল্য উপনিষদ পরমকে উপলব্ধির নির্দেশ দিয়েছেন কেবল শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানলোকের দ্বারা—"শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি।" (কৈবল্য ॥ ১/২ ॥)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ জানান—পরমাত্মা ও গুরুর প্রতি নিষ্কাম পরাভক্তির অধিকারী মহাত্মার কাছেই উপনিষৎ-কথিত ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রকাশিত হন :

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

(শ্বেতা॰ ॥ ৬/২৩ ॥)

কিন্তু ব্রহ্মানন্দ বা মুক্তিভাবনাকে অবলম্বন করেই শ্রুতিদর্শনাদি পরবর্তী-কালে বিবর্তন লাভ করায় ভক্তিভাবনা অসমাদর ও অবহেলায় কালক্রমে বিলুপ্ত হয়। অথচ প্রিয়তমরূপে সম্বন্ধানুগ রাগাত্মিক ভক্তি বা প্রেমমার্গের সাধনা গড়ে ওঠার প্রাথমিক ইঙ্গিত শ্রুতিবাক্যে নানাস্থানেই আছে। যেমন বৃহদারণ্যকে জীবাত্মার প্রতি উপদেশ শুনি :

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।···আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত···।" ইত্যাদি। (বৃ॰ ॥ ১/৪/৮॥)

কিন্তু শ্রুতির ব্রহ্মবিষয়ক রসজ্ঞানরূপ বদ্ধ জলাশয় প্রেমভক্তির স্রোতে নদী হয়ে বয়ে যাবার পথ পায়নি কোনদিন। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে কবি-কর্ণপুর জানালেন—কালপ্রভাবে বিনষ্ট বা অবিবর্তিত শ্রুতিকথিত ভক্তিযোগ পুনরায় প্রকাশের জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব :

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥" (৷৷৬/৭৪৷৷)

["যিনি কালপ্রভাবে বিলুপ্ত এই ভক্তিযোগকে শিখাইতে কৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার চিত্তভ্রমর প্রগাঢ়-ভাবে বিলীন হউক।" — অনুবাদ : রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।]

এ কারণেই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছিলেন কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্য অপেক্ষা পরম তত্ত্ব আর কিছু নেই এবং উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্ম এই শ্রীচৈতন্যেরই অঙ্গকান্তি। শুধু তাই নয়, যোগশাস্ত্রের অন্তর্যামী আত্মা এঁরই আংশিক বিভূতি এবং ষড়ৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানও এঁরই স্বরূপ[২০]। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে মুক্তিভাবনার মত সর্বাত্মক বিকাশলাভ না করলেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ঈশ্বর-সাধনায় ভক্তিবাদকে মুখ্য স্থান দিতে প্রয়াসী হয়েছেন,—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ভক্তির মুখ্য স্বরূপ স্বসুখবাসনা-লেশশূন্য আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি। ভাগবতে ভক্ত প্রহ্লাদের প্রার্থনা ছিল মুক্তি নয়, এরূপ আত্মসুখসন্ধানশূন্য নিত্য ভক্তিচিত্ততার :

"ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।
তথা কুরুষ দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো॥"

(ভা° ॥ ১২/১৩/২২ ॥)

ভক্ত প্রহ্লাদের এই প্রার্থনামন্ত্রের সঙ্গে শ্রীহরির প্রতি সর্বশেষ নমস্কারবাক্য উচ্চারণ করেই ভাগবতকার সমগ্র মহাপুরাণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন যা

২০. "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
স আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥" (চৈ. চ.॥ ১/১/সংস্কৃত শ্লোক ৩॥)

ভাগবতের ভক্তি-আত্মাকেই আলোকিত করে। অপরদিকে গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ :

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" (গীতা॥ ৯/২৭॥)

এ ছাড়াও গীতার ৮/৮-১০, ৯/৩৪, ১১/৬ ইত্যাদি সংখ্যক মন্ত্রেও ভক্তির পরম মর্যাদাই বর্ণিত হয়েছে। অনন্যচিত্ততাকেই ভক্তির মূলকথা জ্ঞান করে[২১] গীতার আরো সুস্পষ্ট ও আন্তরিক নির্দেশ পরিপূর্ণ ভক্তি-শরণাগতির—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" (গীতা॥ ১৮/৬৬॥)। তা না হলে "রসানাং রসতমঃ পরমঃ' (ছা° ১/১/৩) যে মাধুর্যময় ভগবান, জীবের পক্ষে সেই পরম রসের আস্বাদই সম্ভব নয়। গীতার বাক্য অনুসরণেই গৌড়ীয় দর্শন ভক্তিসংজ্ঞা নিরূপণ করেন :

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

(ভ. র. সি॥ ১/১/১১॥)

এবং এই ভক্তিসংজ্ঞার সমর্থনে অন্যান্য অজস্র শাস্ত্রবচনেরই সহায়তা গ্রহণ করেন, যেমন—শ্রীনারদভক্তিসূত্রের—"সা (ভক্তি) ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা।" (॥ ২॥), শাণ্ডিল্যসূত্রের—"সা (ভক্তি) পরানুরক্তিরীশ্বরে।" (॥ ২॥), শ্রীরামানুজের—"স্নেহপূর্বমনুধ্যানম্।" (শ্রীভাষ্যম্) কিংবা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের :

"সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
... ...
অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

(ভ. র. সি.॥ যথাক্রমে ১/১/১২ ও ১/৪/২ উদ্ধৃত॥)

ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এ সকল শাস্ত্রবাক্যের সমর্থন বৈষ্ণব ভক্তিবাদকেই দান করেছে এক সুদৃঢ় ঐতিহ্যমণ্ডিত অক্ষয় ভিত্তি।

বৈষ্ণব দর্শন এই ভক্তিবাদের শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চবিধ রূপের মাধ্যমে

---

২১. দ্রঃ গীতা॥ ৯/২২, ১২/৬ ইত্যাদি॥

বিবর্তন ঘটিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে মধুররসাত্মক প্রেমের ও তার সর্বাধিক ঘনীভূত রূপ মহাভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সাধনক্ষেত্রে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর প্রভৃতি মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস বা ইঙ্গিত—"কৃত্যানি সখ্যা বভূবঃ···" (ঋক্ ॥ ৭/৮৮/৫ ॥), "স হি বন্ধুরিত্থা···" (ঐ ॥ ১/১৫৭/৫ ॥), "পরিষ্বজন্তে যথা পতিং মর্যং···" (ঐ ॥ ১০/৪৩/১ ॥) ইত্যাদি বিভিন্ন ঋক্‌মন্ত্রেই সর্বপ্রথম মেলে।[২২] সেই সম্বন্ধানুগ প্রেমসাধনারই সর্বোচ্চ বিবর্তন গৌড়ীয় সাধনাদর্শে যার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ মহাভাবাত্মক মধুররসের সাধনায়। একমাত্র মধুররসেই সর্বস্ব অর্পণ করে, সর্বপ্রকার আত্মাভিমান ত্যাগ করে কৃষ্ণ-আরাধনা সম্ভব। এমনকি দেহজ্ঞান পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় একমাত্র এই মধুর-রসসাধনায় নায়ক-নায়িকার প্রেমাদর্শে। গৌড়ীয়-দর্শন এ ব্যাপারে ব্রহ্মসূত্রের সমর্থন পান—"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।" (ব্র. সূ. ॥ ৪।১।১ ॥) সূত্রে, যার ব্যাখ্যায় আচার্য শ্রীশঙ্করের ভাষ্য :

> "তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি যা নিরন্তরস্মরণা পতিং
> প্রতি সোৎকণ্ঠা সৈবমভিধীয়তে।"

অর্থাৎ প্রবাসী পতির নিরন্তর ধ্যানে পতিগতপ্রাণা স্ত্রীর যে একপ্রকার অবিচ্ছিন্না স্মৃতি পরিলক্ষিত হয়, আচার্য শঙ্করের মতে তাইই হল ভক্তি। অপরদিকে গৌড়ীয় দর্শন মধুররসাত্মক প্রেমাদর্শের শাস্ত্রসমর্থন পান পদ্ম-পুরাণের ঋষি-কণ্ঠের প্রার্থনায় এবং পরম শ্রদ্ধায় সে প্রার্থনা উদ্ধার করে আনেন ভক্তি-আদর্শ বর্ণনাকালে :

> "যুবতানাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
> মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি॥"
>
> (ভ. র. সি. ॥ ১/২/১৫৩ উদ্ধৃত ॥)

এ প্রেম কিন্তু পার্থিব নরনারীর বাসনাতাড়িত প্রেম নয়, কিংবা সে প্রেমের বিবর্তিত পরম রূপও নয়, কেননা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে সে প্রেম বা ভক্তি সমস্ত প্রকার কামনাশূন্য, আত্মসুখের বাসনামুক্ত। এ প্রেম—দিব্য। ঋষি অরবিন্দ পার্থিব জগতের প্রেম থেকে এই অধ্যাত্মপ্রেমের স্বাতন্ত্র্যব্যাখ্যায় তাঁর একটি পত্রে লিখেছিলেন :

২২. অতিরিক্ত দ্রঃ ঋক্ ॥ ১/১৫৬/১, ৬/৪৮/১৮, ৭/৮৬/২-৪, ৭/৮৮/৩-৬, ৮/৯২/৩৩, ১০/৪০/২, ১০/৪৩/২ ইত্যাদি ॥

"Human love is made up of emotion, passion and desire,....Divine love is not merely a sublimation of human emotions ; it is a different consciousness with a different quality, movement and substance."
(Beyond Emotion—Letters of Sri Aurobindo.)

এ প্রেম অন্তর্লোকে উপলব্ধির, যে উপলব্ধির গভীরতায় পদাবলীর রসাস্বাদ-বিভোরা রাধা বলতে পারেন—"হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল প্রেম-প্রহরী রহু জাগি।" (গোবিন্দদাসের পদাবলী ॥ ৫৯৬ ॥)। এ উপলব্ধি অনির্বচনীয়, নারদীয় ভক্তিসূত্র বর্ণনা করেছেন—"অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্। মূকাস্বাদনবৎ।" (॥ ৫১-৫২ ॥)। গভীর রসাস্বাদে উদ্বেলিত মানসিক অবস্থার স্বরূপ ভাষায় প্রকাশের অতীত। অনির্বচনীয় প্রেমরসের কবি জ্ঞানদাসের পদে কৃষ্ণপ্রেমবিবশা রাধার কণ্ঠে তাই উচ্চারিত হয়েছে :

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥"
(বৈষ্ণব পদাবলী [চয়ন] ॥ ৫/৭ ॥)

এ উপলব্ধিতে পরম রসপ্রাপ্তির আনন্দে সমাহিতা রাধার কাছে তার কুল-শীল-সমাজধর্মও একান্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। সমাজধর্মের সকল বাধাবিঘ্ন অনায়াসে অতিক্রম করে কবি চণ্ডীদাসের রাধা তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারেন :

"তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।···(বৈ. প. ॥ ১১/২ ॥)[২৩]

গীতায় 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' যে অনন্যচিত্ত শরণাগতির কথা বলা হয়েছে, নিঃসন্দেহে সেই শরণাগতিই রাধার এ প্রেম ভাবনার উৎস। গৌড়ীয় দর্শন কাম ও প্রেমের তাৎপর্য ও পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের আলোচনায় যখন লেখেন :

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য হয় প্রেম ত প্রবল ॥
লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম ॥
দুস্ত্যজ আর্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন ॥"
(চৈ. চ. ॥ ১/৪/১৪১-'৪৫ ॥)

তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এ আলোচনা গীতার ভক্তি-আদর্শ এবং কবি চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলীর প্রেমাদর্শ—উভয়কেই একান্ত মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করে আপনাকে পুষ্ট করে তুলেছে। এ হিসাবে সুবিশাল বৈষ্ণব পদসাহিত্য শুধু বৈষ্ণব দর্শনেরই নয়, নিঃসন্দেহে বলা চলে তা বেদান্ত দর্শনেরও গৌরবময় রসভাষ্য হয়ে উঠেছে।

২৩. তৈত্তিরীয় উপনিষদের মন্ত্র স্মরণীয়—
"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন ॥" (॥ ২/৪/১ ॥)
কিংবা—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ (॥২/৯/১ ॥)

শ্রুতিসমূহে পরব্রহ্মকে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে জীবহৃদয়-গুহাস্থিত অন্তরাত্মা হিসাবে, যথা—"সর্বভূতান্তরাত্মা" (কঠ ॥ ২/২/১১ ॥), "নিত্যমেবাত্ম-সংস্থম্", "সর্বভূতগুহাশয়ঃ", "আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।" (শ্বেতা॰ যথাক্রমে ১/১২, ৩/১১, ৩/২০ ॥), "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং...." (তৈত্তি॰ ॥২/১/৩ ॥) প্রভৃতি। ভক্ত সাধক একমাত্র নির্মলচিত্তের ধ্যানযোগেই সেই অখণ্ড একরস পরমাত্মাকে অন্তর-গভীরে দেখতে পান—"বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥" (মুণ্ডক ॥ ৩/১/৮ ॥), আর সে দর্শনজনিত আনন্দ—শাশ্বত। কঠোপনিষদের ভাষায়ঃ

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"
(॥ ২/২/১২ ॥)

হৃদয়ের অনুভূতি, সংশয়রহিত বুদ্ধি ও নির্মল মনের গভীরে তাঁর দর্শন-জনিত সে আনন্দই অমৃতঃ

"হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো যে এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥"
(ঐ ॥ ২/৩/৯ ॥)

শ্বেতাশ্বতরও বলেন—"তস্যাভিধানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ···" (॥ ১/১০ ॥) অর্থাৎ বারবার একাগ্রচিত্তে ধ্যানের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে অন্তরজগতে সংযোগ স্থাপিত হয়। গীতায় স্বয়ং কৃষ্ণের তাই উক্তি—"সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ···" (॥ ১৫/১৫ ॥) কিংবা অর্জুন-সম্বোধনে—"ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।" (ঐ ॥ ১৮/৬১ ॥)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমাদর্শের বিপ্রলম্ভাত্মক সাধনা ও ভাবসম্মিলনে এ সকল শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধান্তেরই বিবর্তন ও তার রসরূপের বিকাশ খুঁজে পাওয়া যাবে। অন্তরের গভীরে ধ্যানলব্ধ কৃষ্ণপ্রেমরসের অবিনাশী অনুভবের গৌরবেই মাথুর-বিরহের অনন্তত্বের মধ্যেও সখিদের সম্বোধন করে প্রেম-গরবিনী শ্রীরাধা বলতে পেরেছেনঃ

"তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিব গো
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥" (বৈ. প. ॥ ১২/১ ॥)

শুধু তাই নয়, এই গৌরব অনুভবে স্বয়ং কৃষ্ণকে পর্যন্ত ভর্ৎসনা করে রাধা বলতে পারেন :

"হস্তমাক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্ ॥
হৃদয়াদ্‌যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥" (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ : বিল্বমঙ্গল ॥ ৩/৯৩ ॥)

৩/৩/২৯ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের ("ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ।") ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর লিখেছিলেন—"গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যম্।" সে সিদ্ধান্তের বিবর্তনে বৈষ্ণব সাহিত্যের মত নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদময় এরূপ "নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য"-বোধের তথা পরম সাম্যজ্ঞানের রসদৃষ্টান্ত আর কোথায়? মহাভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাধিক ঘনীভূতরূপ 'মাদন'কে গৌড়ীয় দর্শন বলেছেন—"সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী" (উজ্জ্বলনীলমণি : শ্রীরূপ গোস্বামী ॥ স্থায়িভাবপ্রকরণ/২১৯॥), আর শ্রীকবি-কর্ণপুর প্রেমরস সম্বন্ধে তাঁর অলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থে বলেন :

"প্রেমরসে সর্বে রসা অন্তর্ভবন্তীত্যত্র মহীয়ানেব প্রপঞ্চঃ। (॥ ৫/১২ ॥) অর্থাৎ প্রেমরসের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত প্রকার রসই অন্তর্ভুক্ত বলে এই রস বিপুল ও মহান। আর এ কারণেই তিনি প্রেমকে অঙ্গীরসের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হননি।[২৪] এ অবস্থায় রাধার আপনার সম্পর্কে স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ অবস্থাকে গৌড়ীয় দর্শনে বলা হয় প্রেমবিলাসবিবর্ত যা রায় রামানন্দের গীতে ব্যক্ত হয়েছে—"না সো রমণ ন হাম রমণী...." ইত্যাদি পদটিতে। (দ্রঃ চৈ. চ. ॥ মধ্য/৮ম ॥)। এ অবস্থায় নিবিড় কৃষ্ণধ্যানে শ্রীরাধা নিজেই হয়তো কখনও অনুভব-বিপর্যয়ে ভেদজ্ঞানবিলোপে কৃষ্ণ বলে মনে করেন আপনাকে। কবি বিদ্যাপতি রাধার সে অপূর্ব মানসিকতাকে ব্যক্ত করেছেন—"অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মধাঈ" শীর্ষক পদটিতে। (দ্রঃ বিদ্যাপতি/পদ সংখ্যা-৭৮৪)। পরম সাম্যজ্ঞানে জীবাত্মার স্ত্রী-পুরুষ ভেদহীনতার কথা শ্রুতিও অনেকক্ষেত্রেই বলেছেন, যেমন :

২৪. "কেষাঞ্চিন্মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শৃঙ্গার এব রসঃ—তন্মতেঽপ্যেতদুদাহরণং নাসঙ্গতম্। শৃঙ্গারোঽঙ্গী প্রেমাঽঙ্গম্, অঙ্গস্যাপি ক্বচিদুদ্রিক্ততা। বয়ন্তু প্রেমাঽঙ্গী, শৃঙ্গারোঽঙ্গমিতি বিশেষঃ। তথা চ—

উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ণ্যথণ্ডরসত্বতঃ।
সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ॥" (অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥ ৫/১২ ॥)

'নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ চৈবায়ং নপুংসকঃ।" (শ্বেতা° ॥ ৫/১০ ॥)

আবার সমস্ত কিছুর সমবায় হেতু[২৫] পরমাত্মা সম্পর্কেও স্ত্রী-পুরুষ ভেদহীনতা প্রকট হয়ে ওঠে শ্বেতাশ্বতরের এই মন্ত্রে :

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।" (॥ ৪/৩ ॥)

গৌড়ীয় কাব্য-দর্শনের প্রেমবিলাসবিবর্তবাদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ সকল সিদ্ধান্তেরই রসগত বিবর্তন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের পূর্ণাতিপূর্ণ রসসত্তার পরিচয় মেলে যজুর্বেদীয় উপনিষদগুলির পুরে উদ্ধৃত "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং···" ইত্যাদি শান্তিপাঠ মন্ত্রে। সেখানে দেখি পূর্ণরস বিতরণ করেও রসময় ঈশ্বরের পূর্ণরসসত্তার বিন্দুমাত্র লাঘব ঘটে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাধাকৃষ্ণের যে 'অসমোর্ধ্বমাধুর্যে'র নিত্য বিকাশ, তা যেন উপনিষদের সেই পূর্ণরসসত্তাকেই নিত্য নূতন আনন্দরসাস্বাদের গভীরতম প্রদেশে নিয়ে গেছে। শ্রীরাধার প্রেমে কৃষ্ণের মাধুর্যরস যেমন প্রতিনিয়ত উদ্বেলিত হয়ে অসীম হয়ে ওঠে, তেমনি নিত্যবর্দ্ধিত সে কৃষ্ণমাধুর্যরসের আস্বাদনে শ্রীরাধার প্রেমাকাঙ্ক্ষাও ক্রমাগত বৃদ্ধির পথে অশেষ রূপলাভ করে। ফলে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেন, কেউই অপরকে অতিক্রম করতে পারে না, দুইই শ্রেষ্ঠত্বের ভূমাশিখর স্পর্শ করে। চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণের কণ্ঠে আমরা সে কথা শুনেছি :

"মোর মাধুর্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥" (চৈ. চ. ॥১/৪/১২৪॥)

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ···" ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মানন্দ বা মুক্তির পরার্দ্ধ-গুণীকৃত আনন্দও যে প্রেমরসাস্বাদজনিত আনন্দের এককণাও হতে পারে না —ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এ বাক্যের সত্যতা সম্পর্কে তাই বিন্দুমাত্র সংশয়ও করা চলে না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন-সাধনা তাই এককথায় বেদান্তের গৌরবমাধুর্য-মণ্ডিত সর্বশ্রেষ্ঠ বিবর্তন। বেদান্তের সাধনায় অদ্বৈত সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব পর্যন্ত শ্রীরাধাভাবিত পরম বৈষ্ণবভক্ত হয়েই পরমসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর বৈষ্ণব-ভক্তিপ্রাণতা তাঁর গৌরবময় সাধক-জীবনের একটা বৃহত্তম

২৫. দ্রঃ শ্বেতা° ॥ ৪/১-২ ॥

স্বরূপ[২৬]। বৈষ্ণব দর্শনের সমস্ত তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত কিংবা যুক্তিই বেদান্ত থেকে আহৃত কিংবা বেদান্ত-সমর্থিত ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। গৌড়ীয় দার্শনিক আচার্য শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছিলেন:

"যুক্তিশ্চাত্র শাস্ত্রানুগতৈব জ্ঞেয়া। যুক্তিস্তু কেবলা নৈবেতি।
যুক্তেঃ স্বাতন্ত্র্য নিষেধাৎ। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ন্যায়াৎ।
(শ্রীসর্বসম্বাদিনী)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মহাকবিও এরই প্রতিধ্বনি তুলে বলেন:

"প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ-প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥" (॥ ২/৬/১২৭ ॥)

বলাই বাহুল্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সর্বক্ষেত্রেই 'শ্রুতেস্তু শব্দমূল' করে এবং শ্রুতির মুখ্যার্থ গ্রহণ করেই অতুলনীয় রসগৌরবে বিবর্তন লাভ করেছে। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ বেদান্তবিদ্‌দের সঙ্গে বিতর্ককালে ভিন্ন মত পোষণ করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব বেদান্তবিরোধী ছিলেন বলে অনেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু সে মত সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। বিতর্ককালে শ্রীচৈতন্যদেব বেদান্তের নয়, বেদান্তের গৌণ বা ভ্রান্ত ব্যাখ্যারই বিরোধিতা করেছিলেন। স-সম্প্রদায় প্রকাশানন্দের নিকট তাঁর সুস্পষ্ট এবং নির্ভীক অভিমত ছিল:

"উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্বকার্য॥" (ঐ ॥ ১/৭/১০৩-'০৪ ॥)

এবং বেদান্তের ব্যাখ্যায় আচার্যগণের কল্পনাকৃত গৌণার্থসমূহ প্রদর্শন করে মুখ্যার্থের ব্যাখ্যায় তাঁদের ভ্রান্তি দূর করেছিলেন। তাই ফলশ্রুতিতে দেখি, তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট আপনাদের ভ্রান্তি স্বীকার করে শ্রীচৈতন্য-মতেই আত্মসমর্পণ করে পরম বৈষ্ণবভক্তে পরিণত হয়েছেন।[২৭] শ্রীপ্রকাশানন্দ

২৬. দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ/২য় খণ্ড : স্বামী সারদানন্দ।
শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বৈষ্ণবাদর্শ (প্রবন্ধ) : দিলীপকুমার দত্ত। [বিশ্ববাণী (মাসিক পত্রিকা), ১৩৯১/জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র। (প্রকাশনা—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা-৬)]

২৭, দ্রঃ চৈ চ. ॥ ১/৭/১০৩-১৪২ ॥

সরস্বতীর শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে আত্মপ্রকাশ ও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' কাব্যরচনা তারই প্রমাণ বহন করে।

বাস্তবিক, বিভিন্ন উপনিষদ, উপনিষদসার ব্রহ্মসূত্র এবং উপনিষদরূপ গাভীর অমৃতময় দুগ্ধস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা[২৮]—এই প্রস্থানত্রয়ে বিভক্ত সামগ্রিক বেদান্তের এবং অন্যান্য অজস্র শাস্ত্রপ্রমাণের চয়নে গৌড়ীয় দর্শনের ভিত্তি যথার্থই সুদৃঢ়। এ ছাড়া ভক্তির পরমস্বরূপের বিকাশে বৈষ্ণবদর্শনকে আদ্যন্ত মুখ্যভাবে সহায়তা দান করেছে পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত[২৯] যা "সর্ব-বেদান্তসারং" ও "সর্ববেদেতিহাসানাং সারং" হিসাবেই সুপরিচিত। (দ্রঃ ভাঃ ॥ যথাক্রমে ১২/১৩/১৫ ও ১/৩/৪১ ॥)। এ অপেক্ষা বড় কথা—ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতা মহর্ষি ব্যাসদেবই শ্রীমদ্ভাগবতেরও রচয়িতা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রকারই ভাগবতমতেরও প্রচারক। তাছাড়া পুরাণকে তো ছান্দোগ্য উপনিষদও বারবার 'পঞ্চমবেদ' অভিধায় ভূষিত করেছেন,[৩০] আর ভাগবত হল অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

সুতরাং সর্বতোভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে বলা চলে বেদান্তের ও ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়োতম বিবর্তন। অলকানন্দা-মন্দাকিনী-বিধৌত দেবতাত্মা হিমালয়ের মতই তার ব্যাপ্তি-পবিত্রতা-গভীরতা, রস-গৌরব, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সৌরভ—সীমাহীন। বেদান্তের পূর্ণবিকাশ গৌড়ীয় রসদর্শনকে তাই এক কথায় বলা চলে ভূমাস্পর্শী,—'রসানাং রসতমঃ' কিংবা 'প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।'

২৮. "সর্বোপনিষদো গাবো·····দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ (গীতা ॥গীতার ধ্যান/৪॥)

২৯. "ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ ॥" (ভাঃ ॥ ১২/১৩/১৭ ॥)

৩০. দ্রঃ ছান্দোগ্য ॥ ৭/১/২, ৭/১/৪, ৭/২/১, ৭/৭/১ ॥

॥ কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ত্ব : স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব ॥

সৌন্দর্যসাধনার মূল কথাটাই হল অশেষ পরমানন্দের আস্বাদন। প্রকৃত ও অবিনাশীসুখের উৎস এ আনন্দকেই ভারতীয় উপনিষদে সনৎকুমার বর্ণনা করেছেন 'ভূমা'-বলে এবং নারদের প্রতি নির্দেশের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সৌন্দর্যসাধকদের প্রতি তাঁর উপদেশ সমস্ত অনিত্য ও সঙ্কীর্ণ সুখের স্পৃহা বর্জন করে সেই ভূমাকে জানার ও একমাত্র তারই সাধনায় লিপ্ত হবার।[১] এই সাধনাই রসের সাধনা, এই ভূমার আস্বাদই প্রকৃত রসের আস্বাদ। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য মাধুর্যের পিছনে আছে এই রস। জগতের সুখপ্রত্যাশী মানুষ এই রসের আস্বাদের জন্যই নিত্য তৎপর। যোগীর যোগ বা অধ্যাত্ম-সাধনাই হোক, কিংবা কবির কাব্যসাধনা, অথবা বিষয়ভোগী মানুষের ভোগসাধনা—সকল ক্ষেত্রে রসের অনুসন্ধানই তাঁদের আপন আপন সাধন-ক্ষেত্রে প্ররোচিত করে। এ কারণেই পূর্ণ সৌন্দর্য, মাধুর্য ও রসের উৎসের প্রতি জীবজগতের গভীর আকর্ষণ ও চিরকালের আকাঙ্ক্ষা।

যার আস্বাদ আমাদের পূর্ব-পরিচিত, তার অভাব বা তার থেকে বিচ্ছিন্নতার বোধই সে বস্তুর প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগায়, যা কখনও আস্বাদিত হয়নি, তার জন্য কোন বাসনা জাগে না। সুতরাং যে রসপ্রাপ্তির জন্য মানুষ নিত্য তৎপর, সে রসের আস্বাদ তার জানা আছে বলেই তার অভাববোধের বেদনায় তার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং প্রাপ্তি বা কাম্যবস্তুর সঙ্গে মিলনই হল জীবজগতের একমাত্র বাসনা। এ কারণে বিশ্বের কি রসসাহিত্য, কি ধর্মসাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই কাম্যবস্তুর সঙ্গে মিলনে জীবজগতের অসীম আনন্দানুভূতির স্বরূপটিকে যথাযথ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে কাম্যবস্তুর বিরহিত অবস্থায় বেদনাদগ্ধ চিত্তের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার রূপটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে এবং পরিণামে প্রাপ্তির অনির্বচনীয় আনন্দস্বরূপকে চিরস্থায়ী করে রাখতে

১. "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ॥ ৭/২৩/১ ॥)

বিশেষ প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু রসের আস্বাদক্ষেত্রে এই শেষোক্ত মতটিকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা অপ্রাপ্তি বা বিচ্ছিন্নতা যে তীব্র আকর্ষণের সৃষ্টি করে, প্রাপ্তি বা মিলন সে তীব্রতাকে তো বটেই, এমন কি সাধারণ আকর্ষণ বোধেরও অবসান ঘটায়, কারণ প্রাপ্তিই হল সাধকের সাধনা তথা আকর্ষণের লক্ষ্য, তাই প্রাপ্তির মুহূর্তগুলিতে অভাবজনিত আকর্ষণ বা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না,—পুনরায় বিচ্ছিন্নতাকে বরণ করে নেবার স্পৃহা তো নয়ই। সে অবস্থা এক জড়বৎ নির্বিকল্প অবস্থা। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এ অবস্থার নামই মোক্ষ,—যার পরিণতি এ মর্ত্যভূমিতে বারবার জন্মগ্রহণের হাত থেকে, দুঃখ-জরা-অনিশ্চয়তা প্রভৃতির হাত থেকে সাধকের চিরকালীন অব্যাহতি। কিন্তু সে অবস্থায় বাসনার অবসানে চিত্তে ব্যাকুলতা জেগে ওঠার কোন সুযোগ না থাকায় নিত্য নূতন আনন্দানুভূতি ও রসের আস্বাদলাভ থেকেও সাধককে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে হয়।

সৌন্দর্য, মাধুর্য বা রস—এ সবই সীমার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত ও অশেষ বৈচিত্র্যে মণ্ডিত। এ সকলের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ যতক্ষণ তীব্র থাকে, ততক্ষণই এগুলির সেই অশেষ বৈচিত্র্যের আবরণ একটির পর একটি উন্মোচিত হয়ে আস্বাদপ্রার্থী ব্যাকুল রসসাধকের আনন্দভাণ্ডারটিকে ক্রমাগত পুষ্ট করে তোলে। সুতরাং, রসের বৈচিত্র্যময় অসীম আস্বাদ যিনি চান, চান নিত্যকালের আনন্দসাধক হতে,—আকাঙ্ক্ষাতরুটিকে নিত্য বাঁচিয়ে রাখাই তাঁর একমাত্র সাধনকর্ম: তা সে প্রেমের সাধনাই হোক, কিংবা ভক্তির সাধনা, কাব্যরসের সাধনাই হোক বা যে কোন সৌন্দর্যরসের সাধনা। কাব্যসাধনায় পরিপূর্ণ রসের উৎসরূপিণী কবিমানসীর প্রতি কবি যে আকুল আবেদন জানান :

হৃদয়-আকাশে থাক-না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।
... ...
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা
হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।" (মানসী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/সুরদাসের প্রার্থনা।)

কিংবা মূর্তিরূপে আগতা মানসীকে মিলন-সঙ্কীর্ণতায় আকাঙ্ক্ষার অবসানে ক্ষুব্ধ চিত্তে ভর্ৎসনা করেন ঃ

কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার !" (ঐ/পুরুষের উক্তি।)

সে আবেদন, সে ভর্ৎসনা শুধু কাব্যসাধনার নয়, রসের সমস্ত প্রকার সাধনার মর্মকথাকেই যেন ব্যক্ত করে।

বক্তব্যটিকে আর একটু বিশদ করা যাক। সৃষ্টিতত্ত্বে বর্ণনা করা হয়েছে—সৃষ্টির পূর্বে জীবজগৎ ছিল অস্তিত্বহীন কিংবা অব্যক্ত অবস্থায় পূর্ণব্রহ্মে বিলীন। লীলারসের আনন্দ সম্ভোগের জন্যই উভয়ের বিচ্ছিন্নতায় জীবজগতের সৃষ্টি। সৃষ্টিপূর্বের আনন্দহীন একক-সত্তা পূর্ণব্রহ্মের সৃষ্টি-অন্তে দ্বৈতসত্তার লীলামাধ্যমেই রস-আনন্দ-মাধুর্যাদি সত্তার পূর্ণ জাগরণ এবং ব্রহ্ম ও জীব উভয়েরই পূর্ণ রসসম্ভোগের আনন্দলাভ ঘটে। একক সত্তায় কোন আনন্দই পাওয়া যায় না—"একাকী ন রমতে।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ॥১/৪/৩॥)। কেননা দ্বিতীয় কোন সত্তার অস্তিত্ব না থাকায় তাকে পাবার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বা ব্যাকুলতাও সেখানে থাকে না। আমাদের বক্তব্য-প্রকাশের প্রয়োজনে সাহিত্যচিন্তা-প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের একটি উক্তি স্মরণ করি ঃ

> "হৃদয় যাহা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা সসীম সৌন্দর্য কিংবা পরিমিত আনন্দ নহে। যদি হইত, তাহা হইলে একদিন না একদিন ক্রমবিকাশের ফলে তাহার তৃপ্তি হইত। বস্তুতঃ ইহা অসীম সৌন্দর্য, অনন্ত প্রেম, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। পূর্ণ সৌন্দর্যের সম্ভোগ হইয়াছে বলিয়াই পূর্ণ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা হয়, বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যে তৃষ্ণা মিটে না। যাহা হইতে বিরহ, তাহাকে না পাইলে ব্যাকুলতার অবসান সম্ভবপর নহে।" (সাহিত্যচিন্তা, পৃ. ১)

এই উক্তি থেকে এই বিপরীত সিদ্ধান্তও প্রকট হয়ে ওঠে যে, যা থেকে বিরহ তাকে পেলে বিরহের সঙ্গে সমস্ত ব্যাকুলতারও অবসান ঘটে। সুতরাং প্রাপ্তি নয়, বিরহই ব্যাকুলতা ও তজ্জনিত রসবিভোরতার উৎস। ব্যাকুলতা যত গভীর হয়, আকাঙ্ক্ষার বস্তুও হৃদয়ের অনুভূতিতে ততই গাঢ়তর ও

আস্বাদমান হয়ে ওঠে। সকল ইন্দ্রিয়কে ছাপিয়ে তার অস্তিত্বের অনুভূতি অন্তরকে করে তোলে রসমুখী ও রসপূর্ণ। সকল মানসিকতা জুড়ে সে রসাস্বাদের আনন্দ আকাঙ্ক্ষিতের সৌন্দর্য-মাধুর্যকে নিত্য নূতন রসগৌরবে ভরিয়ে তোলে। এর ফলেই সৌন্দর্যময়, মাধুর্যময়, আনন্দময় রসের ক্রমবৃদ্ধি। এই মানসসম্ভোগেই রসের প্রকৃত আস্বাদ ও তজ্জনিত আনন্দ। হারাবার ভয় এ আনন্দকে ম্লান করে দিতে পারে না। তাই, বলতে গেলে এই ব্যাকুলতাই পরম সাধনা ও রসোপলব্ধির উৎস। বিরহকালের মানসসম্ভোগেই পূর্ণানন্দের প্রকৃত আস্বাদ ঘটে। রোমান্টিক বাংলা সাহিত্যের আদি কবি সৌন্দর্যসাধক বিহারীলাল এই সত্যটিকেই উপলব্ধি করে তাঁর 'সাধের আসন' কাব্যে লিখেছিলেন :

না বুঝিয়া থাকা ভালো
বুঝিলেই নেভে আলো
সে মহাপ্রলয় পথে ভুলি কভু ধাব না।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে অসংশয়িতভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে,— অনন্ত রসের আস্বাদজনিত চিরকালীন আনন্দলাভের ক্ষেত্রে মিলন অপেক্ষা বিরহ বা আলঙ্কারিকগণের ভাষায় যার নাম 'বিপ্রলম্ভ', তারই একমাত্র উপযোগিতা। বিশ্বসাহিত্যের পিছনে যে রসতত্ত্ব, তারও মূলকথা একই। কেননা, রতি প্রভৃতি ভাবজাত শৃঙ্গারাদি রসনির্ভর কাব্যাস্বাদজনিত আনন্দানুভূতির স্বরূপসন্ধানই তার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব এই বিপ্রলম্ভভাবনাকে যতখানি আত্মসাৎ করে নিয়ে তার কেন্দ্রীয় ভাবনায় পরিণত করেছে, তার তুলনা আর কোথাও মেলে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব এই বিপ্রলম্ভচেতনার উপর ভিত্তি করেই গড়ে তুলেছে তার দর্শন ও সাহিত্যের সুবিশাল সৌধ। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে দার্শনিক নলিনীকান্ত ব্রহ্মের একটি সিদ্ধান্ত আমাদের মুগ্ধ করে :

> "রসশাস্ত্রে স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাব, অনুভাব, আলম্বন প্রভৃতির এমন নিপুণ আলোচনা করা হইয়াছে যে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুভক্ত ভগবানকে অন্তরঙ্গভাবে পাইয়াছেন।·· ভগবান নরবপুতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তদের সহিত লীলা করিয়াছেন।"
>
> (ভারতের অধ্যাত্মবাদ/পৃ. ৭)

এ মন্তব্যের পশ্চাতে সমালোচকের কেন্দ্রীয় দৃষ্টি যে গৌড়ীয় রসতত্ত্ব ও রস-সাহিত্যের প্রতিই দৃঢ় নিবদ্ধ ছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই রসতত্ত্বই তার কাব্য ও দর্শনে ক্রমপল্লবিত হয়ে ভাবগম্ভীর এক বিশাল রসসমুদ্রে পরিণতিলাভ করেছে। শ্রীরূপ গোস্বামী-প্রণীত অন্যতম বৈষ্ণব আলঙ্কারিক গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বাস্তবিক নাম-করণের যথাযথ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ এবং গৌড়ীয় রসতত্ত্বের আত্মিক প্রাণবাণীটির যথার্থ ধারক ও বাহক। বৈষ্ণব দর্শনে, কাব্যে, সাধনায় তারই অনুস্যূতি। বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব, বৈষ্ণব কাব্য-দর্শন-ধর্ম-সাধনা—সব কিছুরই লক্ষ্য এগিয়ে গেছে একটিই শীর্ষবিন্দুর দিকে, সেই বিন্দু প্রেম বা প্রেমভক্তি,—যার দর্শন-গত নাম অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, কাব্যগত নাম রাধাকৃষ্ণ-লীলাকাহিনী, সাধনার ক্ষেত্রে নাম প্রেমভক্তিসাধন, আর রসতত্ত্বের ক্ষেত্রে তারই নাম হ'ল অখণ্ড প্রেমভক্তিরস। এগুলির একটি অপরগুলির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত, একটিকে বাদ দিয়ে অপর কোনটাই পুষ্টিলাভ করতে পারে না। কেননা, সকলকিছুর মধ্যেই স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়ে গেছে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব। বৈষ্ণব দর্শন এই রসতত্ত্বেরই মূল বীজ, বৈষ্ণব সাহিত্য সেই রসতত্ত্বেরই বিকশিত মহীরুহ। এককথায়, বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বই বৈষ্ণব দর্শন, সাধনা ও সাহিত্যের মুখ্য নিয়ন্ত্রক।

দুই

গৌড়ীয় রসতত্ত্বের পশ্চাৎপটে প্রচলিত কাব্যরসতত্ত্বটির একটু পরিচয় নিলে গৌড়ীয় রসতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবের পরিচয়টি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কাব্যরসতত্ত্বের আলোচনা সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের একটি অতি প্রিয় বিষয়, যার ফলশ্রুতি ভারতবর্ষের মধ্যযুগ পর্যন্ত বহুসংখ্যক অলঙ্কারগ্রন্থের সৃষ্টি। অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি, রস—এই চতুর্বিধ কাব্যতত্ত্বের রস হ'ল পরমতত্ত্ব। রসই কাব্যের মূল উৎস। আদিকাব্য রামায়ণের উৎস বিচার করতে গিয়ে আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধন দেখেছেন—প্রিয়া-বিয়োগে ক্রৌঞ্চের শোকহেতু বাল্মীকির মনে যে অলৌকিক করুণরসের সঞ্চার ঘটেছিল,—সেই রসই শ্লোকাকারে কাব্যের জন্ম দিয়েছে। তাই লিখেছিলেন :

"কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥"

(ধ্বন্যালোক ॥ ১/৫ ॥)

এ শ্লোকটি থেকেই কাব্যসৃজনে ভাব ও রসের সম্পর্কটিকেও সহজে চিনে নেওয়া যাবে। প্রিয়া-বিয়োগে ক্রৌঞ্চের যে শোক, তা হ'ল ভাব এবং তা লৌকিক। আর তদ্দর্শনে মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয়ের যে বিগলন এবং শ্লোকের মাধ্যমে তার প্রকাশ, সেই করুণ হ'ল রস এবং তা অলৌকিক। এই রসই কাব্যের পরমতত্ত্ব, কারণ রসই কাব্যের লক্ষ্য বা উপেয়। সেক্ষেত্রে বাচ্যবাচক অলঙ্কারাদি হ'ল কাব্যের উপায় অর্থাৎ সেগুলি একান্তই রসপরতন্ত্র। আনন্দবর্দ্ধনের ভাষায় :

"বাচ্যবাচকচারুত্বহেতূনাং বিবিধাত্মনাম্।
রসাদিপরতা যত্র স ধ্বনের্বিষয়ো মতঃ॥ (ঐ ॥ ২/৪ ॥)

আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের কণ্ঠে এ কথারই প্রতিধ্বনি শুনি—

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" (সাহিত্যদর্পণ ॥ ১/৩ ॥)

কাব্যরস সম্বন্ধে পুরাণসাহিত্যও পরিচয় দিয়েছে একই চিন্তাধারার :

"বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রাধান্যেঽপি রসএবাত্র জীবিতম্।"

(অগ্নিপুরাণ ॥ ৩৩৯/৩৩ ॥)

ভরতমুনি থেকে আলঙ্কারিক জগন্নাথ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পনের শতাব্দীরও অধিক-কালব্যাপী বহু আলঙ্কারিকের মতবাদে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বজনসম্মত কোন সিদ্ধান্ত গড়ে না উঠলেও কাব্যের মুখ্যফল যে "রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিত বেদ্যান্তরমানন্দম্।" (কাব্যপ্রকাশ : মম্মটাচার্য ॥ ১/২ ॥)—এ সম্বন্ধে অনেকেই একমত। এ আনন্দ লোকোত্তর। আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র বলেছেন :

"কাব্যমানন্দায় যশসে কান্তাতুল্যোপদেশায় চ।"

(কাব্যানুশাসন ॥ ১/৩ ॥)

অর্থাৎ আনন্দ, যশ ও কান্তাতুল্য উপদেশলাভ—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যেই কাব্যের রচনা। অপরদিকে মম্মটাচার্য কিন্তু যশ, অর্থ, ব্যবহারজ্ঞান. অমঙ্গল-নাশ, রমণীয় উপদেশলাভ এবং পরনির্বৃতি বা পরমানন্দ লাভ—এই ষড়্‌বিধ কাব্যফলের উল্লেখ করলেও একমাত্র পরমানন্দ লাভকেই মুখ্যফল এবং

অন্যগুলিকে গৌণফল হিসাকে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন।[২-৪] এ কারণেই আনন্দবর্দ্ধন রসকে উপমিত করেছেন রমণীদেহের অবয়বাতিরিক্ত লাবণ্যের সঙ্গে,[৩] আর বামনাচার্য রসের দীপ্তি বা প্রকাশকে বলেছেন—'কান্তি'।[৪]

কাব্যসংজ্ঞায় আনন্দবর্দ্ধন তাই এই আনন্দত্বের দাবিকে গোড়াতেই প্রতিষ্ঠিত করে বললেন :

"সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্।"

(ধ্বন্যালোক ১/১, বৃত্তি)

প্রতীচ্যেও মুখ্য কাব্যফল সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে দেখা যায় :

> "The object of poetry....is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure." (Aristotle's Theory of Poetry & Fine Art : S. H. Butcher, p. 221).

এই লোকোত্তরতার জন্যই ধ্বন্যালোক-টীকাকারের কাছে কাব্যানন্দ 'পরব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ' (দ্রঃ ॥ ২/৪ ॥), আর 'সাহিত্যদর্পণ'-কারের কাছে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ' (দ্রঃ ॥ ৩/২ ॥)। আনন্দ ও রসকে অনেকক্ষেত্রেই তাই সমার্থক বলে ধরা হয়েছে। যেমন 'দশরূপকে' ধনঞ্জয়ের মতে কাব্যার্থসম্মিলনে আত্মানন্দসমুদ্ভূত আস্বাদই রস ঃ

"স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভোদাদ্ আত্মানন্দ-সমুদ্ভবঃ।" (॥ ৪/৪৩ ॥)

কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্যও আছে। রস কেবল ভাবগত আনন্দ, কিন্তু আনন্দ কেবল ভাবগত নয়, তা বস্তুগত, বুদ্ধিগত প্রভৃতি নানা স্তরের হতে পারে। তাহলেও উভয়কে সমার্থক বললে খুব একটা অযৌক্তিক হয় না। এই রস বা আনন্দের সন্ধানেই জগতের ক্রমবিবর্তন, এই রস বা আনন্দই তার সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়ের মূল ; তাই উপনিষদের মন্ত্রে উচ্চারিত হয়েছে ঃ

২. "কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে ॥" (কাব্যপ্রকাশ ॥১/২॥)

৩. "প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥" (ধ্বন্যালোক ॥১/৪॥)

৪. "দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ ॥" (কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি ॥ ৩/২/১৫ ॥)

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" (তৈত্তিরীয় ॥ ৩/৬ ॥)

এ আনন্দের প্রধান রূপ তিনটি—বিষয়ানন্দ, কাব্যানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ বা অধ্যাত্মরসানন্দ। এ তিনটি বলতে গেলে বিবর্তনের বা আনন্দপ্রসারের ক্রমধারায় বিন্যস্ত। যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে আনন্দ এক ও অখণ্ড, কিন্তু প্রকারগত বা মাধুর্যগত আস্বাদের ক্ষেত্রে পারস্পরিক তারতম্য সীমাহীন। বিষয়ানন্দকামীদের বলা যেতে পারে চার্বাকবাদী। তাঁরা—

"যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।[৫]
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥" (আচার্য সায়ণমাধবের 'সর্ব-দর্শন সংগ্রহ', পৃ. ২)

এই মতের অনুসারী হয়ে একমাত্র জাগতিক বিষয়ের মধ্যেই রস বা আনন্দের সন্ধান করেন। কিন্তু এ আনন্দ নিতান্তই স্থূল, লৌকিক এবং স্বল্প। এখানে আনন্দের যে প্রাপ্তি, তা সঙ্কীর্ণ, অনিত্য এবং খণ্ডিত। বিষয়ের তিরোধানেই এ আনন্দ লোপ পায়। শুধু তাই নয়, জ্ঞান বা বোধের পরিবর্তনেও এ আনন্দের বিনাশ ঘটে এবং বৃহত্তম ও নিত্য আনন্দস্বাদের জন্য সে উন্মুখ হয়ে ওঠে। অনিত্য দেহের সুখের প্রতি, এমন কি দেহের প্রতিও কোন মোহ তখন থাকে না। তাই সকল বিষয়ানন্দকে সে তখন হেলায় অতিক্রম করে যায়। সুতরাং আনন্দ-সম্পর্কে মাধুর্য ও ব্যাপ্তির তারতম্য এখানে প্রকট। তাই ত্রিবিধ আনন্দের মধ্যে বিষয়ানন্দ একান্তই তুচ্ছ, জগতের শাশ্বত বা সারস্বত চিন্তাধারায় এর কোন স্থান নেই।

অপরদিকে, কাব্যরস ও অধ্যাত্মরসের যে আনন্দ, তার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা বা আবিলতা নেই, উভয়েই অলৌকিক। তা কামবাসনাজর্জরিত পার্থিব জগতের স্থূল বিষয়বিলাস থেকে মানুষের মনকে পরিচালিত করে হৃদয়ের গভীরতায় অনুভূতির ও উচ্চচিন্তার রাজ্যে। তাই কাব্যানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ—বিষয়ানন্দ অপেক্ষা গভীরতর, সূক্ষ্মতর ও অসীম। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে আবার পরমতমটি হ'ল ব্রহ্মানন্দ বা অধ্যাত্মরসানন্দ; কেননা,

৫. পাঠান্তর—"যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।..." (চার্বাকদর্শন ॥৫॥/সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ')

কাব্যরসানুভূতিতে চিত্তের সঙ্গে বিষয়-সংস্পর্শ অনিবার্য, কিন্তু অধ্যাত্ম-রসানুভূতি সমস্ত প্রকার বিষয়ের সংস্পর্শহীন এক সুনির্মল আনন্দধারা।

কাব্যরসের আনন্দ দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে একটা শাশ্বত মূল্য লাভ করে যা সঙ্কীর্ণ বিষয়ানন্দ লাভ করতে পারে না। কাব্যরসানন্দ তাই অসীম, ভূমাস্থানীয়। কাব্যজগৎ তাই একটা স্বতন্ত্র জগৎ, অলৌকিক আনন্দরসের অনন্ত উৎসারেই সে জগতের বিস্তার। কবি হলেন সে জগতের স্রষ্টা : "অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।" (অগ্নিপুরাণ ॥৩৩৮/১০॥)। জগতের সৃষ্টিকার্যে জগৎস্রষ্টার যেমন বিরতি নেই, নিত্য নব নব বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিকার্যে তিনি যেমন ব্যাপৃত, কাব্যজগতের সৃষ্টিকার্যে কবিও তাই। একই ভাব, একই পুরাতন বস্তুসমষ্টি কবিমানসে নিত্য-নূতন রসপরিগ্রহ করে কাব্যে রূপায়িত হয়ে চলে, বারবার ফিরে এলেও বসন্তঋতুর বৃক্ষ যেমন চিরনূতনই থাকে, কাব্যরসও তেমনই একই ভাবসমূহের বারংবার আবর্তনেও পুরাতন হয় না :

দৃষ্টপূর্বাঽপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ॥"

(ধ্বন্যালোক ॥ ৪/৪ ॥)

আর এ কারণেই :

"ন কাব্যার্থবিরামোঽস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ।

... ...

বাচস্পতিসহস্রাণাং সহস্রৈরপি যত্নতঃ।
নিবদ্ধা সা ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জগতামিব॥" (ঐ ॥ ৪/৬, ১০ ॥)

মানবমনে 'ভাব'-সৃষ্টির শেষ নেই বলেই জগৎপ্রকৃতির অনন্ত নূতন সৃষ্টি-কার্যের ন্যায় কবির লেখনীতে নিত্যনূতন রসসৃষ্টিরও বিনাশ নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কাব্যানন্দলাভের পিছনে রয়েছে চিত্তের সঙ্গে বিষয়-সংস্পর্শ,—আলঙ্কারিকের ভাষায় :

"ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্।

(সাহিত্যদর্পণ ॥ ৩/৮ ॥)

রতি প্রভৃতি বাসনা বা বিষয়সংস্পর্শ ব্যতীত চিত্তে আনন্দের কোন রেখাপাতই ঘটে না। বাসনারহিত চিত্ত আলঙ্কারিকের উপমায় :

"নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥"

(ঐ॥ ৩/৮ সূত্রে উদ্ধৃত ধর্মদত্ত বচন॥)

চিত্তের এই বাসনাই কাব্যতত্ত্বে 'ভাব' নামে পরিচিত। এ বাসনা অসংখ্য। রসতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং সাধারণ মানুষ উভয়েই অনুভব করেছেন রতি, হাস, শোক প্রভৃতি ন'টি ভাবের আসন মানবমনে চিরস্থায়ী ও বহুব্যাপক। মানবমনে এই ন'টি লৌকিক ভাবের বিগলনজাত পরিণতি হ'ল শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি নবরস। কাব্যে আনন্দধারার বিকাশ প্রধানতঃ এই ন'টি ধারায়। এগুলিকে তাই স্থায়িরস আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং এগুলির পিছনে ন'টি লৌকিক ভাবকে বলা হয়েছে স্থায়িভাব। অসংখ্য ভাবের অপ্রধান অন্যান্যগুলি এই প্রধান ন'টি ভাবসঞ্জাত রসেরই পুষ্টিসঞ্চারকারী। আলঙ্কারিকগণ তাই অপ্রধান ভাবগুলির নাম দিয়েছেন সঞ্চারী বা ব্যভিচারী অর্থাৎ যা স্থায়িরসসমূহের প্রতি বিশেষ অভিচারী। এই স্থায়িরস এবং স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবসমূহকে মুখ্য বিষয় করেই গড়ে উঠেছে সুবিশাল কাব্যরসশাস্ত্র।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কাব্যের বিষয় হিসাবে মানবমনে দেশকালনিরপেক্ষ স্থায়ী ও স্বাধীন যে সমস্ত ভাবের বিকাশ ঘটে, কাব্যবিদ্‌গণ সেগুলিকেই গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 'কাব্যের বিষয়-নির্বাচন' প্রবন্ধে ঊনবিংশ শতকের সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ডের (Matthew Arnold, 1822-1888) উক্তি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় :

> "The poet, has in the first place to select an excellent action ; and what actions are the most excellent ? Those certainly, which most powerfully appeal to the great primary human affections : to those elementary feelings which subsist permanently in the race, and which are iudependent of time. These feelings are permanent and the same ; that which interests them is permanent and the same

also. (Enghish Crifical Essays Nineteenth Century Selected & edited by Edmund D. Jones./The choice of Subjects in Poetry. p. 307)

তৃতীয়স্তরে যে অধ্যাত্মরসানন্দ, তাই হ'ল জীবজগতের সর্বাপেক্ষা বরেণ্য ঘনীভূত আনন্দ। এ আনন্দেরই অপর নাম ব্রহ্মানন্দ। সাধক তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তবেই এ আনন্দের সন্ধান পান। এই আনন্দলাভের অধিকার অর্জনকেই প্রচলিত শাস্ত্রে 'মুক্তি' নামে অভিহিত করা হয়েছে, যা সালোক্য সামীপ্যাদি পঞ্চধারায় বিভক্ত হয়ে সাধকের অভিরুচি-অনুযায়ী তাঁর মুক্তি বা ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মিলন সম্পাদন করে। এই মুক্তির সন্ধান-দানের উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনধারা। ব্রহ্মানন্দের পরমার্থতা ও স্থায়িত্ব, তার রসগত চমৎকারিত্ব, জীবজগতের অনিত্যতা ও ও দুঃখময়তা প্রভৃতির আলোচনায় মুক্তিসাধন তথা ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তির দিকে জীবসাধককে চালনা করাই এ সকল ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পারমার্থিক মুক্তিবাসনা ব্যতীত জাগতিক কোন উপাধি বা ভোগবাসনার স্পৃহা এই ব্রহ্মসাধনায় থাকে না। একারণেই তা সাধারণ বিচারে নিরুপাধি এবং অখণ্ড ও নির্মল আনন্দপ্রবাহের উৎস। এ ব্রহ্মানন্দ নির্বিশেষ অরূপের উপলব্ধি, আর এ উপলব্ধিই হ'ল সাধকের নির্বিকল্প সমাধি। এ অবস্থা সম্পর্কেই গীতায় পার্থকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন :

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিতাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥" (॥ ২/৭২ ॥)

["হে পৃথাপুত্র! এই অবস্থাই ব্রাহ্মীস্থিতি, এই অবস্থা লাভ করিলে আর কেহ মোহগ্রস্ত হন না। অন্তিম সময়েও যিনি এই অবস্থা লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন।" (অনুবাদ : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।)]

কাব্যানন্দের সঙ্গে এতাদৃশ ব্রহ্মানন্দের তাই কোন তুলনা চলে না। কাব্যানুভূতির মধ্যে ব্রহ্মানুভূতির ন্যায় একটা অপার্থিব চিন্ময় সত্তা থাকার জন্যই কাব্যরসকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'-ইত্যাদি বলে আলঙ্কারিকেরা যে মত প্রকাশ করেছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। কাব্যরসের আস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদের নিকটবর্ত্তী বলে বরং গ্রহণ করা চলে। কাব্যানন্দে চিত্তের

পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে না এবং সে কারণে চিত্তের পরিপূর্ণ তদ্গত তন্ময়তাও কাব্যানন্দে সৃষ্টি হয় না। কাব্যাস্বাদমুহূর্তগুলি ব্যতীত অন্যান্য সময়ে চিত্তের এই বিকাশ ও তন্ময়তা অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। কিন্তু ব্রহ্মানন্দাধিকারীর চিত্ত সর্বদাই তদ্গত ও তন্ময়, সম্পূর্ণ পার্থিব চেতনাবিমুক্ত। কাব্যানুভূতির পরেও প্রশ্ন করা চলে—'অতঃ কিম্?' কিন্তু ব্রহ্মানন্দানুভূতির পর এ প্রশ্ন চলে না, কারণ ব্রহ্মানন্দ হ'ল পরিপূর্ণ প্রাপ্তি। আলঙ্কারিক ভট্টনায়ক উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ করে তাই লিখেছিলেন :

"বাগ্‌ধেনুর্দুগ্ধ এতং হি রসং যদ্‌বালতৃষ্ণয়া
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্ দুহ্যতে যোগিভির্হি যঃ।" (ধ্বন্যালোক ১/৬-এর লোচন-টীকায় উদ্ধৃত 'হৃদয় দর্পণ-এর শ্লোক।)

ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত-মহাশয় এর সঙ্গে অতিরিক্ত উপমা সংযোজন করে উভয়ের পার্থক্যটিকে স্বপক্ষে আরো সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন :

"স্বয়ংপ্রভ সূর্যের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ সর্বদাই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মানন্দ তাই অদ্বৈত, নির্বিকল্প, অস্পর্শযোগগম্য এবং ত্রিগুণাতীত। কাব্যানন্দ সজাতীয় হইলেও ভিন্ন ও নিম্নস্তরের, যেমন সূর্য ও তাহার আলোকে আলোকিত চন্দ্র। ব্রহ্মানন্দ দুর্লভ বস্তু; কিন্তু কাব্যকে আশ্রয় করিয়া বাগ্‌ধেনুর রসদুগ্ধ সকলেই আস্বাদন করিতে পারেন।" (কাব্যালোক/পৃ. ১০-১১)।

তিন

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে কাব্যের অন্তরঙ্গতম হিসাবে যে রসতত্ত্বের সর্বপ্রথম ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, কালক্রমে পরস্পরবিরোধী অসংখ্য মতবাদের উত্থান-পতনে, অলঙ্কারাদি বহিরঙ্গ বা গৌণ উপাদানসমূহকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠাদানের প্রয়াসে তর্কবিতর্কের স্রোতে দিশাহারা হয়ে সেই মূল রসতত্ত্বটিই উপেক্ষিত হওয়ায় কাব্যমীমাংসার বিচারক্ষেত্রটি এক মহারুদ্রের জটাজালে পরিণতি লাভ করেছিল। সেই ঘূর্ণাবর্তে আমরাও তলিয়ে যেতাম, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য কাব্যতত্ত্বে রসগঙ্গার অমৃতধারাটিকে জটাজালের সহস্র বন্ধন থেকে

উদ্ধার করে 'ধ্বন্যালোকে' তার স্বচ্ছন্দ প্রবাহটির মুক্তিদান করলেন ভগীরথ আনন্দবর্দ্ধন। তিনি তাঁর অপূর্ব প্রজ্ঞাবলে পূর্বতন কাব্যতত্ত্ববিদ্‌গণের পরস্পর বিরোধী মতাবলীকে সমন্বয় করে অলঙ্কারাদি বহিরঙ্গের কবল থেকে রসতত্ত্বটিকে মুক্ত করে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই এ যুগে রসতত্ত্বের আলোচনা প্রধানতঃ ধ্বন্যালোককে এবং তার মুখ্য প্রতিপাদ্য ভরতের রসতত্ত্বকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

কাব্যরসের সৃষ্টি সম্বন্ধে ভরতমুনির মতব্যাখ্যায় টীকাকার লিখেছেন :

যথা নানাব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্যসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ, তথা··· নানা ভাবোপহিতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি।

(নাট্যশাস্ত্র ॥ ৬/৩১ টীকা ॥)

অর্থাৎ নানাবিধ ব্যঞ্জন, ঔষধিদ্রব্যসংযোগে যেমন রসনিষ্পত্তি ঘটে, সেইরূপ নানাভাবের সংস্পর্শেই স্থায়িভাবসমূহ রসত্ব লাভ করে। সে কারণেই ভাষ্যকারের রসব্যাখ্যা :

"রস ইতি কঃ পদার্থ? উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ। কথামাস্বাদ্যতে রসঃ? অত্রোচ্যতে—যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাপ্যধিগচ্ছন্তি, তথা নানা ভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি। (ঐ ॥ ঐ ॥)

সুতরাং আস্বাদক্ষেত্রেই রসের অস্তিত্বের প্রমাণ। সুপক্ক অন্নের আস্বাদনে আস্বাদক যেমন আনন্দলাভ করেন, তেমনি নানা ভাবাভিনয়ব্যঞ্জিত রসপদবী-প্রাপ্ত স্থায়িভাবসমূহের আস্বাদনে সহৃদয় দর্শকও লোকোত্তর আনন্দের অধিকারী হন। উভয়রসেরই অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ চর্বণায় বা প্রত্যক্ষ আস্বাদনে,—অনুমান, স্মৃতি বা অন্যকিছুতে নয়। টীকাকারের ভাষায় :

"অনুমান-স্মৃত্যাদি সোপানমনারুহ্যৈব তন্ময়ী-ভাবোচিত-চর্বণা প্রাণতয়া।"

(ঐ ॥ ঐ ॥)

আলঙ্কারিক ভরত লৌকিক উপমায় কাব্যরসের ব্যাখ্যা করলেও কাব্য-রসের অলৌকিকত্বের ব্যঞ্জনা এখানে স্পষ্ট। আহার্য ব্যঞ্জনাদির আস্বাদ আস্বাদ-যন্ত্রে অর্থাৎ জিহ্বায়। স্মৃতির মাধ্যমে সে আস্বাদের সুখানুভূতি মানসিকতাকে

কিছুটা প্রভাবিত করলেও তা লৌকিক, কেননা আস্বাদের সুখস্মৃতি প্রত্যক্ষ আনন্দ দান করে না, সে আনন্দ কেবলমাত্র আস্বাদকালের অর্থাৎ তাৎক্ষণিক। কিন্তু ভাবের পরিণতি রসের যে আস্বাদ, তার স্থান পরিপূর্ণভাবে অনুভূতির গভীরতায়, তাই তা অলৌকিক। একারণেই কাব্যরসের যথার্থ আস্বাদ কাব্য-দেহের বা শব্দার্থের তাৎপর্যজ্ঞানে নয়, একমাত্র কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই তা সম্ভব হয়।[৬] যা কাব্যদেহাতিক্রমী ব্যঞ্জনাময়, একমাত্র সমাহিত চিত্তের অনুভূতিতেই সে ব্যঞ্জনার তাৎপর্য ধরা পড়ে। আচার্য বামনের "চিত্তৈকাগ্র্যমবধানম্।" (কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি ॥ ১/৩/১৭ ॥), "অর্থদৃষ্টিঃ সমাধিঃ।" (ঐ ॥ ৩/২/৭ ॥) প্রভৃতি সূত্রসমূহেও প্রকৃত কাব্যার্থের আস্বাদক্ষেত্রে চিত্তের একাগ্রতা কিংবা সমাধিস্থ বা সমাহিত দৃষ্টি—অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই গভীর অনুভূতিকেই একমাত্র হেতুজ্ঞান করা হয়েছে, যা বাচ্যার্থ বা শব্দার্থকে উপেক্ষা করে অন্তর্নিহিত কাব্যার্থের তথা রসবস্তুর উপলব্ধি ঘটায়। কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণে ব্রাড্‌লির (A. C. Bradley) বক্তৃতায়ও ধরা পড়েছে সে সত্য :

> "About the best poetry, and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all. He said what he meant, but his meaning seems to beckon away beyond itself, or rather to expand into something boundless, which is only focussed in it ; something also which, we feel, would satisfy not only the imagination, but the whole of us ;" (Oxford Lectures on Poetry/Poetry for Poetry's Sake. p. 26)

ব্রাড্‌লির বক্তৃতার সারমর্ম : কবি কাব্যে যা ভাষায় প্রকাশ করেন, তা সমগ্র অর্থের সঙ্কেত মাত্র। প্রকৃত অর্থ সেই শব্দার্থকে অতিক্রম করে অসীমের

৬. "শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে স তু কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্॥" (ধ্বন্যালোক ॥ ১/৭ ॥)

ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। পাঠকের একমাত্র গভীর অনুভবেই প্রকাশিত ও অপ্রকাশিতের সম্মিলিত সর্বব্যাপী সামগ্রিক অর্থটি ধরা পড়ে।

এ অনুভূতি বিশ্বজনীন। কাব্যরসের এই অলৌকিকত্বের জন্যই প্রতীচ্যের কবি শেলি (Percy Busshe Shelley, 1792-1822)-প্রভৃতির কাছে কাব্য একটি দৈব-ব্যাপার বলে প্রতিভাত হয়েছে।[১] কাব্যের জগৎ অরূপ ও অনন্ত, তাই শত আবরণের উন্মোচনেও তার অন্তরতম সৌন্দর্যের তথা রসের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে না। তা যেন প্রজ্ঞা ও আনন্দের জলোচ্ছ্বাসে পূর্ণ নিত্য-কালের এক অবিনাশী প্রস্রবণ :

> "All high poetry is infinite ; ··· Veil after veil may be undrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed. A great poem is a fountain for ever overflowing with the waters of wisdom and delight." (Do. p. 127).

এ কারণেই কাব্যের সৃষ্টিক্ষেত্রে পুরাতন বলে কিছু নেই। তা সর্বক্ষেত্রেই অদৃষ্টপূর্ব ও অচিন্তিতপূর্ব আনন্দের সৃষ্টিকারক। তাই কাব্যের সত্য লৌকিক সত্য থেকে ভিন্নরূপ হ'লেও কবি কাব্যে যা সৃষ্টি করেন, তাইই প্রকৃত সত্য। এ অনুভূতি দেশকালনিরপেক্ষ। তাই শত শত বৎসর পূর্বে এ্যারিষ্টটল যে কথা বলে গিয়েছিলেন :

> " ··the poets function is to describe, not the thing that has happened, but a kind of thing that might happen, i.e. what is possible as being probable or necessary'. (Aristotle : On the Art of Poetry. Translated by Ingram Bywater, p. 43)

আজকের কবিও সেই একই কথা বলেন তাঁর কবিতায় :

> "ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি,
> রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।" (ভাষা ও ছন্দ শীর্ষক কবিতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

---

১. 'Poetry is indeed something divine." (English Critical Essays, Nineteenth Century./A Defence of Poetry, p. 131)

তাঁর উপলব্ধিতেও ধরা পড়ে, কাব্যের সত্য উপলব্ধির, আর পরিপূর্ণ উপলব্ধিই আনন্দ বা রসের জন্ম দেয়। সে অর্থে কাব্যের সত্যই হল মাধুর্য বা রস। (দ্রঃ সাহিত্য/সৌন্দর্য্যবোধ।) এ্যারিষ্টটলের ন্যায় তিনিও অনুভব করেন—"সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে।" (সাহিত্য / সাহিত্যের বিচারক।) কিংবা :

> "As art creations are emotional representations of facts and ideas, they can never be like the product of photographic camera,···the artist in his work does not follow nature's copacious heterogeneity, but his own human nature, which is selective." (The Meaning of Art. p. 10-11.)

কাব্য কি ?—এ প্রশ্নের উত্তরে প্রতীচ্য রস-সমালোচক লী হাণ্টের (James Henry Leigh Hunt, 1784-1859) বক্তব্য—যেখানে বস্তু ও বিজ্ঞানজগৎ ব্যর্থ, সেখানেই কাব্যজগতের সূত্রপাত। কাব্য যে সত্যকে প্রকাশ করে তা বস্তুসত্য বা বিজ্ঞানসত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সর্বব্যাপী অনুভূতির মধ্যে দিয়ে অনুভববেদ্য আনন্দরসের সৃষ্টিতেই কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য,[৮] বস্তুসত্যের প্রতিফলন নয় বলেই কাব্যের সত্য বস্তুজীবন-কাহিনী-নির্ভর সাহিত্য থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক। মনীষী ষ্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill 1806-1873) ভাষায় উভয়ের সত্যস্বরূপের স্বাতন্ত্র্যময় বৈশিষ্ট্যসমূহ একটিমাত্র কথায় ধরা পড়েছে :

> "The truth of Poetry is to paint the human soul truly ; the truth of fiction is to give a picture of life.' (E.C.E./Thoughts on Poetry and its Varieties, p. 344)

৮. "Poetry begins where matter of fact or of science ceases to be merely such, and to exhibit a further truth ; that is to say, the connexion it has with the world of emotion, and its power to produce inaginative pleasure (E. C. E. 19th Cent. /An Answer to the Question : What is Poetry, p. 257)

আর এ-কারণেই— "Poetry is more closely related to the universal than history. (Aristotle's Poetics : Humphry House, p. 80) বিশ্বের জীবনস্রোতের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হয়ে আছে ইতিহাস অপেক্ষা সাহিত্য অনেক বেশি।

বস্তুজগতের বস্তুনির্মাণের সঙ্গে কাব্যনির্মাণের কোন তুলনা চলে না। বস্তুজগতে মানুষ যা গড়ে তা সৃষ্টি নয়, উপকরণসমূহের আকার-পরিবর্তন-মাত্র, তার রূপ তার সৌন্দর্য দৃষ্টিগ্রাহ্য। কিন্তু কাব্যজগৎ নিত্যনূতন সৃষ্টির জগৎ, প্রয়াস বা পরিশ্রমে বস্তু গড়া চলে কিন্তু কাব্য গড়া চলে না। কাব্যকে শেলি যে দৈব-ব্যাপার বলেছেন তা বাস্তবিক যথার্থ। রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করেছিলেন :

> "সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের নহে, রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী।" (সাহিত্য / সাহিত্যের তাৎপর্য।)

নদীর প্রবাহের মতই তার প্রকাশ তাই স্বতঃস্ফূর্ত। কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের (William Wordsworth, 1770-1850) সুবিখ্যাত পঙ্‌ক্তি স্মরণীয় :

> "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings." (E.C.E./Poetry and Poetic Diction p. 5.)

এজন্যই কবিতাকে ষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেন স্বগতোক্তি প্রকৃতির,[৯] আর কবিকে শেলি বলেছেন নাইটিঙ্গেল।[১০] কেননা নাইটিঙ্গেল পাখির সুরের মতই কাব্যের সত্য ও সৌন্দর্য স্বতঃস্ফূর্ত, তা ব্যক্তিজীবনের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত জগৎ ও জীবনের আসলরূপ। বাস্তবের কঠিন শাসনকে অগ্রাহ্য করা চলতে পারে বলেই কাব্যরসবিদদের অনুভবে রস হল 'পূর্ণমানবতার লীলা', কারণ তা

৯. "All poetry is of the nature of soliloquy. (Do/Thoughts on Poetry and its Varieties. p 348.)

১০. "A poet is a nightingale, who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds ;" (Do/A Defence of Poetry, p. 11))

'মানবহৃদয়ের একটি অতি ঘনিষ্ঠ অনুভূতি।'[১১] ভাবের প্রকাশই সৌন্দর্য,[১২] আর সেই সৌন্দর্যের অনুভূতিই হ'ল রসের আস্বাদ।

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে এই রসের সংখ্যা ন'টি, আলঙ্কারিক উদ্ভটের ভাষায় :

"শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥"

(কাব্যালঙ্কারসার সংগ্রহ ॥ ৪/৪ ॥)

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন নবম শতাব্দীর আলঙ্কারিক উদ্ভটের পূর্ব পর্যন্ত শান্তকে পৃথক রসের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ভরতমুনিও শান্তকে বাদ দিয়ে অন্য আটটি রসেরই উল্লেখ করেছিলেন তাঁর নাট্যশাস্ত্রে।[১৩] অবশ্য শান্তকে ভরত অস্বীকার করেননি, কিন্তু তাকে তিনি স্থায়িভাবের মর্যাদা দেননি। তাঁর মতে শান্তভাবই মূল প্রকৃতি, রতি প্রভৃতি তার বিকার মাত্র; তাই শান্তভাব থেকেই সর্বভাবের উৎপত্তি, আবার তার মধ্যেই সকল ভাবের বিনাশ।[১৪] তবে এ যুগে বিভিন্ন আলঙ্কারিকের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে কাব্যরস শান্তসহ ন'টি হিসাবেই গৃহীত হয়েছে। এই নববসের বাইরে রুদ্রট একটি অতিরিক্ত রসের উল্লেখ করেছেন—'প্রেয়ঃ'।[১৫] অপরদিকে দশম রস হিসাবে 'বৎসল' নামে আর একটি রসের সংযোজন করতে চেয়েছেন আলঙ্কারিক

১১. দ্রঃ সাহিত্যবিচার : মোহিতলাল মজুমদার, পৃ. ৪, ৬।

১২. "Beauty is the expression of what generally called emotion,"—The Theory of Beauty : E. F. Kerit, p. 296.

১৩. "শৃঙ্গার-হাস্য-করুণা-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুত সংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥" (নাট্যশাস্ত্র ॥৬/১৬॥)

১৪. "ভাবা বিকারা রত্যাদ্যাঃ শান্তস্য প্রকৃতির্মতঃ।
বিকারঃ প্রকৃতের্জাতঃ পুনস্তত্রৈব লীয়তে॥
স্বং স্বং নিমিত্তমাসাদ্য শান্তাদ্ভাবঃ প্রবর্ততে।
পুনর্নিমিত্তাপায়ে তু শান্ত এব প্রলীয়তে॥"

১৫. দ্রঃ কাব্যালোক, পৃ. ৬৫

বিশ্বনাথ ও ভোজদেব।[১৬] অসংখ্য আলঙ্কারিকের অন্যান্যদের রচনায় এ দু'টির একেবারেই অনুল্লেখ কাব্যরসতত্ত্বে এ দু'টির মূল্যকে বিশেষ একটা বহন করে না ঠিকই, কিন্তু গৌড়ীয় রসতত্ত্বে এ রস দু'টির গুরুত্ব অসাধারণ। সেখানে এ দুটি মুখ্য পঞ্চরসের মধ্যে মুখ্যতর রসত্রয়ের দু'টি রস। গৌড়ীয় রসতত্ত্বে প্রেয়োরসের অপর নাম সখ্য-ভক্তিরস, আর বৎসল হল বাৎসল্য-ভক্তিরস। তাই কাব্যরসতত্ত্বে প্রেয়ঃ ও বৎসল রসের বিকাশ না ঘটলেও গৌড়ীয় রসতত্ত্বে রুদ্রট, বিশ্বনাথ ও ভোজদেব বিশেষভাবে স্মরণীয়। অবশ্য একথা ঠিক, গৌড়ীয় রসতত্ত্বের প্রতিটি কণিকায় সঞ্চারিত যে সর্বপ্রধান ও একমাত্র রস—ভক্তিরস, তার সঙ্গে রুদ্রট প্রভৃতির প্রেয়ঃ ও বৎসলরসের কোন যোগসূত্র নেই। প্রাক-গৌড়ীয় যুগের সুবিশাল কাব্য-শাস্ত্রে ভক্তিরসের উল্লেখই কোথাও নেই, যা গৌড়ীয় রসদর্শনে সকল রসতত্ত্বের প্রাণকেন্দ্র। ভোজদেব অবশ্য আরো একটি কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে স্মরণীয়—সেটি হল বিভিন্নপ্রকার রসের মধ্যে একমাত্র শৃঙ্গাররসের প্রাধান্যকে আলঙ্কারিকগণের মধ্যে কেবলমাত্র তিনিই স্বীকার করেছেন।

লৌকিক কাব্যশাস্ত্রে নবরসের ক্রমটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ক্রমের আদিতে শৃঙ্গার ও অন্তে শান্ত। লৌকিকমতে শৃঙ্গার হ'ল আদিরস; মানুষই হোক বা মানবেতর প্রাণীই হোক, মনের বিকাশ থাক বা না থাক—রতিভাব সকল অন্তরেই বিদ্যমান। রতির প্রকাশ তাই সর্বত্র। লৌকিক জগতে রসের বিবর্তনধারার সূত্রপাত তাই রতিজাত শৃঙ্গাররস থেকেই। মদনজাত শৃঙ্গ অর্থাৎ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে রমণীসহ বিলাস-বিহারাদিজনিত রসই আলঙ্কারিকের মতে শৃঙ্গার ঃ

"শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তম প্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥" (সাহিত্যদর্পণ ॥ ৩/১৮৮ ॥)

---

১৬. "বৎসলশ্চ রস ইতি তেন স দশমো রসঃ।
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলশ্চ রসং বিদুঃ॥" (সাহিত্যদর্পণ : বিশ্বনাথ ॥ ৩/২৩১ ॥

এবং—"শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুত রৌদ্রহাস্যবীভৎসবৎসল ভয়ানক শান্ত নাম্নঃ।"

(শৃঙ্গারপ্রকাশ : ভোজরাজ।)

নরনারীর পারস্পরিক দৈহিক সুখলিপ্সাই এখানে প্রধান। তাই কাব্যাদিতে যে শৃঙ্গাররসের প্রকাশ দেখা যায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থূল,—ভোগাকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় ও কামকেলিবিলাসে পর্যবসিত। এ জাতীয় শৃঙ্গাররসের আনন্দ তাই সাময়িক। কারণ, এর যে বিভাব—নরনারীর রূপগুণাদি, তা সীমাবদ্ধ। তাই তা আদিরস নামে পরিচিত এবং রসশাস্ত্রে তার স্থান সর্বনিম্নে বা আদিতে।

কাব্যশাস্ত্রে প্রধান বা সর্বশ্রেষ্ঠ রস হল শান্তরস। পার্থিব স্থূল ভোগ-বাসনা এখানে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় বলেই এ রসকে কাব্যশাস্ত্রে বিশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ভরতাদি আলঙ্কারিক যাঁরা শান্তকে রস হিসাবে স্বীকার করেন নি, তাঁরাও সকল ভাবের সৃষ্টি-প্রলয়ের মূলীভূত কারণ হিসাবে শান্তের একান্ত মর্যাদাকে অস্বীকার করতে পারেন নি।[১৭] শান্ত অবস্থা এক নির্বিকল্প নির্বিশেষ অবস্থা ; কেননা শান্তরসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

> "নাস্তি যত্র সুখং দুঃখং ন দ্বেষো ন চ মৎসরঃ।
> সমঃ সর্বেষু ভূতেষু স শান্তঃ প্রথিতো রসঃ॥ (ভ. র. সি. ॥ ৩/১/৪৮-
> ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর বচন॥)

এ অবস্থারই অপর নাম মুক্তি—দুঃখ-জরা-পুনর্জন্মহীন বৈকুণ্ঠবাস ও ঈশ্বর-সাযুজ্যলাভের অধিকার অর্জন। এ কারণেই শান্তরসকে আচার্য অভিনব গুপ্ত সর্বরসশিরোমণি ও পরম পুরুষার্থ বলে বর্ণনা করেছেন :

> "মোক্ষফলত্বেন চায়ং (শান্তরস) পরম পুরুষার্থনিষ্ঠত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ প্রধানতমঃ।" (অভিনবভারতীভাষ্য/৬ষ্ঠ অধ্যায়।)

একমাত্র শৃঙ্গাররসের কিছু প্রকারভেদ ব্যতীত কাব্যরসতত্ত্বে স্থায়ী নবরসের আর কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে না। কাব্যশাস্ত্রে এই শৃঙ্গাররস দ্বিবিধ :

> "বিপ্রলম্ভোঽথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ।"
> (সাহিত্যদর্পণ ॥ ৩/১৮৯ ॥)

নবরসের একটি অংশ হিসাবেই কাব্যরসশাস্ত্রে শৃঙ্গাররসের স্থান এবং সে স্থানও সর্বাপেক্ষা নিম্নে অর্থাৎ আদিতে। কিন্তু গৌড়ীয় রসতত্ত্বে এই শৃঙ্গার

---

১৭. দ্রঃ ১৪ সংখ্যক পাদটীকায় উদ্ধৃত শ্লোক।

হল সর্বশ্রেষ্ঠ রস। দ্বিবিধ শৃঙ্গাররসের মধ্যে আবার বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারকেই একমাত্র আশ্রয় করে গৌড়ীয় রসতত্ত্ব নির্মাণ করেছে তার সুবিশাল সৌধ যা অজস্র বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার কাব্য-দর্শন-সাধনার সকল স্তরেই। 'সাহিতদর্পণে' বিশ্বনাথ বিপ্রলম্ভের সংজ্ঞা দিয়েছেন :

"যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ।"

(॥ ৩/১৯০ ॥)

অর্থাৎ অনুরাগ অতীব বৃদ্ধি পাওয়ার পর—"নায়িকা নায়কং, নায়কো বা অভীষ্টাং নায়িকাং ন উপেতি—বিঘ্নবিশেষাৎ যথেচ্ছং ন প্রাপ্নোতি, অসৌ স বিপ্রলম্ভঃ শৃঙ্গারঃ স্যাৎ।" (ঐ/কুসুমপ্রতিমা টীকা।)। সহজ কথায়, মিলনবাসনা যেখানে নানা বিঘ্নবশতঃ চরিতার্থতা লাভ করতে পারে না, তাই বিপ্রলম্ভ। এই বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ :

"স চ পূর্বরাগ-মান-প্রবাস-করুণাত্মকশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ।"

(ঐ ॥ ৩/১৯১ ॥)

এই বিভাজনের চতুর্থতম করুণবিপ্রলম্ভ এবং কাব্যরসক্রমের তৃতীয়তম করুণ-রস কিন্তু এক নয়। 'সাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথ সেকথা স্পষ্টই নির্দেশ করে দিয়ে বলেছেন :

"শোকস্থায়িতয়া ভিন্নো বিপ্রলম্ভাদয়ং রসঃ।
বিপ্রলম্ভে রতিঃ স্থায়ী পুনঃ সম্ভোগহেতুকঃ॥" (॥ ৩/২২১ ॥)

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের এ সকল বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও কাব্যরসতত্ত্বে বিপ্রলম্ভকে কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আলঙ্কারিক-নির্দেশিত পথে পরিচালিত হওয়ায় সংস্কৃত বা প্রাকৃতভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতীয় শৃঙ্গাররসাত্মক সাহিত্যের কবি-নাট্যকারগণও বিপ্রলম্ভকে তাঁদের রচনায় বিশেষ স্থান দেননি। কি কাব্য, কি নাটক সকলই ছিল মিলনান্ত এবং সর্বস্তরে সম্ভোগা-কাঙ্ক্ষার তীব্রতাকেই তারা বহন করেছে। আলঙ্কারিক-নির্দেশিত বিধি মান্য করার ফলেই বিপ্রলম্ভাত্মক কাব্য-নাটকের সংখ্যা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বিরল এবং বিপ্রলম্ভান্ত কাব্যসংখ্যা শূন্য। ধ্বন্যালোকের টীকায় একমাত্র অভিনব গুপ্তকেই বলতে শুনি—"সম্ভোগ-শৃঙ্গারাৎ মধুরতরো বিপ্রলম্ভঃ,···।" কিন্তু এটুকু মতবাদের প্রচার টীকাকারের উদ্দেশ্য ছিল না, করুণরসকে মধুরতম

হিসাবে প্রচার করার জন্যই তিনি বাক্যাংশ হিসাবে ওটি ব্যবহার করেছিলেন, সমগ্র বাক্যটি হল :

"সম্ভোগ-শৃঙ্গারাৎ মধুরতরো বিপ্রলম্ভঃ, ততোঽপি মধুরতমঃ করুণ ইতি।"

(ধ্বন্যালোক ॥ ২/৯ টীকা ॥)

কাব্যরসতত্ত্বে এই করুণরসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ব্যাখ্যা করে জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ লিখেছেন :

"অয়ং হি লোকোত্তরস্য কাব্যব্যাপারস্য মহিমা, যৎ প্রযোজ্যা অরমণীয়া অপি শোকাদয়ঃ পদার্থা আহ্লাদমলৌকিকং জনয়ন্তি।"

(রসগঙ্গাধর, প্রথমমাননম্, পৃ. ৭৫)

অর্থাৎ, লোকোত্তর কাব্যব্যাপারের মহিমাই এই যে, কাব্যের দ্বারা উপস্থাপিত রমণীয়তাবিহীন শোকাদি পদার্থও অলৌকিক আহ্লাদের সৃষ্টি করে।

করুণরস লোকচিত্তকে সহজেই জয় করে এবং দুঃখস্বরূপকে অতিক্রম করে অন্তরগভীরে বাস্তবিক একটা স্থায়িসুখের আস্বাদ দান করে ; করুণরসের ভাণ্ডার রামায়ণই তার প্রমাণ। সংস্কৃত সাহিত্যে করুণরসাত্মক কাব্যভাণ্ডার তাই সু-পুষ্ট, তবে সে কারুণ্য বিপ্রলম্ভ-সঞ্জাত নয়, বিপ্রলম্ভাত্মক কাব্যরচনার প্রয়াস সেখানে একান্তই বিরল।

চার

গৌড়ীয় রসতত্ত্বের জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক রসজগৎ, কেননা,—প্রচলিত কাব্যরসতত্ত্বের পথ ধরে গৌড়ীয় রসতত্ত্বের জগৎ বিবর্তন লাভ করেনি। তাহলেও তার স্বাতন্ত্র্য ও মাধুর্যরসের গৌরবমণ্ডিত পরম রূপটি কাব্যরসতত্ত্বের পটভূমিকায় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বলেই পূর্বাধ্যায়ে কাব্যরসতত্ত্বের এক সংক্ষিপ্ত পরিচিতির অবতারণা করা হয়েছে। গৌড়ীয় রসকোবিদ্‌গণ রসকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, যেখানে পূর্ণতম আনন্দের বিকাশ, এবং কাব্যতত্ত্ববিদ্‌গণের ব্যাখ্যাত রস থেকে তা বহু ঊর্ধ্বায়িত। এ রস প্রেমরস বা প্রেমভক্তিরস। শৃঙ্গাররস এরই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রচলিত কাব্যরস ও গৌড়ীয়

রসের তুলনামূলক আলোচনায় খদ্যোত ও সূর্যপ্রভার উপমা দিয়ে গৌড়ীয় আলঙ্কারিক লিখেছেন :

"কান্তাদিবিষয়া বা যে রসাদ্যাস্তত্র নেদৃশম্।
রসত্বং পুষ্যতে পূর্ণসুখাস্পর্শিত্ব কারণাৎ॥
পরিপূর্ণরসা ক্ষুদ্ররসেভ্য ভগবদ্রতি।
খদ্যোতেভ্য ইবাদিত্যপ্রভেব বলবত্তরা॥" (ভক্তিরসায়ন :
শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী॥ ২/৭৭-৭৮॥)

অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ে রতি প্রযুক্ত হওয়ায় যে প্রকার রসপুষ্টি ও আনন্দের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, কান্তাদিবিষয়ক শৃঙ্গারাদি রসে সেরূপ ঘটতে পারে না। কারণ ভগবৎ-রতি যেখানে সূর্যপ্রভার ন্যায় পরিপূর্ণ রস. সেক্ষেত্রে কান্তাদিবিষয়ক রতি খদ্যোতের আলোককণার মতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রসের কারক। একারণেই 'অলঙ্কার কৌস্তুভ'-এর টীকাকার প্রাকৃত রত্যাদিজাত শৃঙ্গারাদি রসকে রস পদবাচ্য করতেই অস্বীকার করেছেন এবং রসপ্রচারকদের বলেছেন ভ্রান্ত :

"প্রাকৃতে রস এব নাস্তি,····· প্রাকৃতে যে রসং মন্যন্তে তে ভ্রান্তা এব, —যতোঽত্র কৃমিবিড্‌ভস্মান্তনিষ্ঠেষু প্রাকৃত নায়কেষু অতি নশ্বরেষু রসো ন ভবতি।" (অলঙ্কার কৌস্তুভ॥ ৫/৭২ এর টীকা॥)

অর্থাৎ, কৃমি প্রভৃতি ঘৃণ্য কীটগর্ভ অতি নশ্বর প্রাকৃত নায়ককে কেন্দ্র করে অমৃতনিষ্যন্দী লোকোত্তর আনন্দস্বরূপ রস কখনই গড়ে উঠতে পারে না, সে কারণেই রসপ্রচারকগণ ভ্রান্ত। এই একই বক্তব্য বৈষ্ণব আলঙ্কারিক শ্রীজীব গোস্বামীরও :

"তস্মাদ্ লৌকিকস্য এব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্।
তজ্জনকত্বে চ সর্বত্র বীভৎসজনকত্বমেব সিধ্যতি।"
(প্রীতিসন্দর্ভ, পৃ. ৫৮৩)

কাব্যরসতত্ত্বে নবরসের বাইরে প্রেয়ঃ ও বৎসল রস দু'টির উল্লেখ দু' একটি ক্ষেত্রে পাওয়া গেলেও ভক্তিরসের কথা কোথাও মেলে না, অথচ এই ভক্তি-রসই গৌড়ীয় রসতত্ত্বের প্রাণ। শুধু তাই নয়, গৌড়ীয় রসতত্ত্বে এই ভক্তিরসই একমাত্র রস, শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর তথা শৃঙ্গার এই ভক্তিরসেরই পঞ্চবিধ ধারা। এই ভক্তিরসকে কেন্দ্র করেই তার অসংখ্য বৈচিত্রী, সীমাহীন

ব্যাপ্তি, অতলান্ত গভীরতা গৌড়ীয় রসতত্ত্বকে এক সুবিশাল মহীরুহে পরিণত করেছে ; অসংখ্য তার শাখা-প্রশাখা—যার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় গৌড়ীয় সাধকেরা খুঁজে পেয়েছেন নিত্য নূতন বৈচিত্র্যমণ্ডিত পরমতম আনন্দের অন্তহীন আস্বাদ, চিরন্তন লীলারসের অমৃতমাধুর্য, এবং পরমাত্মা পরমেশ্বরকে নয়—মাধুর্যবিলাসী ও পূর্ণতম-মাধুর্যরসের আকর পরম প্রেমময় ভগবানকে পরম প্রিয়ে পরিণত করার অধিকার। পূর্ণানন্দ ও পূর্ণরসের আস্বাদ এখানেই। শুধু কাব্যরসের পরিধির মধ্যেই নয়, সর্ববিধ অধ্যাত্মরসানন্দের জগতেও এই ভক্তিরসানন্দের তুলনা কোথাও নেই। গৌড়ীয় রসতত্ত্বে এই ভক্তিরসেরই অপর নাম প্রেমরস, আবার কখনও প্রেমভক্তিরস নামেও তা পরিচিত।

গৌড়ীয় কাব্য, দর্শন ও ধর্মের সঙ্গে গৌড়ীয় রসতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। রসতত্ত্বকে বাদ দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্য-দর্শনাদির কোন কিছুই গড়ে উঠতে পারে না। কাব্য-আলঙ্কারিকদের কাছে রস যেখানে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' কিংবা 'ব্রহ্মাস্বাদসচিব', বৈষ্ণবগণের কাছে রস সেখানে স্বয়ং ব্রহ্মাস্বাদ অপেক্ষাও কোটিগুণ বেশি আনন্দবহ, আর তার প্রমাণ বিধৃত হয়ে আছে গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণের রচনাতেই :

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্বোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥"

(ভ. র. সি. ॥১/১/৩৮ ॥)

অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধগুণীকৃত করলেও তা ভক্তিসুখ-সমুদ্রের পরমাণুতুল্যও হয় না।

গৌড়ীয় রসতত্ত্ব প্রচলিত কাব্যরসতত্ত্বের বিশেষ কোন শৃঙ্খলা বা বিধি মানে নি। তা সম্পূর্ণ নূতন, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। কাব্যরসতত্ত্বের ক্রম, বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য প্রভৃতি সব কিছুকেই অগ্রাহ্য করে একমাত্র প্রেমভক্তিরসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গৌড়ীয় রসতত্ত্বের জগৎ। রসের অসংখ্য বৈচিত্র্যকে সেখানে সংহত করে তোলা হয়েছে সেই ভক্তিরসের কেন্দ্রবিন্দুতে। গৌড়ীয় আলঙ্কারিকের ভাষায় :

"প্রেমরসে সর্বেরসা অন্তর্ভবন্তীত্যত্র মহীয়ানেব প্রপঞ্চঃ।"

(অলঙ্কারকৌস্তুভ : কবি-কর্ণপুর ॥ ৫/১২ ॥)

কিংবা উপমাগর্ভ ভাষায় :

"উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্নাখণ্ডরসত্বতঃ।
সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ॥" (ঐ উদ্ধৃত বচন।)

[প্রেম অখণ্ড রস বলে অন্যান্য সকল রসই সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি ও বিনাশের ন্যায় সেই প্রেমরসেই উদ্গত ও নিমজ্জিত হয়।]

কাব্যরসতত্ত্বে যে স্থায়ী বা প্রধান নবরসের উল্লেখ মেলে, তার প্রথম ও শেষটিকে অর্থাৎ শৃঙ্গার ও শান্তরসকে গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণ গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু পৃথক পৃথক রস হিসাবে নয়, মুখ্য ভক্তিরসেরই প্রকারভেদ হিসাবে। সে বিচারে শৃঙ্গার বা মধুর প্রভৃতি রস অঙ্গ, আর ভক্তি বা প্রেমরস হ'ল অঙ্গী। কবি-কর্ণপুরের উক্তি : "প্রেমাঙ্গী শৃঙ্গারোঽঙ্গমিতি বিশেষঃ।' (ঐ॥ ৫/১২॥)। অপরদিকে হাস্য-করুণাদি অন্যান্য যে সাতটি রস কাব্যরসতত্ত্বে মুখ্যরস হিসাবে পরিচিত, গৌড়ীয় রসতত্ত্বে সেগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে গৌণ-রস হিসাবে :

"হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥" (ভ. র. সি. ॥২/২৫/১১৬॥)

গৌড়ীয় রসতত্ত্বে এই সপ্তবিধ গৌণরসেরও প্রাণসত্তা প্রেমরসদ্বারাই গঠিত। অপরদিকে রুদ্রট, ভোজদেব প্রভৃতির উল্লিখিত প্রেয়ঃ বা সখ্যরস এবং বৎসলরস—এ দুটিকে অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ স্বীকার না করলেও গৌড়ীয় রসতত্ত্বে এ দুটিকে মুখ্য ভক্তিরসেরই বিবর্তিত শ্রেষ্ঠ দুটি রস-পর্যায় হিসাবে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়েছে।

সুতরাং, কাব্যরসতত্ত্বে যে ভক্তিরসের কোন স্থানই নেই, সেই ভক্তিরসকে সর্বস্ব করেই গড়ে উঠেছে গৌড়ীয় রসতত্ত্ব। কাব্যতত্ত্বে রসের মুখ্য-গৌণ বিভাজন নেই, রসমাত্রেই সেখানে মুখ্য বা স্থায়ী। গৌড়ীয় রসতত্ত্বে সপ্তবিধ গৌণরসের পরিচয় পেয়েছি, সেখানে মুখ্য ভক্তিরস হ'ল পঞ্চবিধ :

"মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্বমনুত্তমাঃ॥" (ভ. র. সি. ॥ ২/৫/১১৫॥)

[মুখ্যরস শান্ত, প্রীত (দাস্য), প্রেয়ান্ (সখ্য), বৎসল ও মধুরভেদে পঞ্চবিধ। এদের পূর্ব পূর্বটি ক্রমশঃ উত্তর উত্তরটি থেকে নিকৃষ্ট।]

গৌড়ীয় আলঙ্কারিক মধুসূদন সরস্বতী অবশ্য দাস্যরসকে বর্জন করে বিশুদ্ধ অর্থাৎ শান্ত, প্রেয়ঃ, বৎসল ও শৃঙ্গার—এই চতুর্বিধ মুখ্যরসের উল্লেখ করেছেন।[১৮] তবে গৌড়ীয় রসতত্ত্বে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অবলম্বনে পঞ্চবিধ মুখ্যরসই পুষ্টি লাভ করেছে।

কাব্যতত্ত্বের শৃঙ্গার ও শান্তরসের ক্রমটিকেও গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। কাব্যতত্ত্বে শৃঙ্গার হ'ল আদিরস এবং তা অতি সাধারণ, আর শান্তরস হ'ল অন্ত্যরস এবং সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট রস। কিন্তু গৌড়ীয় রসতত্ত্বে মুখ্য ভক্তিরসের ক্রমপর্যায়ে শান্তরসের স্থান সর্বনিম্নে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে শান্তরসের সাধনা তাই একান্তই অবহেলিত হয়েছে। অবশ্য কাব্যরসতত্ত্বের শান্তরস আর গৌড়ীয় শান্তরস সমার্থক নয়। কাব্যরসতত্ত্বে শান্তরসের পরিণতি মোক্ষ বা সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি। তাই পূর্বালোচনায় দেখেছি আচার্য অভিনব গুপ্ত কাব্যরসের বিচারকালে শান্তকে পরম পুরুষার্থ ও সর্বরসশিরোমণি বলে সিদ্ধান্ত প্রচার করেছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় রসতত্ত্বে শান্তরসের সাধনাও প্রেমভক্তি-রসেরই সাধনা এবং তা স্বসুখবাসনাহীন। মোক্ষাদি আত্মগত বাসনাও সেখানে থাকে না। কেননা, মুখ্যভক্তিরসের অন্যান্য রসসাধনার ন্যায় শান্তরসাত্মক প্রেমভক্তিও সেখানে নিরুপাধি। মোক্ষকে ধর্মার্থকামের সাধনা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হয়েছে বৈষ্ণব ভক্তিসাধনায় :

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥" (চৈতন্যচরিতামৃত ॥১/১/৫১ ॥)

শ্রীরূপ গোস্বামী তাই পিশাচীর সঙ্গে তুলনায় ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে প্রশ্ন তুলেছিলেন :

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ? ॥" (ভ. র. সি. ॥১/২/২২ ॥)

শান্তরস থেকে মধুররসের সর্বশেষ বিবর্তন অধিরূঢ় মহাভাব পর্যন্ত যে ভক্তি গৌড়ীয় রসতত্ত্ব ও সাধনার প্রাণবায়ু, সে ভক্তির প্রথম শর্তটি হ'ল :

---

১৮. দ্রঃ বর্তমান আলোচনার পরবর্তী অংশে উদ্ধৃত "বিশুদ্ধো বৎসলঃ প্রেয়ান্··· ॥" ইত্যাদি ভক্তিরসায়ন ॥ ২/৩৫-৩৬ ॥ শ্লোকদ্বয়।

"সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।" (ভ.র.সি. ॥ ১/২/১২ ॥) এ কারণেই গৌড়ীয় সাধকের কাছে—"প্রীতিরেবাত্র···সিদ্ধের্মোক্ষাদ্‌গরীয়সী।" (প্রীতিসন্দর্ভ)। সুতরাং স্বসুখবাসনা গৌড়ীয় শান্তরসের সাধনায় নেই। তথাপি এর স্থান গৌড়ীয় রসতত্ত্বে যে সর্বনিম্নে তার মূল কারণ, শান্তরসের সাধনা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য সাধনা,—'তস্যৈবাহম্' অর্থাৎ 'আমি তাঁর' এই তদীয়তাভাবের সাধনা; ফলে, ঈশ্বর এখানে তাঁর অলৌকিক ঐশী-গুণসত্তা পরিত্যাগ করে সাধকের বশীভূত বা তার প্রিয়তম হতে পারেন না। এ সাধনায় সাধক ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বকে বিস্মৃত হতে পারেন না বলেই তাঁর প্রতি মমত্ববোধও গভীর হতে পারে না এবং প্রেমের যথাযথ বিকাশও ঘটতে পারে না। গৌড়ীয় মতে শান্তরসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীরূপ গোস্বামী লিখেছেন ঃ

"মানসে নির্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে।

··· ··· ···

প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতা-গন্ধবর্জিতা।

পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তী-রতির্মতা॥"

(ভ. র. সি. ॥ ২/৫/১৬, ১৮ ॥)

[মনে যে নির্বিকল্পতা, তাকে 'শম্' বলা হয়।···প্রায়ই শমপ্রধান ব্যক্তি-দের পরমাত্মবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধবর্জিত সর্বাশ্রয়স্বরূপে যে শুদ্ধা রতি জন্মে, তাকে 'শান্তি' বলে।]

শান্তরসে ভগবানের প্রতি যে নিষ্ঠা, তা মমত্বগত ভক্তিনিষ্ঠা নয়। ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সে নিষ্ঠাকে বলেছেন বুদ্ধিগত নিষ্ঠা—"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ।" (১১/১৯/৩৬)। এ কারণেই গৌড়ীয় রসতত্ত্বে শান্তভক্তি-রসের স্থান সর্বনিম্নে। গৌড়ীয় ভক্তিরসের সর্বশ্রেষ্ঠ যে ব্রজভক্তিরস, তার সীমানায় এর বিশেষ কোন স্থান নেই। ভাগবতে তাই শান্ত ভক্তিরসের অসারতা প্রতিপাদন করে শান্তরসের সাধক উদ্ধবকে দেখা যায় ব্রজভক্তিরসের অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে একান্ত প্রার্থী হয়ে গোপিবৃন্দের চরণ বন্দনা করতে॥ (দ্রঃ ॥১০/৪৭/৬১, ৬৩ ॥)

অপরদিকে, গৌড়ীয় রসশাস্ত্রে শৃঙ্গার হ'ল অন্য বা সর্বশ্রেষ্ঠ রস।

গৌড়ীয় রসতত্ত্বে অন্যান্য সকলরসের আস্বাদই শৃঙ্গার বা মধুর রসধারাকে পুষ্ট করে তোলে। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় :

"পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥

(চৈ. চ.॥ ২/৮/৬৬-৬৭॥)

বৈষ্ণব সাধনায় শান্তরসের তদীয়তাবোধের সাধনা ক্রমবিবর্তনের পথে মধুর রসে "মমৈবাসৌ" অর্থাৎ "তিনি আমার' এই একান্ত মদীয়তাবোধের সাধনায় পরিণতি লাভ করে। ঈশ্বর এখানে সকল ঐশী চেতনাবিমুক্ত পরিপূর্ণ মাধুর্যরসে পরমতম কান্তে পরিণত। সকল বাধার অপসারণে মমত্ববোধের চরম বিকাশ এখানে। আর এ বিকাশের চরমরূপ যাঁর মধ্যে, তিনিই কান্তাশিরোমণি পরম প্রেমরসময়ী সাধিকাশ্রেষ্ঠা রাধা। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ রাধা-তাৎপর্যালোচনায় লিখেছিলেন :

"যে গুপ্ত স্ব-ধামে শ্রীকৃষ্ণ শুধু একজনের, যতক্ষণ ঠিক সে স্থানে না যাওয়া যায়, ততক্ষণ 'তুমি আমার' একথা বলা চলে, কিন্তু 'শুধু আমারই' একথা বলা চলে না। সেই স্ব-ভাবের নামই রাধাভাব। যে গোপী সেই স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত সে-ই রাধা।"

(সাহিত্য-চিন্তা, পৃ. ১৮)

পঞ্চবিধ রসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মধুররসেরও ক্রমবিবর্তনের সর্বশেষ ধাপ অধিরূঢ় মহাভাবের পদে একমাত্র এই শ্রীরাধাই প্রতিষ্ঠিতা। এই শ্রীরাধার প্রেম-সাধনাই প্রেমভক্তিরসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিবর্তন, তাই শ্রীরাধাকে অবলম্বন করেই গৌড়ীয় রসতত্ত্বের পরমস্বরূপের বিকাশ। গৌড়ীয় রসের কথা বলতে গিয়ে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাই মধুর রসকে পৃথক শ্লোকে উল্লেখ করে তার শ্রেষ্ঠ মর্যাদাকে তুলে ধরেছেন :

"বিশুদ্ধো বৎসলঃ প্রেয়ানিতি ভক্তিরসাস্ত্রয়ঃ।
রসান্তরামিশ্রিতাস্তে ভবন্তি পরিপুষ্কলাঃ॥

শৃঙ্গারো মিশ্রিতত্বেঽপি সর্বেভ্যো বলবত্তরঃ।
তীব্র-তীব্রতরত্বং তু রতেস্তত্রৈব বীক্ষ্যতে ॥"

(ভক্তিরসায়ন ॥ ২/৩৫-৩৬ ॥)

কাব্যরসশাস্ত্রে আলঙ্কারিক ভোজদেবও বৎসল-সহ তাঁর উল্লিখিত দশ-রসের মধ্যে শৃঙ্গারকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র রস বলে প্রচার করেছিলেন :

"শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতরৌদ্রহাস্য-
বীভৎসবৎসলভয়ানকশান্তনাম্নঃ।
আম্নাসিষুর্দশ রসান্ সুধিয়ো, বয়ং তু
শৃঙ্গারমেব রসনাদ্ রসমামনামঃ ॥"

(Bhoja's Śṛṅgāra Prakāśa, By V. Raghavan, p. 513
Karnataka Publishing House, Bombay/1940)

এ কারণে গৌড়ীয় রসতত্ত্বের মত-সাদৃশ্য ভোজদেবে অবশ্যই আছে, কিন্তু তা অতি ক্ষীণ। কেননা, ভোজদেবের শৃঙ্গার রসের সঙ্গে ভক্তির কোন যোগ নেই, তা লৌকিক কামবাসনা বা প্রাকৃত রতিযুক্ত, যা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাসনার নামান্তর। বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে এ জাতীয় শৃঙ্গার 'কাম' আখ্যায় নিন্দিত হয়েছে :

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম ॥" (চৈ. চ ॥ ১/৪/১৪১ ॥)

লৌকিক জগতে গৌড়ীয় দর্শন-নির্ধারিত প্রেমের অস্তিত্ব একান্তই দুর্লভ। তাই কাব্যজগতে প্রচারিত শৃঙ্গাররস আর গৌড়ীয় রসতত্ত্বের শৃঙ্গার বা মধুর রস সমরস নয়, একটি আত্মেন্দ্রিয় বাসনা-বিজড়িত, অন্যটি কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাসনায় সম্পূর্ণ নিরুপাধি ও অলৌকিক, কারণ :

"পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম যা বৃত্তিস্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ।" (পরমার্থসন্দর্ভ : শ্রীজীব গোস্বামী।)

অর্থাৎ, পরমসারভূত স্বরূপশক্তিরও সারভূতা যে হ্লাদিনীবৃত্তি, তার সারভূত বৃত্তিবিশেষই ভক্তি। স্বরূপশক্তি হ'ল ঈশ্বরের নিজের শক্তি, তার সারভূতা

হ্লাদিনীর সার ভক্তিও তাই অলৌকিক। তাই ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছেন :

"ভক্তিরূপায়াস্তচ্ছক্তের্জীবেঽভিব্যক্তৌ ভগবানেব কারণম্।"

(॥ ১৪৪ ॥ পৃ. ২০৯/ক. বি.—১৯৫২)

অর্থাৎ, শ্রীভগবানের শক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি জীবে অভিব্যক্ত হওয়ার ফলেই ভক্তির উদ্ভব। সুতরাং শ্রীভগবানই তা রূপায়িত করেন। 'নারদভক্তিসূত্রে'র ভাষাতেও ভক্তি তাই অমৃতস্বরূপ বা দিব্য—"অমৃতস্বরূপা চ।" (॥ ১/৩ ॥)। সুতরাং আলঙ্কারিক ভোজদেব একমাত্র রস হিসাবে শৃঙ্গাররসের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করলেও গৌড়ীয় রসতত্ত্বের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নেই। শৃঙ্গাররসের গৌরবের হেতু সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ তাঁদের রসশাস্ত্রে ভক্তির উল্লেখ যে একেবারে করেননি, তা নয়। কিন্তু কোন আলঙ্কারিকই ভক্তিকে রস হিসাবে স্বীকার করেননি। প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী স্বয়ং পূর্বপক্ষের আলঙ্কারিকগণের ভক্তির রসত্ববিরোধী মতের জবাবে লিখেছিলেন :

"যৎ তু প্রাকৃতরসিকৈঃ রসসামগ্রী-বিরহাদ্ ভক্তৌ রসত্বং নেষ্টং তৎ খলু প্রাকৃতদেবাদিবিষয়মেব সম্ভবেৎ।"

অর্থাৎ, রসসামগ্রীর অভাবহেতু ভক্তির রসত্ব সম্ভব নয়, প্রাকৃতকাব্যরসবিদ্-গণের এ বক্তব্য একমাত্র প্রাকৃতদেবাদি বিষয়েই প্রযোজ্য। অর্থাৎ শ্রীজীব গোস্বামীর বক্তব্য—আলঙ্কারিকগণের এরূপ সিদ্ধান্ত পরম ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে প্রযোজ্য নয়, কারণ পরম ভগবান একান্ত রসময়, সুতরাং তাঁর প্রতি ভক্তির আস্বাদও পরম রসময়। অবশ্য আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট ভক্তিমূল দেবাদিবিষয়ক রতিকে ব্যভিচারীব্যঞ্জিত ভাব বলে গণ্য করেছেন :

"রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তঃ ··· ··· ॥" (কাব্যপ্রকাশ ॥ ৪/৪৮* ॥)

এ অর্থে এ রতি ব্যভিচারী ভাবও নয়, কারণ মম্মটপ্রদত্ত তেত্রিশটি ভাবের মধ্যে এর স্থান নেই। উক্ত সূত্রের টীকায় ভট্টবামন সূত্রার্থ নিরূপণে এই দেবাদিবিষয়ক রতিকে বলেছেন অপুষ্টরতি ও অপ্রাপ্ত রসাবস্থা।[১৯] কিন্তু

১৯. "তেন দেবাদিবিষয়া সর্বপ্রকারা কান্তাদিবিষয়াপি, অপুষ্টা রতিঃ, হাসাদয়শ্চ, অপ্রাপ্তরসাবস্থা,···।" (কাব্যপ্রকাশ ॥ ৪/৪৮ ॥-সূত্রের বালবোধিনী টীকা, পৃ. ১১৮.)

গৌড়ীয় আলঙ্কারিক শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী শ্রীজীবের প্রীতিসন্দর্ভের মতই যুক্তির অবতারণা করে মম্মটসূত্রের প্রতিবাদ করেছেন :

"রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথোর্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তো রসো নেতি যদুক্তং রসকোবিদৈঃ॥
দেবাস্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ।
তদ্‌যোজ্যং, পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি॥"

(ভক্তিরসায়ন ॥ ২/৭৫-৭৬ ॥)

[দেবাদিবিষয়ক রতি রস নয়, ব্যঞ্জিত ব্যভিচারী ভাব,—রসকোবিদ্‌গণের এ উক্তি দেবান্তরসমূহ বিষয়ে প্রযোজ্য, কিন্তু পরমাত্মা সম্বন্ধে নয়, কারণ তিনি পরমানন্দের নিত্য প্রকাশক।]

অর্থাৎ, শ্রীপাদ সরস্বতীর বক্তব্য : পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাবিষয়ক যে রতি ভক্তিতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে, তা শুধু রস নয়—সর্বশ্রেষ্ঠ রস, যেহেতু অনন্ত মাধুর্যমণ্ডিত ভগবান পূর্ণ রসময় বলে রসের পরমতম যা, সেই প্রেমরসই বিতরণ করেন প্রেমভক্তিরসের সাধন অধিকারীকে। এদিক থেকে ভরতাদি অন্যান্য আলঙ্কারিকগণের প্রতিপাদিত রসসমূহই বরং গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণের চোখে ব্যভিচারী। সে কারণেই গৌড়ীয় শাস্ত্রে গৌণরসের উদ্ভব হতে দেখেছি। তাছাড়া, ভক্তিরসসর্বস্ব গৌড়ীয় রসশাস্ত্র গড়ে ওঠার পিছনে ভক্ত আলঙ্কারিকগণের প্রত্যক্ষীকৃত ভক্তিবিভোর শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যোন্মত্ত জীবন-লীলাই এ বিষয়ে বড় দৃষ্টান্ত।

কাব্যরসবিদ্‌গণের মধ্যে একমাত্র জগন্নাথ পণ্ডিতরাজই মম্মট প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের সমালোচনা করে ভক্তিকে পরম রস হিসাবে স্বীকৃতিদানের চেষ্টা করেছেন। 'রসগঙ্গাধরে' রত্যাদি নব-রসের আলোচনাশেষে তিনি লিখেছেন :

"অথ কথমেত এব রসাঃ, ভগবদালম্বনস্য রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য হর্ষাদিভিঃ পরিপোষিতস্য ভাগবতাদি পুরাণ-শ্রবণসময়ে ভগবদ্ভক্তৈরনুভূয়মানস্য ভক্তিরসস্য দূরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদনুরাগরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেঽন্তর্ভাবমর্হতি অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ।" (রসগঙ্গাধর/প্রথমমাননম্, পৃ. ১২১)

[এই ন'টি মাত্র রস কি করে হতে পারে? কারণ ভাগবত প্রভৃতি

পুরাণশ্রবণকালে ভগবানরূপ আলম্বনযুক্ত, রোমাঞ্চ অশ্রুপাত প্রভৃতির দ্বারা অনুভাবিত, হর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা পরিপোষিত, ভগবদ্ভক্তের দ্বারা অনুভূয়মান ভক্তিরসকে কোনক্রমে অস্বীকার করা যেতে পারে না। ভগবদ্বিষয়ক অনুরাগরূপ ভক্তি এস্থলে স্থায়িভাব। এই ভক্তিরস শান্তরসেও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, কারণ অনুরাগ বৈরাগ্যের বিরোধী।]

পূর্ববর্তী কাব্যরসবিদ্‌গণের প্রতি সমালোচনার মনোভাবটি এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভক্তি সম্বন্ধে পূর্বাচার্যগণের মতাদর্শের বিরুদ্ধে জগন্নাথ স্পষ্ট ভাষায় আপনার স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করে বলেছেন—ভক্তি হ'ল স্থায়িভাব এবং ভক্তি-রসকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আর্যঋষি-উক্ত মতাদর্শের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করে স্বকৃত মতের প্রচারে তিনি সাহসীও হতে পারেননি। তাই পরবর্তী অংশে ঋষি-উক্তিকেই ধ্রুব জ্ঞান করে ভরতমুনির আনুগত্য স্বীকার করেছেন এবং ভক্তিরস সম্পর্কে আপনার স্বতন্ত্র মতকে অধিকার ভঙ্গ বলে ইঙ্গিত করে পরিশেষে ভরতমুনির আদর্শকেই তুলে ধরে বলেছেন :

"রসানাং নবত্বগণনা চ মুনিবচননিয়ন্ত্রিতা ভজ্যেত, ইতি যথা শাস্ত্রমেব জ্যায়ঃ।" (ঐ/ঐ)

অপরদিকে, প্রতীচ্য রসকোবিদ্‌গণও ভক্তিভাবকে পবিত্র ও মধুরতম আনন্দবিধায়ক হিসাবে এবং সে কারণে বিশিষ্ট কাব্যরসকারক বলে উপলব্ধি করেছেন। তাঁরাও দেখেছেন—ভক্তিভাবাপ্লুত মন প্রকৃত সৌন্দর্য ও মাধুর্য-রসে পরিপূর্ণ বিভোর হয়ে ওঠে। কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রখ্যাত সমালোচক নিউম্যানের (John Henry Newman, 1801—1890) উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

".....revealed religion should be especially poetical —and it is so in fact. While its disclosures have an originality in them to engage the intellect, they have a beauty to satisfy the moral nature. It presents us with those ideal forms of excellence in which a poetical mind delights, and with which all

grace and harmony are associated. It brings us into a new world—a world of overpowering interest, of the sublimest views, and the tenderest and purest feelings." (E. C. E. 19th Century/Poetry with reference to Aristotle's Poetics, p. 212)

কিন্তু কাব্যাদিতে এ তত্ত্ব উপলব্ধির বিশেষ অনুস্থিতি চোখে পড়ে না। সেক্ষেত্রে গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণ কিন্তু প্রেমভক্তিরসের পরম-পুরুষার্থতা প্রতিষ্ঠায় এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হননি। রসশাস্ত্রের সার্দ্ধসহস্র বৎসরকালের সংস্কার ও ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে তাঁরা প্রেমভক্তিরসসমুদ্রের অতল গভীরে ঝাঁপ দিয়েছেন এবং বিরহসাধনার মধ্য দিয়েই সেই প্রেমভক্তি-শতদলের একটির পর একটি দলের উন্মোচনে প্রত্যক্ষ-লোকের সীমাবদ্ধ খণ্ডিত মিলনের গণ্ডি অতিক্রম করে, অপ্রত্যক্ষ হৃদয়জগতে অনুভূতিলোকের চিরন্তন মিলনের মাধ্যমে আস্বাদ্য প্রেমময়ের অনন্তরসমাধুর্যের নিত্য আস্বাদের অধিকার লাভ করেছেন। এ কারণেই ভক্তিরসের ক্রমপর্যায়ে মধুর হ'ল এঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তিরস। তাই আলঙ্কারিকগণ এর পৃথক নামকরণ করেছেন—উজ্জ্বলরস,—যাকে নিয়ে গৌড়ীয় রসতত্ত্বের ধারায় গড়ে উঠেছে পৃথক এক মহাগ্রন্থ—'উজ্জ্বলনীলমণি'।

বৈষ্ণব রসতত্ত্বে রসের আস্বাদক হলেন প্রেমভক্তির সাধক। এ সাধনা মুখ্যতঃ অনুভূতিময় ও রাগমার্গীয়,—বৈধীমার্গের আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক নয়। অন্তরে পরম প্রিয়রূপে ভগবানের নিত্য অনুভূতির অধিকারীই প্রকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধক। গৌড়ীয় সাহিত্যে শ্রীরাধা তাই সাধিকাশিরোমণি। পূজা-জপ-তপাদি বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি এই গৌরবপদে প্রতিষ্ঠিতা হননি। অপ্রাকৃত সর্বরতিপুষ্টা উজ্জ্বলা বা মধুরা রতির এবং তার ক্রমবিবর্তিত ও ক্রমবিবর্ধিত শেষ পরিণতি অধিরূঢ় মহাভাবের নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রীতিসর্বস্বতার অনুভূতির মধ্য দিয়েই শ্রীরাধিকা এই গৌরবপদে অধিষ্ঠিতা। এ অনুভূতিতে কান্ত-কান্তা বোধটুকু পর্যন্ত লোপ পায়। এ অবস্থা তাই গৌড়ীয় রসতত্ত্ব-বিদের ভাষায়—"সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী।" (দ্রঃ উজ্জ্বলনীলমণি ॥ স্থায়িভাব-প্রকরণ/২১৯ ॥)। গৌড়ীয় রসশাস্ত্রে এর পরিচিতি 'মাদন' নামে। কিন্তু এ

অবস্থায়ও নিত্য অবস্থান চলতে পারে না, তাতে চিত্তের একটা স্থায়ী জড়তা বা শূন্যতার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, কেননা সে অবস্থা অনেকখানি নির্বিকল্প, নির্বেদ বা সমাধিস্থ অবস্থার মতই। জানার বাসনা, রসাস্বাদের বাসনা কিংবা চিত্তের ব্যাকুলতা সে অবস্থায় লোপ পেতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন যেখানে নিত্য প্রেমভক্তির পথে ঈশ্বরসাধনার নির্দেশ দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, —প্রেমকে যেখানে সাধনের সঙ্গে সাধ্যেও পরিণত করেছেন এবং তাই স্বাভাবিক-ভাবেই যার দ্বারা ভক্তি বা প্রেমবাসনা মন্দীভূত অথবা দূরীভূত হয় তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন, সেখানে সেরূপ সাধনায় ভক্তিবিনাশকারী প্রত্যক্ষ মিলন তো বটেই, এমনকি নিবিড় ধ্যানে অন্তরের অনুভবজগতেও বিরামহীন ঈশ্বরমিলন বা ঈশ্বরমিলনের অনুভবে নিত্য অবস্থান কাম্য হতে পারে না। অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা না থাকলে ঈশ্বরের মাধুর্যরসাস্বাদের জন্য চিত্তের সুতীব্র ব্যাকুলতা বা ভক্তিরও বিনাশ ঘটে। এ কারণেই সাধনক্ষেত্রে বৈষ্ণবদর্শন সামীপ্য-সালোক্যাদি সকল প্রকার মুক্তি, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনে বর্ণিত সবিকল্প-নির্বিকল্প বা সজীব-নির্জীব সর্বপ্রকার সমাধির[২০] চিন্তাকেই পরিহার করেছেন। সমাধি মুক্তিরই সমগোত্রীয়, কেননা ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে বিচ্ছেদহীন মিলনের অনুভূতিই হল সমাধি।[২১] বৈষ্ণব সাধনক্ষেত্রে অদ্বৈতমিলনজাত মাদনাখ্য মহাভাবে[২২] নিত্য অবস্থানও সেরূপ সমাধিজাতীয়ই। তাই সে

২০. দ্রঃ পাতঞ্জলদর্শন ॥ সমাধিপাদ/৪৬, ৫১ ॥

২১. পাতঞ্জলদর্শনের আলোচনাকালে সমাধি-সম্পর্কে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বিশ্লেষণ স্মরণীয় :

> "After sufficient practice in dhyana the mind attains the power of making itself steady; at this stage it becomes one with its object and there is no change or repetition. There is no consciousness of subject, object or thinking, but the mind becomes steady and one with the object of thought. This is called *samadhi*." (A History of Indian Philosophy, Vol.-I, p. 272)

২২. "অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত প্রকার।
সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম তার ॥" (চৈ. চ. ॥ ২/২৩/৩৪ ॥)

অবস্থা বৈষ্ণব সাধকের একমাত্র কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না, যুগপৎ অপ্রাপ্তির বেদনাও তাঁদের একান্ত কাম্য যা রতি বা ভক্তির গাঢ়ত্ব সম্পাদক। বৈষ্ণব দর্শনে তাই সম্ভোগাত্মক মাদন অপেক্ষা মোহনাখ্য অর্থাৎ বিপ্রলম্ভাত্মক মহাভাবের গুরুত্বই সর্বাধিক। যুগপৎ বিরহমিলনের বা ভেদাভেদের অনুভূতি এ পর্যায়েই গভীর হয়ে ওঠে। গৌড়ীয় রসতত্ত্বে রসাস্বাদবাসনার কখনও অবসান ঘটে না, ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাই সেখানে চিরস্থায়ী যা আস্বাদ্য রস ও আস্বাদকের আস্বাদতৃষ্ণা উভয়েরই অশেষ বৃদ্ধি ঘটিয়ে লীলার নিত্যত্ব ও অসমোর্ধ্ব মাধুর্যের সৃষ্টি করে।

সম্ভোগাত্মক 'মাদন' মহাভাবে এই ব্যাকুলতা, রস ও আস্বাদের নিত্য সজীবতা থাকে না বলেই গৌড়ীয় রসতত্ত্বে বিপ্রলম্ভের এবং সে কারণেই মোহনাত্মক অধিরূঢ়-মহাভাবের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। সম্ভোগাত্মক মাদনও গৌড়ীয় রসতত্ত্বে পুষ্টিলাভ করে এই বিপ্রলম্ভের দ্বারাই—"স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগান্নতিকারকঃ।" (উ. নী. ॥ শৃঙ্গাররসপ্রকরণ/২ ॥)। সম্ভোগে সকল কিছুর প্রাপ্তি। যাঁরা মোক্ষলাভ করেন, তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে এই সম্ভোগাবস্থায়ই নিত্যকাল বিরাজ করেন। কেননা, ঈশ্বরের দেহ-আত্মায় লীন হয়ে যাওয়াই হ'ল মোক্ষ। মোক্ষপ্রাপ্ত সাধক তাই তখন উচ্চারণ করতে পারেন —'অহং ব্রহ্মাস্মি' কিংবা 'সোঽহম্'। এ অবস্থা অবিনাশী ঈশ্বরসম্ভোগাবস্থা। মধুর রসের সম্ভোগ-পর্যায়কে তাই মোক্ষভাবনারই একটা রূপ বললে অযৌক্তিক হয় না। গৌড়ীয় মতে মোক্ষবাসনা যেখানে 'কৈতবপ্রধান' সেখানে সম্ভোগের প্রাধান্য দূরে থাক, তা প্রেমভক্তির বিনাশকারী বলে পিশাচীবৎ বর্জিত হয়েছে যা 'ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা' ইত্যাদি শ্লোকে পূর্বেই দেখেছি। তাই গৌড়ীয় রসতত্ত্বে বিপ্রলম্ভকে তার আত্মা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

গৌড়ীয় রসতত্ত্বে সম্ভোগের নানা শ্রেণী নির্দেশ করা হলেও বিপ্রলম্ভই সেখানে অজস্র বৈচিত্র্যে সর্বাত্মক ব্যাপ্তিলাভ করেছে। গৌড়ীয় রসতত্ত্বে পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—এই চতুর্বিধ বিপ্রলম্ভ ধারার প্রতিটি আবার নানা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়ে বিপ্রলম্ভধারাটিকেই সুবিশাল ও সর্বব্যাপক করে তুলেছে। "সাহিত্যদর্পণে' আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ বিপ্রলম্ভের

যে শ্রেণীনির্দেশ করেছেন সেখানে প্রেমবৈচিত্ত্যের স্থান নেই। পূর্বরাগ, মান, ও প্রবাসের সঙ্গে চতুর্থ বিপ্রলম্ভের স্তর হিসাবে সেখানে করুণ-বিপ্রলম্ভের উল্লেখ করা হয়েছে। গৌড়ীয় রসতত্ত্বে সেটি প্রবাস-বিশেষ বলেই উল্লিখিত :

"বিপ্রলম্ভং পরং কেচিৎ করুণাভিধমূচিরে।
স প্রবাস বিশেষ ·· ··· ··· ॥"

(উ. নী. ॥ শৃঙ্গার-/১৮৪ ॥)

করুণ-বিপ্রলম্ভের পরিবর্তে গৌড়ীয় রসবিদ্‌গণ যে প্রেমবৈচিত্ত্যের উল্লেখ করেছেন, গৌড়ীয় রসতত্ত্বের বিপ্রলম্ভপ্রাণতার প্রমাণে সেটির মূল্য অসাধারণ। গৌড়ীয় রসতত্ত্বের সর্বস্তরেই বিরহ,—এমনকি মিলনকালেও। প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায় সেই মিলনকালের বিরহ। সুগভীর প্রণয়োৎকর্ষই এ বিরহের কারণ। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥" (ঐ ॥ ঐ/১৪৭ ॥)

অর্থাৎ প্রিয়-সন্নিকটে বা মিলনাবস্থায় থাকা সত্ত্বেও প্রেমের গভীর উৎকর্ষ বশতঃ ভাবী বিশ্লেষ-চিন্তাজনিত যে আর্তি, তারই নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। সুতরাং এ আর্তি গভীর বিরহবোধেই অন্তরকে সমাচ্ছন্ন করে। ফলে মিলনকালে এ আর্তিই সম্ভোগের ব্যাকুলতা বা অভাবহীনতার বোধকে দূর করে মোক্ষসম নির্বেদ সমাধিস্থ অবস্থার হাত থেকে সাধিকা-শিরোমণি রাধাকে পরিত্রাণ করে; মানসিক জড়তালাভের হাত থেকে বাঁচিয়ে তার রসাস্বাদবাসনার ব্যাকুলতাকে ফিরিয়ে আনে। এই সম্পূর্ণ নূতন প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়টি তাই গৌড়ীয় রসতত্ত্ব ও কাব্যদর্শনের এক অমূল্য মৌলিক সম্পদ।

তাহলেও চতুর্বিধ বিপ্রলম্ভ পর্যায়ের মধ্যে প্রবাসের গুরুত্বই গৌড়ীয় রসতত্ত্বে সর্বাপেক্ষা বেশি। প্রবাস পর্যায়েই গৌড়ীয় রসতত্ত্বের সমাপ্তি শ্রীকৃষ্ণের অনন্তপ্রবাসকালে শ্রীরাধার অশেষ বিরহ জাগরণের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। এ অবস্থায় রাধার প্রেমোৎকণ্ঠা, মিলনের জন্য ব্যাকুল তৃষ্ণা একদিকে যেমন ক্রমগভীর হয়ে ওঠে, অপরদিকে বিরহবেদনাজাত সুতীব্র আকর্ষণে অবিরত কৃষ্ণ-ধ্যানতন্ময়তায় শ্রীরাধার সমগ্র হৃদয় মন হয়ে ওঠে কৃষ্ণময়। সেই হৃদয়াভ্যন্তরেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের শাশ্বত মিলন, যাকে

পদাবলীতে 'ভাবসম্মিলন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই নিত্য বিরহের জন্যই রাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণের রসবৈচিত্র্য, সৌন্দর্য-মাধুর্য নিত্যই নূতন, প্রাপ্তির সঙ্কীর্ণতায় বৈচিত্র্যের অবসান সেখানে ঘটে না। গৌড়ীয় রসতত্ত্বে তাই ভগবান অনন্ত ঐশ্বর্য-শক্তিপূর্ণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নন, তিনি পরম প্রেমময়, মাধুর্যময়, লীলাময়। গৌড়ীয় রসতত্ত্বের সর্বাত্মক বিপ্রলম্ভ-চেতনা সাধকের অন্তরে সেই প্রেমময়ের নবনব মাধুর্য—প্রেম, আনন্দ ও রসই সঞ্চার করে দেয়। পরিপূর্ণভাবে জানার আনন্দহীনতা বৈচিত্র্যহীনতা প্রেমভক্তিকে সেখানে ম্লান করতে পারে না। পদাবলীতে সেই পরমরসের আস্বাদকারিণী শ্রীরাধাকে তাই নিত্য প্রেমাস্বাদ সত্ত্বেও বলতে শোনা যায়—

"তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।"
(বৈষ্ণব পদাবলী ॥ ৫/১৬ ॥)

কিংবা : "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু, তোমার পিরীতি॥" (ঐ ॥ ১০/৪ ॥)

এই অজ্ঞতাই শ্রীরাধাকে চিরন্তন সাধিকায় পরিণত করেছে। এ সাধনা থেকে রাধার মুক্তি নেই, তাই কৃষ্ণসম্বন্ধে রাধার ব্যাকুলতারও অবসান নেই। নিত্য আস্বাদনেও অনাস্বাদিত নব নব রসমাধুর্য তাকে বিস্ময়ানন্দে অভিভূত করে রাখে। অনন্তকালের মিলনবিরহ-লীলার আস্বাদনেও চিত্ত চির অতৃপ্তই থেকে যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে গৌড়ীয় দর্শনসিদ্ধান্ত শুনি :

এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে॥ (॥ ১/৪/১৩০ ॥)

কবিবল্লভের পদে বিরহাত্মা রাধার কণ্ঠে সে সিদ্ধান্তই একান্ত রসোজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে :

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥" (বৈ. প. ॥ ৫/২২ ॥)

মধুররসের অপূর্ব বিস্তার এখানে। সঙ্কীর্ণ সম্ভোগলালসার ঊর্ধ্বে এক প্রবল বিস্ময়, ব্যাকুল কৌতূহল, সুগভীর আনন্দ ও ধ্যানতন্ময়তায় পরম রসতাপ্রাপ্তি এখানে। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্…" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ॥ ৩/৮ ॥) বৈদিক ঋষির ঈশ্বরপ্রাপ্তির এ উক্তির মধ্যে সেই বিস্ময়, ব্যাকুলতা, সেই রস, আনন্দের সেই সুগভীর আস্বাদ নেই। অথচ শ্রীরাধার উক্তিটিতে প্রাপ্তি বা সম্ভোগের প্রসঙ্গ রয়েছে—"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ…।" তবু রাধা বিস্ময়বিমুগ্ধ, কারণ, রাধার প্রাপ্তির মধ্যেও নিত্য অপ্রাপ্তিই গুঞ্জরিত, সম্ভোগের মধ্যেই পূর্ণ বিপ্রলম্ভের পদচ্ছায়া। প্রেমবৈচিত্ত্যে দেখেছি—মিলন কালে ভাবী বিরহের আশঙ্কাই চিত্তকে বিরহার্ত করে তোলে। আর এখানে সমস্ত মিলনেই রয়েছে একটা চিরস্থায়ী বিরহ, তাই নিত্যকালের অপ্রাপ্তি-জনিত এ বেদনা। এই বেদনার অবিনাশী অনুভূতিই প্রেম। এই অনুভূতির আস্বাদেই বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ অধ্যাত্মপ্রেমের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন :

> "প্রেম এবং দুঃখ পরস্পরের চিরসাথী—যেন দুটি চোখের মত।" (ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, পৃ. ৯১. East and West in Religion গ্রন্থের নীরদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-কৃত অনুবাদ।)

তবে এ দুঃখকে অন্যান্য ধর্মসাধনায় প্রচলিত কৃচ্ছ্রসাধন বলে মনে করলে ভুল হবে। অন্যান্য ধর্মসাধনায় কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন রূপ যে দুঃখবরণ, তা কিন্তু নিরুপাধি নয়, তার পিছনে থাকে মুক্তিবাসনা অথবা পারত্রিক সুখলাভের

আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বৈষ্ণব সাধকের দুঃখবরণের পিছনে সুখের কোন মোহই নেই। দার্শনিকের ভাষাতেই বলি :

> "যেখানে প্রেমই জীবন নিয়ন্ত্রিত করে—সেখানে প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে প্রতি নিয়ত দানই জীবনে পরিণত হয়। দান থেকে আলাদা করে এ জীবনের অস্তিত্বই বোঝা যায় না।" (ঐ, পৃ. ৯৪)

এই জীবনেই প্রতিষ্ঠিতা গৌড়ীয় রসতত্ত্বের বাহিকা শ্রীরাধা, তার দুঃখ-বেদনা-অশ্রু নিত্য বিরহসঞ্জাত। কিন্তু সমকালেই তা অনন্ত রসাস্বাদ ও আনন্দানুভূতির বাহক। সুতরাং, অধ্যাত্মসাধনায় প্রচলিত দুঃখবাদের স্বরূপ থেকে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গৌড়ীয় রসতত্ত্ব তার সহস্রবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যেও দৃঢ় অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে আছে এই বিপ্রলম্ভের প্রতিই। এই বিপ্রলম্ভাত্মক মধুররসই গৌড়ীয় রসসিদ্ধান্তে ভক্তিরসসার, সমস্ত গৌরবের উৎসমূল। গৌড়ীয় দর্শনের তত্ত্বসমূহও এই ভক্তিরসকেই দার্শনিক ভিত্তিদান করে তাকে চিরস্থায়ী পরম গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে।

গৌড়ীয় রসতত্ত্ব তাই বিরহ বা বিপ্রলম্ভপ্রাণ রসতত্ত্ব। আর এ কারণেই গৌড়ীয় দর্শন ও রসতত্ত্বের ভাষ্য বৈষ্ণব সাহিত্যধারায় বৃন্দাবনধাম তথা শ্রীরাধার বাস্তব সাহচর্য পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের চিরকালীন প্রবাস যাত্রা, এ কারণেই বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে প্রচলিত কাব্যরসতত্ত্বের অনুসরণে নায়ক-নায়িকার মিলনে নয়, বিপ্রলম্ভঘন মাথুর ও ভাবসম্মিলন-পর্যায়ে। এই পরিসমাপ্তিই বিরহঘন গৌড়ীয় সাধনাদর্শটিকে ও গৌড়ীয় রসতত্ত্বের বিপ্রলম্ভপ্রাণতাকে নিরাবরণ প্রকাশ করেছে। আর আদ্যন্তবিস্তৃত এই বিপ্রলম্ভপ্রাণতাই কাব্যরসের প্রেক্ষাপটে গৌড়ীয় রসতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবের মূল উৎস।

॥ ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধা ॥

আর্য ভারতবর্ষ তার জন্মের সূচনাকাল থেকেই পরিচিতি লাভ করেছে ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার পীঠভূমি হিসাবে। ধর্ম ছিল প্রাচীন ভারতীয় জীবন-বৃক্ষের মূল শিকড়। কেবল অন্তরঙ্গ জীবনসাধনার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সমস্ত প্রকার বহিরঙ্গ ক্ষেত্রেরও প্রাণরস গৃহীত হয়েছে সেই ধর্মমূল থেকেই। ভারতবর্ষ সম্পর্কে সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববাসীর মুগ্ধতা ও কৌতূহল আকর্ষণের সব থেকে বড় কারণ সার্বিকক্ষেত্রে সঞ্চারিত তার এই অধ্যাত্মপ্রাণতা। প্রাচীনভারত সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে বিশ্ববিশ্রুত ভারততত্ত্ববিদ দার্শনিকের অনুভবেও সেই মূল সত্যটাই পর্যালোচিত হতে দেখি :

> "....religion was not only one interest by the side of many. It was the all absorbing interest, it embraced not only worship and prayer, but what we call philosophy, morality, law and government—all was pervaded by religion." (INDIA what can it teach us ? : Max Mueller, p. 96)

প্রাচীন ভারতবর্ষে এই ধর্মসাধনা ছিল প্রধানতঃ তিনটি ধারায় বিভক্ত—কর্ম, জ্ঞান ও যোগ। কিন্তু ভক্তিসাধনার বিকাশের পর ভক্তিবাদই ধর্ম-সোপানগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। কেননা ভক্তিপথ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের কঠোরতা ও সমস্তপ্রকার সাধনকৃচ্ছ্রতা থেকে মুক্ত সহজ আত্ম-নিবেদনের পথ, আর সে কারণেই তা সকলের পক্ষে প্রশস্ত। পরবর্তীকালের উপনিষদেও আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত শুনি :

> "তস্মাৎ সর্বেষামধিকারিণামনধিকারিণাং ভক্তিযোগ এব প্রশস্যতে।"
>
> (ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ ॥ ৮ম অধ্যায় ॥)

গীতার ভক্তিযোগকে আশ্রয় করে মূলতঃ গীতা-উত্তরকালে ভারতীয় ধর্মসাধনায় ভক্তিবাদের যথার্থ বিকাশসূচনা। গীতা ধর্মসাধনক্ষেত্রে কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির

সমন্বয়কারী হলেও[১] উপসংহারে কিন্তু ভক্তিকেই দান করেছে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব-মর্যাদা। সেখানে ভক্তিকে শুধু 'গুহ্যাৎ গুহ্যতর' বলে নির্দেশ করেই গীতা ক্ষান্ত হয়নি, পরের দু'টি শ্লোকে তাকে বর্ণনা করেছে 'সর্বগুহ্যতম' হিসাবে এবং তার পরবর্তী শ্লোকটিতে সেই সর্বগুহ্যতম ভক্তি-অর্জনের সহজতম পথের নির্দেশ দিতে গিয়ে উচ্চারণ করেছে - "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" (দ্রঃ ॥ ১৮/৬৫-৬৬ ॥)। সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে একমাত্র শরণাগতির মাধ্যমে একান্ত আত্মনিবেদনের নির্দেশদানে ভক্তির সর্বোচ্চ গৌরব-মহিমার প্রচারই গীতার আত্মিক বাণীতে পরিণত হয়েছে। তাই পরবর্তী-কালের ভক্তি-আচার্যগণের কাছে গীতা ভক্তিস্বর্গের প্রথম সোপানরূপেই শুধু নয়, ভক্তিধর্মের বেদস্বরূপেও একান্ত মর্যাদা পেয়েছে। কর্ম, জ্ঞান ও যোগ-সাধনা অপেক্ষা ভক্তিসাধনার গৌরবাধিক্য আরও স্পষ্টভাষায় ঘোষিত হয়েছে নারদভক্তিসূত্রে :

"সা (=ভক্তি) তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।" (॥ ২৫ ॥)

আসলে গীতার ভক্তিদর্শনই পরবর্তী সহস্রাব্দের অধিক কাল ধরে বিবর্তন লাভ করে পাণিনি ও শাণ্ডিল্যসূত্রে, নারদীয় ভক্তিসূত্রে, নারদ পঞ্চরাত্রে, তামিল আড়বার-সাহিত্য ও অন্যান্য দক্ষিণভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে, সর্বোপরি ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণসাহিত্যে যা ভক্তিযুগের বিকাশে গীতার মহিমাকে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

গীতা-পরবর্তী উল্লিখিত ভক্তিসাহিত্যের ব্যাপক ধারাটিকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ ধর্মসাধনার জগতে ভক্তিরসের জোয়ার প্রবাহ বয়ে নিয়ে আসে মূলতঃ বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এঁরা হলেন বাসুদেবক, নারায়ণীয়, পাঞ্চরাত্র, ভাগবত, সাত্বত, একান্তী বা একান্তিক ইত্যাদি। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাচীন বৈষ্ণবধর্মের যে ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়েছে,—এঁরাই হলেন সেই প্রাচীন বৈষ্ণবধর্মের উপাসক। তামিল আড়বার সাধকগণকেও এই প্রাচীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গুলির একটি শাখা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এঁদের ভক্তিসাধনার পাশাপাশি গীতার ভক্তিদর্শন বিবর্তিত হয়ে পুরাণাদি ধর্মসাহিত্যে গড়ে ওঠা নানা কাহিনীর আশ্রয়ে রসপরিণতি লাভে ভক্তিরসের প্লাবন সৃষ্টি

১. স্মরণীয় : "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" (গীতা ॥ ৪/১১ ॥)

করে। বিভিন্ন পুরাণ কাহিনীর মাধ্যমে পুষ্ট হয়ে ভক্তিরসের মধুরতম পূর্ণাঙ্গ জগৎ গড়ে ওঠে ভাগবত পুরাণে। গীতা-উপদিষ্ট ভক্তিবাদ ভাগবতের কান্তা-প্রেমে রসরূপের পরিপূর্ণতা পায়। এই ভাগবতকে কেন্দ্র করে যে নব্য ভাগবত-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, সাত্বত-পাঞ্চরাত্রাদি প্রাচীন বৈষ্ণবসম্প্রদায়গুলি সেই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। এই আন্দোলনে মুখ্য নেতৃত্ব দান করে শ্রী, ব্রহ্ম, সনক ও রুদ্রপন্থী চতুঃসম্প্রদায়। এঁদের উদ্ভব একদিকে ভাগবত-পূর্ববর্তীকালের পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে,[২] অপরদিকে মুখ্যভাবে ভাগবতকে আশ্রয় করে। অবশ্য ভাগবতও বহুলভাবে পঞ্চরাত্র-ধর্মমত দ্বারা পুষ্ট। পরবর্তী-কালের ভক্তি আন্দোলনে ভাগবতের ভূমিকা সর্বব্যাপক হলেও সে আন্দোলনে পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তের মূল অবদানকে তাই অস্বীকার করা যায় না। শুধু ভাগবতই নয়, ভক্তিরস বিবর্তনের অন্যতম উৎস শাণ্ডিল্যসূত্র ও নারদভক্তিসূত্র পঞ্চরাত্রমতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। এই বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়কে আশ্রয় করেই ভারতবর্ষের ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে আচার্যের যুগ।

খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে প্রাক্-চৈতন্যযুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে ভাগবত ও তদাশ্রয়ী নব্যভাগবতধর্ম-প্রচারক্ষেত্রে উক্ত চারটি সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে বৈষ্ণবধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তারলাভ করে। কিন্তু ভক্তিরসের বিবর্তন তার পূর্ণ মহিমার সন্ধান পেয়েছে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মসুখ ও মুক্তিবাসনাহীন কেবল রাগাত্মিক প্রেমভক্তিসাধনাকে আশ্রয় করে বিবর্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সাধনাদর্শে,—যা ক্রমে অজস্র বৈষ্ণব-দর্শন ও অলঙ্কার গ্রন্থ, চৈতন্যচরিত এবং সংস্কৃত, বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় রচিত কাব্য-নাটক-পদাবলী প্রভৃতিতে বিভক্ত সুবিপুল বৈষ্ণবসাহিত্যকে আশ্রয় করে সমগ্র ভারতবর্ষে অতীন্দ্রিয় প্রেমভক্তিরসের প্লাবন সৃষ্টি করে। ফলে ভক্তিসাধনা বা বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্রে শ্রী-ব্রহ্মাদি চতুঃসম্প্রদায়ের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং ভক্তিভাবের সর্বোত্তম আদর্শের সম্প্রসারণে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ই একমাত্র প্রাধান্য লাভ করে। এ অবস্থায় অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি কোথাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, আবার কোথাও গৌড়ীয়

২. দ্রঃ ভারতীয় সাধনার ধারা : মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, পৃ. ১.

ধর্মে দীক্ষা নিয়ে গৌড়ীয়মতের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেয়। আসলে ভাগবতে ব্রজলীলাকাহিনীকে আশ্রয় করে গোপীদের কৃষ্ণপ্রেমভাবনায় ভক্তি-রসের যে মহত্তর রূপের বিকাশ, বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায় সেই ব্রজলীলাকাহিনীকে তাঁদের অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে খুব একটা প্রাধান্য দেননি। ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁরা ভাগবতের ব্রজলীলাকাহিনী অংশে প্রকাশিত সগুণ ও পূর্ণমাধুর্যরসময় ঈশ্বরসত্তা অপেক্ষা ব্রজলীলাকাহিনী ব্যতীত অন্যান্য অংশে প্রকাশিত একান্ত ঐশ্বর্যময় নির্গুণ ঈশ্বরসত্তাকেই বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। দ্বৈতবাদী ভক্তিসাধনার প্রতি তাঁরা সমর্থন জানালেও সাধনার পরিণতিতে সেই নির্গুণ ঐশ্বর্যময় ঈশ্বরকেই সাধ্য হিসাবে গ্রহণ করে অদ্বয় মুক্তিবাসনাকে সর্বস্ব করে তুলেছেন। তাঁদের মতাদর্শ গঠনে ভাগবত ব্যতীত যে পঞ্চরাত্রমত বিশেষ সহায়তা করেছে, 'নারদপঞ্চরাত্র' সেই পঞ্চরাত্রধর্মের 'রাত্র'-শব্দে জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করে পঞ্চরাত্রমতের মুখ্যস্বরূপ হিসাবে [illegible] চপ্রকার জ্ঞান এবং সেগুলির অন্যতম হিসাবে [illegible] নগুণ-ভক্তিপ্রদ জ্ঞানে'র উল্লেখ করেন।[৩] এ হিসাবে বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের সাধনাকে কেবল ভক্তির সাধনা না বলে ভক্তিপ্রদ জ্ঞানের সাধনা বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভাগবতের রাগময় গোপীপ্রেমাদর্শকে শুধু যে তাঁরা গ্রহণ করেননি তাই নয়, সে প্রেমাদর্শের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত ঘৃণার মনোভাব পোষণ করেন।[৪] ভক্তিসাধনায় এঁরা

৩. "রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
জ্ঞানং পরমতত্ত্বঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাপহং।
ততো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শম্ভুঃ সংপ্রাপ কৃষ্ণবক্ত্রতঃ॥
জ্ঞানং দ্বিতীয়ং পরমং মুমুক্ষূণাঞ্চ বাঞ্ছিতং।
পরং মুক্তিপ্রদং শুদ্ধং যতো লীনং হরেঃ পদে॥"
(নারদপঞ্চরাত্র ॥ ১/১/৪৪-৪৬ ॥ এশিয়াটিক সোসাইটি / ১৮৬৫ সং.)

৪. Sri Krishna with Sri Radhika is not worshipped in our Sampradaya.···Radhika and Gopis are Apsara women."—মুখ্যতঃ ঐশ্বর্যময় চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির উপাসক ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীমধ্বের জন্মস্থান উডুপীর কাহুরুমঠের অধ্যক্ষ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শ্রীবিদ্যাসমুদ্রতীর্থের অভিমত সম্বলিত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদকে ২২. ৬. ১৯৫২ তারিখে লেখা একটি পত্রের অংশবিশেষ। (দ্রঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন : ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ। ৫ম খণ্ড/পৃ. ৩৭৫৫ ও ৩৭৬২)

মুখ্যতঃ বৈধীমার্গের সাধক, তাই শাস্ত্রনির্দিষ্ট নানাবিধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধ পালনের উপরই এঁরা তাঁদের সাধনকৃত্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে ভাগবত-আশ্রয়ী হলেও বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের সাধনাদর্শে ভাগবতের লীলারসভিত্তিক রাগময় প্রেমভক্তির রূপটি কোনরূপ বিবর্তন লাভ করেনি।

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ভাগবতরূপ বদ্ধ জলাশয় থেকে ভক্তির সেই পরম রসরূপটিকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে তাকে পূর্ণপ্রবাহ দান করলেন গৌড়ীয় সাধনক্ষেত্রে। ভক্তিসাধনক্ষেত্রে ব্রজলীলাকাহিনীকে একমাত্র অবলম্বন করে ভক্তির ক্রমনির্দেশে সেই প্রেমভক্তিকেই শ্রেষ্ঠরূপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে :

"সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥ ১/২/১ ॥)

["নির্গুণা ভক্তি জীবহৃদয়ে স্ফুরিত হইবার পর চিত্তের অমার্জিত, মার্জিত ও পরিমার্জিত অবস্থাত্রয় ভেদে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম-ভক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।"—অনুবাদ : কানুপ্রিয় গোস্বামী।]

এই পরিমার্জিত অবস্থার ভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাধনার প্রাণ। অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা ভক্তিকে পরিণত করেছে একান্ত রাগময় প্রেমে, যার সর্বোচ্চরূপ মধুররসের কান্তাপ্রেম। এ প্রেম সর্বস্তরেই আপনার সুখ-বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রেমের পাত্রের সুখসম্পাদনে সদা উন্মুখ। একদিকে এই অতীন্দ্রিয় অহৈতুকী প্রেমসাধনার গভীরতা, অপরদিকে জাতি-ভেদহীন উদারতাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে শুধু বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের প্রেক্ষা-পটেই নয়, ভারতবর্ষের সমগ্র ধর্মসাধনার ইতিহাসেই দিয়েছে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও বিস্তৃতি। বাস্তবিক এই নব-প্রেমধর্মের বন্যায় সেদিন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই প্লাবিত হয়ে তার প্রসারকে সর্বব্যাপী করে তুলেছিল,—যার প্রভাবে সাহিত্য, সমাজ, দর্শন, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি সকল চেতনার মধ্যেই পূর্বযুগীয় সঙ্কীর্ণতার অবসান ঘটেছিল। জাতি-কুল-শিক্ষা নির্বিশেষে গৌড়ীয় ধর্ম সেদিন নিখিল-মানবকে দীক্ষিত করেছিল এই নতুন প্রেমভক্তির উন্মাদনায়। এমন কি ভক্তিবিতরণক্ষেত্রে তাঁরা পাপ-পুণ্যের অধিকার-সম্পর্কিত ভেদজ্ঞানও

সম্পূর্ণ পরিহার করে প্রেমসাধক-ভক্তকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেছেন। শুধু তাই নয়, বরং পাপীর প্রতি সমধিক মমত্ব প্রদর্শন করে বিশেষভাবে তাদের প্রেমভক্তিমন্ত্রে দীক্ষাদানের নির্দেশ শিষ্যগণের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবকে দিতে দেখা যায় বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে।[৫] বলা চলে, ভাগবতের ভক্তি-আদর্শই এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে গভীরতর বিবর্তন লাভ করেছে গৌড়ীয় সাধনাদর্শে।[৬]

শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত গৌড়ীয় প্রেমভক্তি-আদর্শের উচ্চতম মহিমালোকে স্থাপিত হয়েছে মহাভাব, যার সমতুল আদর্শ শ্রীচৈতন্যের পূর্বে সমগ্র বিশ্বের ধর্মসাধনার ইতিহাসে কোথাও মেলে না, সুতরাং তা গৌড়ীয় ভক্তিসাধনার একান্ত মৌলিক সম্পদ। ভাগবতের গোপীপ্রেমাদর্শের বহুল বিবর্তন-সাধন করে গৌড়ীয় সাধনাদর্শ প্রেমভক্তির সর্বোচ্চস্তরে এই মহাভাবের পর্যায়ে উত্তরিত হয়েছে। একমাত্র সাধিকা-শিরোমণি শ্রীরাধা ব্যতীত এই মহাভাব আর কারও অধিকারভুক্ত নয়, কেবল শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তি উন্মত্ত অনন্যসদৃশ রাগাত্মিক কৃষ্ণপ্রেমসাধনায় রাধাপ্রেমবিগ্রহরূপে বা রাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করে অবতীর্ণ বলে তাঁকেও মহাভাবের সাধকরূপে রাধার মতই অদ্বিতীয় মর্যাদা দান করা হয়েছে গৌড়ীয় দর্শন ও সাধনায়। এই মহাভাবের প্রধান

---

৫. জগাই-মাধাই উদ্ধারকালে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর উক্তি স্মরণীয় :

"সভাবে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ॥

(চৈ. ভা. ॥ মধ্য / ১৩শ পরিচ্ছেদ ॥)

৬. ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীর উক্তি স্মরণীয় :

"জন্মৈশ্বর্যশ্রুতং শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥" (ভা॰ ॥ ১/৮/২৬ ॥)

অর্থাৎ—'উচ্চকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য, বিদ্যাগৌরবে অভিমানস্ফীত ব্যক্তিগণের ঈশ্বরের নামগ্রহণেরই অধিকার থাকে না, কিন্তু যাঁদের এ সকল কোন গৌরব নেই—অকিঞ্চন, তাঁরাই অন্তরের গভীর ভক্তিবোধে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারেন।'

বৈষ্ণব কবিসাধক যখন লেখেন—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" (হরিভক্তিবিলাস : শ্রীসনাতন গোস্বামী), তখন ভাগবতসিদ্ধান্তের অনুসরণ বা বিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অবলম্বন বিরহ। শ্রীচৈতন্যের সাধনাদর্শেও এই অশেষ বিরহ-তন্ময়তার পটভূমিতেই তাঁর অন্তরের ধ্যানজগতে একান্ত কৃষ্ণতন্ময়তা, যা তাঁর সুদীর্ঘ-কালের দিব্যোন্মাদ দশায় পূর্ণস্ফুট রূপলাভ করেছিল। গৌড়ীয় ভক্তিসাধনায় ভক্ত-ভগবানে বিচ্ছেদ না থাকলে আত্মিক অভেদবোধ বা মিলনের পূর্ণ রসাস্বাদ ঘটতে পারে না। গৌড়ীয় ভক্তিদর্শনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের স্বরূপটিকে উপলব্ধি করতে হলে সাধনাদর্শের রাগময় প্রেম-ভক্তি এবং তার গভীরতা ও নিত্য বৈচিত্র্যসম্পাদক বিরহস্বরূপের উপলব্ধি তাই একান্তই প্রয়োজন। বৈষ্ণব কবিগণও এই বিপ্রলম্ভাত্মক প্রেমাদর্শের আলোকেই গৌড়ীয় দর্শনের তত্ত্বাবলীর সহজ অনুভবগম্য রূপ দিয়েছেন তাঁদের কাব্যসাহিত্যে বা পদাবলীতে। এ কারণেই বৈষ্ণবসাহিত্য বিশেষতঃ পদাবলীকে বলা হয় বৈষ্ণব দর্শনের রসভাষ্য। বিপ্রলম্ভ বা বিরহেই প্রেম-ভক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ, কেননা ব্যাকুল-আকাঙ্ক্ষার ক্রমগভীর নিত্য-সজীবতাই প্রেম বা ভক্তির মূলকথা। বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন-সাধনা-সাহিত্য—সর্বক্ষেত্রেই বিপ্রলম্ভাত্মক শৃঙ্গাররসের স্থান মুখ্য-নিয়ন্ত্রক হিসাবে। সমগ্র ভারতবর্ষের, শুধু তাই বা কেন—সমগ্র বিশ্বের ভক্তিসাধনার ইতিহাসে ভক্তির বিবর্তিত সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটির সন্ধান মিলবে গৌড়ীয় সাধনার এই বিরহাদর্শের বিশ্লেষণে,—যার মুখ্যতমা বাহিকা হলেন মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধা।

দুই

ভক্তির ক্রমগভীর বিন্যাসে সাধনভক্তি থেকে ক্রমে ভাবভক্তি এবং ভাবভক্তি থেকে ক্রমে প্রেমভক্তির পর্যায়ে বিবর্তনের ধারাটি আমরা ভক্তিরসা-মৃতসিন্ধুর শ্লোকে পূর্বেই দেখেছি এবং এও উল্লিখিত হয়েছে যে মহাভাব সেই প্রেমভক্তির সর্বোচ্চ বিবর্তন। প্রেমভক্তি থেকে মহাভাব-পর্যায়ে বিবর্তনের সে ধারাটি সুবিশাল। বিবর্তনের প্রতিটি স্তরেই উত্তরোত্তর নানা গুণের সঞ্চারে সর্বশেষ পরিণতি মহাভাব লাভ করেছে সমগ্র বিশ্বে অনন্য এক বিস্ময়কর গৌরব-পরিণতি। মহাভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণের পূর্বে এই বিবর্তন-ধারাটির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক।

কৃষ্ণের প্রতি ভক্তমনের প্রেমবাসনাকে প্রধানতঃ পাঁচটি স্থায়িভাবে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হল—শম্, সেবা, বিশ্বাস, বৎসলতা ও মধুরা। বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সহযোগে এগুলি যথাক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি স্থায়িরসে পরিণত হয়। এই পাঁচটি স্থায়িরসকে অবলম্বন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা শৃঙ্গার-রসাত্মক পঞ্চবিধ কৃষ্ণভক্তিসাধনার বিকাশ ঘটেছে। এগুলির প্রথমটি অপেক্ষা পরের স্তরগুলি উত্তরোত্তর উৎকর্ষব্যঞ্জক, অর্থাৎ :

"পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥

(চৈ. চ. ॥ ২/৮/৬৬-৬৭ ॥)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় দেখি—জীবসাধকের পরম সাধ্য ও তার সাধনসোপান নির্ণয়প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীতীরস্থ বিদ্যানগরে জগন্নাথবল্লভ-নাটকরচয়িতা শ্রীরায়রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের যে একান্ত আলোচনা হয়েছিল, তার মূলকথা ছিল ভক্তির ক্রমগভীর বিবর্তনধারায় তার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটির স্বরূপ উদ্ঘাটন। এ আলোচনাকালে শ্রীরায়রামানন্দের কাছে তত্ত্বজিজ্ঞাসায় পরম জ্ঞানলাভের ছলে শ্রীচৈতন্যদেব রামানন্দের দ্বারাই জীবের পরম সাধ্য-সাধনতত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন। প্রেমভক্তির বিকাশধারাটিও সে আলোচনায় অনুপম কাব্যগুণমণ্ডিত হয়ে বর্ণিত হয়েছে।

জীবসাধকের পরম সাধ্য নির্ণয়প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের "পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"—এই তত্ত্বজিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীরায়রামানন্দ একেবারে প্রাথমিক স্তরে স্বধর্মাচরণ, অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মাচারপালন, দ্বিতীয় স্তরে কৃষ্ণে কর্মার্পণ অর্থাৎ ফলানুসন্ধানশূন্য কর্মানুষ্ঠান, তৃতীয় স্তরে স্বধর্মত্যাগ অর্থাৎ ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির চিন্তা বর্জন করে শুধুমাত্র কৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠতা,—যা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় উপদেশ করেছিলেন—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" শ্লোকে (১৮/৬৬) এবং চতুর্থস্তরে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে জীবের সাধ্যসার বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। (দ্রঃ চৈ. চ.

॥ ২/৮/৫৪-৫৭ ॥)। এই চতুর্বিধ সাধনায় স্বধর্মাচরণ অপেক্ষা পরবর্তীগুলির প্রতিটি যথাক্রমে পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সে হিসাবে এই চতুর্বিধ সাধ্যের মধ্যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষজনক। ভাগবতের এক অংশে দেখি—ভক্তিবিহীন জ্ঞানকে সাধকের পরিশ্রম-সার বলে নিন্দা করে শ্রীব্রহ্মা জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিসংযোগের উপদেশ দিয়েছেন।[৭] রায়রামানন্দ-কথিত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অবশ্য ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান অপেক্ষাও গৌরবসূচক,—কেননা ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানে জ্ঞানই মুখ্য, ভক্তি গৌণ; কিন্তু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জ্ঞান গৌণ, ভক্তিই মুখ্য। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব চতুর্বিধ সাধ্যের সবক'টিকেই "এহো বাহ্য" বলে তাদের অসারতা প্রতিপাদন করেছেন। কেননা, এগুলির কোনটির দ্বারাই অন্তরে ভক্তির উদয় হয় না। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ক্ষেত্রেও জ্ঞানের সংস্পর্শ-হেতু সেই জ্ঞানই সাধকের চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ফলে সে চিত্তে ভক্তির বিকাশ ঘটে না।

এই চতুর্বিধ সাধনাই হ'ল শান্তভাবের সাধনা। শাস্ত্রের বিধিনির্দেশিত পথে ঈশ্বরের নানা অলৌকিক ঐশীগুণ ও মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত এই শান্তরসের সেবাবাসনায় ঈশ্বর সম্পর্কে সাধকের চিত্তে সম্ভ্রম-গৌরববোধ, ভয়-সঙ্কোচ, আপনার ক্ষুদ্রত্বজ্ঞান প্রভৃতিই প্রবল হয়ে ওঠে এবং সে কারণে ইচ্ছামত ঈশ্বরসেবার বাসনা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। শান্তভাবের সাধনায় জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভক্ত-ভগবান সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে না। তাই শান্তরসের সাধনায় ঈশ্বরের প্রতি জীবহৃদয়ে কোনপ্রকার স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসাও গড়ে ওঠে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাই বলা হয়েছে :

"শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥" (॥ ২/১৯/১৭৭ ॥)

সাধনভক্তি প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত—এক, কৃত্যাকৃত্য সম্পর্কে শাস্ত্রনির্দে-

৭. "শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।"
(ভা॰ ॥ ১০/১৪/৪ ॥)

অর্থাৎ,—ভক্তিবিহীন কেবল জ্ঞানের সাধনা যাঁরা করেন, তাঁদের কেবল ক্লেশমাত্রই লাভ হয়ে থাকে।

শিত বৈধী বা বিধিমার্গীয় ভক্তি এবং দুই, অন্তরের নির্দেশে চালিত মমত্ব-বোধযুক্ত রাগমার্গীয় ভক্তি। বৈষ্ণব দর্শনে রাগমার্গীয় ভক্তি আবার সম্বন্ধানুগা ও কামানুগা—এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত। গৌড়ীয় সাধনায় বৈধীভক্তিকে কোথাও প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, কেননা তা কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্দেশের অধীন বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব। তাতে ভগবানের প্রতি মমত্ববোধযুক্ত প্রেমের উন্মেষ ঘটে না। শান্তভক্তির সাধনা এরূপ অনুরাগহীন বৈধীভক্তির সাধনা। গৌড়ীয় সাধনায় তার স্থান একান্তই গৌণ এবং সে কারণেই ভক্তিবিবর্তনের ক্রমবিন্যাসে তাকে রাখা হয়েছে আদিতে বা সর্বনিম্নে। ভক্তির অঙ্গ নয় বলে স্বধর্মাচরণ প্রভৃতি পূর্বোক্ত চতুর্বিধ শান্তভক্তির কোন মর্যাদাই গৌড়ীয় দর্শন কিংবা সাধনায় স্বীকার করা হয়নি। (দ্রঃ চৈ. চ. ॥ ২/২২/৬০-৮১ ॥)

ভক্তিকে শাণ্ডিল্যসূত্র বলেছেন—"সা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ।" (শাণ্ডিল্য-সূত্র ॥১০॥)। অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান, যোগ—সমস্ত কিছুই ভক্তির অপেক্ষা রাখে আর সে কারণেই ভক্তি হল সর্বশ্রেষ্ঠ।[৮] এ থেকেই অর্থান্তরে এ সিদ্ধান্তও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভক্তি কারও অপেক্ষা রাখে না। যথার্থ ভক্তি তাই কেবলা, কেননা জ্ঞান-কর্মাদির সংযোগে ভক্তির গভীরতা বিনষ্ট হয়। এ কারণে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানশূন্য ভক্তি উৎকর্ষজনক। ভক্তি কেবলা না হলে গৌড়ীয় সাধনার ক্ষেত্রে তাকে কখনই যথার্থ ভক্তির মর্যাদা দেওয়া হয় না। এই কেবলা-ভক্তির বিবর্তনেই সম্বন্ধানুগ প্রেমভক্তি বা রাগভক্তির উদ্ভব ঘটে। বৈষ্ণব সাধনায় দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিনভাবের সাধনা সম্বন্ধানুগ রাগমার্গে প্রতিষ্ঠিত। এগুলি প্রেমভক্তির ক্রমবিবর্তনের ফল। সম্বন্ধানুগ রাগমার্গের প্রথমস্তরে দাস্যভক্তির সাধনায় ঈশ্বর ও জীবসাধকের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে ঈশ্বরের প্রতি সাধকের সেবাবাসনায় স্নেহ-প্রীতি-মমত্ববোধেরও সূচনা ঘটে। কোন তত্ত্ব-

৮. স্মরণীয় :
"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম যোগ জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥"
(চৈ. চ. ॥ ২/২২/১৪-১৫ ॥)

জ্ঞান বা কর্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা এ সাধনায় থাকে না। তাই সাধ্যবস্তু নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে রায়রামানন্দ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পরবর্তী তিনটি বিবর্তনের স্তরে যথাক্রমে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি বা কেবলা ভক্তি, প্রেমভক্তি এবং দাস্যভক্তিকে সর্বসাধ্যসার বলে বর্ণনা করেন। মমত্ববোধ ও রাগভক্তির উন্মেষ ও বিকাশহেতু শ্রীচৈতন্যদেব "এহো হয়" বলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা এ তিনটির অধিকতর গৌরব বা ক্রমোৎকর্ষের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। (দ্রঃ চৈ. চ.॥ ২/৮/৫৯-৬১॥)। দাস্যরতির অপর নাম—'প্রীত', কারণ তা পার্থিব স্থূলবস্তু বিষয়ে প্রীতির বিনাশ ঘটিয়ে কেবল কৃষ্ণ বা ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির সূচনা করে। তাহলেও এই প্রীত বা দাস্য-ভক্তিরসে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনিবার্যভাবে একটা প্রবল সম্ভ্রম-গৌরববোধ সাধকের চিত্তে গড়ে ওঠায় আপনার সম্পর্কে সাধকের একান্ত দীনতাবোধ ঈশ্বরের প্রতি মমত্বময় প্রেমের সম্যক বিকাশক্ষেত্রে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একারণেই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কৃষ্ণকে বলতে শুনি ঃ

"ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥"

(চৈ. চ.॥ ১/৪/১৬-১৭॥)

তাই রায়রামানন্দের কাছে শ্রীচৈতন্যদেব "এহো হয়" বলে শান্তরস অপেক্ষা দাস্যরসের অধিকতর মর্যাদাকে স্বীকার করলেও আরও বিবর্তিত ও ঘনীভূত প্রেমস্বরূপের উন্মোচন-বাসনায় কৌতূহল প্রকাশ করে বলেছিলেন "আগে কহ আর।"

বৈষ্ণব-সাধনায় দাস্যভাবের ঊর্ধ্বস্তরের সাধনা হ'ল সখ্যভাবের সাধনা। সম্ভ্রম-গৌরববোধের অবসানে ঈশ্বরের প্রতি মমত্বযুক্ত সমতাবোধ এ স্তরে মুখ্য হয়ে ওঠায় প্রেম সঙ্কুচিত হবার কোন সম্ভাবনা এখানে থাকে না। সমতাবোধ-হেতু ঈশ্বর সম্পর্কে ঐশীজ্ঞানের সম্পূর্ণ অবসান ঘটায় তাঁর সম্পর্কে কেবল মাধুর্যজ্ঞানের বিকাশে তাঁর প্রতি নিঃসঙ্কোচ প্রীতিবৃদ্ধির প্রথম উৎস এই সখ্যভক্তির স্তরেই। শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চবিধ সাধনার মধ্যে সখ্যের স্থান

প্রেমভক্তি-বিবর্তনের ঠিক মধ্যস্তরে। কারণ শান্ত ও দাস্যরসের সাধনায় ঐশীজ্ঞানহেতু ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রম-গৌরববোধে প্রেমভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটে না। এ দুটি স্তরে ঈশ্বরকে বড় এবং আপনাকে দীন-হীন জ্ঞান করায় ভক্ত হন ভগবানের অধীন। অপরদিকে সখ্য সাধনার পরবর্তী বাৎসল্য ও সর্বাপেক্ষা গভীর মধুর-রসাত্মক সাধনার স্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের অধিকার-সীমা ক্রমবৃদ্ধির ফলে ভগবানই হন ভক্তের অধীন। এই দুটি ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের মদীয়তাবোধ প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু সখ্যভাবের সাধনায় ভক্ত ও ভগবান পরস্পর পরস্পরের অধীন। ফলে সখ্যসাধনায় প্রীতির সঙ্কোচ ঘটে না ঠিকই, কিন্তু অনুরাগের গভীরতাও তাতে সৃষ্টি হতে পারে না। তাই সখ্যরসের সাধনা অপেক্ষা বাৎসল্যরসের সাধনা আরও বেশী গভীর। সখ্যের সমতা ও অন্যান্য গুণাবলীর সঙ্গে এ স্তরে যুক্ত হয় ঈশ্বরকে সন্তান-জ্ঞানে, অসহায় স্নেহভাজনজ্ঞানে লালন-পালনের ভাব। সন্তানের প্রতি জননীর যে অসীম স্নেহ-অধিকার ও মমতাধিক্য, সন্তানের কল্যাণকামনায় একদিকে তাকে নিঃসঙ্কোচ শাসন-ভর্ৎসন, অপরদিকে তার অমঙ্গল-আশঙ্কায় গভীর উদ্বেগ ও ব্যাকুলচিত্ততা, আপনার সমস্ত সুখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হয়ে সন্তানের মঙ্গলসাধনে উন্মুখ তৎপরতা—সখ্যভাবের সাধনায় এ সকল থাকতে পারে না। তাই সখ্যভাবের সাধনা অপেক্ষা বাৎসল্য-রসের সাধনায় প্রেমভক্তির প্রগাঢ়তা অনেক বেশী।

তাহলেও, বাৎসল্যরসের এরূপ প্রগাঢ় স্নেহ-ভালবাসার সাধনাকেও বৈষ্ণব সাধনায় ঈশ্বরের প্রতি ভক্ত-সাধকের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তির সাধনাহিসাবে গ্রহণ করা হয় নি। সাধ্যবস্তুর নির্ণয়প্রসঙ্গে রায়রামানন্দের মুখে সখ্য ও বাৎসল্য-প্রেমের কথা শুনে শ্রীচৈতন্যদেব জীবের সাধ্যহিসাবে এ দু'টিকে উত্তম বলে স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সর্বোত্তম বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই রামানন্দের কাছে আরো গভীর ও ঘনীভূত প্রেমভক্তির কথা শোনার বাসনায় অনুরোধ করেছিলেন—"আগে কহ আর॥" কারণ, বাৎসল্যপ্রেমের সাধনাতেও সঙ্কোচের বোধ থেকে সাধকের পূর্ণমুক্তি ঘটে না। সে সঙ্কোচ দেহাভিমান। বাৎসল্যবোধ তথা পাল্য-পালক সম্পর্কের জ্ঞানই ঈশ্বরের প্রীতির জন্য দেহাভিমান বিসর্জনে বাধা দেয়। কিন্তু ভক্ত-সাধকের দেহও

ঈশ্বরের প্রীতিলাভের ক্ষেত্রে একটা বড় উপকরণ। অন্যান্য সকল সঙ্কোচ বা অভিমান দূর করা সম্ভব হলেও বাৎসল্যপ্রেমের সাধকের ক্ষেত্রে এই দেহাভিমানই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ অধিকার করার সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক। বৈষ্ণব-সাধকের কাছে ঈশ্বরসেবা হ'ল পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ,—দেহ-মন আত্ম-পর অভিমান, লজ্জা-সঙ্কোচের বোধ, এমনকি আপনার প্রাণের প্রতি মায়া-মমত্বের বোধ পর্যন্ত দূর না হলে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ সম্ভব হয় না। কিন্তু পাল্য-পালক সম্পর্কজ্ঞানে পালক তার পাল্যের প্রীতিমানসে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু দেহগত অভিমান বিসর্জন দিতে পারে না। তাই বাৎসল্যপ্রেমাপেক্ষাও গভীরতর প্রেমের অনুসন্ধান প্রয়াসে শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন—"এহোত্তম আগে কহ আর।"

গৌড়ীয় ধর্মসাধনায় সেই সর্বোত্তম সাধ্যবস্তু হল কান্তাভাবের মধুর বা শৃঙ্গাররসের সাধনা। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—সম্বন্ধানুগ এই তিনভাবের সাধনায় সাধক দাস্য, সখ্য প্রভৃতি সম্বন্ধের মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন বলে সম্বন্ধের অতিরিক্ত কোনরূপ সেবাবাসনা সাধকের থাকে না। কিন্তু মধুররসের সাধনায় ঈশ্বরকে পরম-কান্তজ্ঞানে সেবাবাসনায় কোন প্রকার সম্পর্কের নির্দিষ্ট সীমাবন্ধন আর থাকে না। এমনকি দেহাভিমান পর্যন্ত সেখানে না থাকায় ঈশ্বরকে প্রীতিদানের উদ্দেশ্যে নিজাঙ্গদানেও সাধক সেখানে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কুচিত। তবে এরূপ দেহদান আত্মসুখবাসনা চরিতার্থ করার জন্য নয়, তা কেবল কৃষ্ণপ্রীতির জন্য।[৯] ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন,

৯. স্মরণীয়: দেহদান প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতে রাধার উক্তি:

"মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে
অতএব দেহ দেঙ্ দান। (॥ ৩/২০/৫০॥)

এবং কেবলমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাসনায় উদ্বুদ্ধ রাধার প্রেমস্বরূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি:

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন। তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়। আত্ম-কৃষ্ণ-সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥"
(ঐ॥ ২/৮/১৭১-'৭২॥)

সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত চিত্তে দ্বিধাসঙ্কোচমুক্ত হয়ে সাধক তা সম্পন্ন করতে পারেন একমাত্র মধুররসের সাধনায়। কোন ধর্ম-অধর্ম, কৃত্য-অকৃত্যের বিধিনিষেধ এ স্তরে থাকে না বলে কৃষ্ণপ্রীতির জন্য যাবতীয় ধর্মত্যাগেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন না। এ স্তরে সাধক একমাত্র রাগময় অন্তরের দ্বারা চালিত হন বলে প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত ও পূর্ণ বিকাশ ঘটে। পঞ্চবিধ ভাবসাধনার পঞ্চবিধ গুণেরই সমাবেশ ঘটে মধুররসের সাধনায়। কবিরাজ গোস্বামী লেখেন :

"মধুর-রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥"

(চৈ. চ. ॥ ২/১৯/১৮৯-'৯২ ॥)

সর্ববিধ ভাব ও রসের সমাহারের ফলে মধুর বা শৃঙ্গাররসকে 'ভক্তিরসরাট্' আখ্যা দিয়ে শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' মহাগ্রন্থে শান্ত-দাস্যাদি রসবর্ণনাপ্রসঙ্গে মধুররসের আলোচনা সংক্ষেপে করা হয়েছে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করে কেবল সেই মধুর বা উজ্জ্বলরসকে অবলম্বন করেই তার অতুলনীয় অপার রহস্যকে তুলে ধরতে পৃথক 'উজ্জ্বলনীলমণি' মহাগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনার কথা গ্রন্থসূচনাতেই ব্যক্ত করেছেন :

"মুখ্যরসেষু পুরা যঃ, সংক্ষেপেণোদিতোঽতিরহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তিরসরাট্, স বিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥"

(উ. নী. ॥ ১/২ ॥)

এবং সুবিশাল মহাকাব্য 'উজ্জ্বলনীলমণি' সমাপ্ত করেও উপসংহারে মধুর-রসসমুদ্রের তটস্থিত হয়ে কেবল তার স্পর্শটুকুমাত্র তিনি লাভ করতে পেরেছেন বলে কবি যে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন (দ্রঃ উপসংহার / ১),

তাতে মধুররসের ভূমাস্পর্শী অসীম মাধুর্য ও সর্বশ্রেষ্ঠত্বের নিঃশেষ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে তাই স্বীকৃত হয়েছে :

"তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥" (॥ ১/৪/৪০ ॥)

শ্রীরায়রামানন্দের কাছে এই মধুররসকেই "সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়" বলে স্বীকার করে (চৈ. চ. ॥ ২/৮/৭৩ ॥) সাধ্যতত্ত্বের সর্বোত্তমতা সম্পাদন করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে অনেকেই কামজ্ঞানে মধুররসের সাধনাকে নিন্দার্হ বলে গণ্য করে শান্ত, দাস্য প্রভৃতি অপর চারভাবের সাধনাকে উৎকর্ষজনক মনে করেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে শ্রীরূপ গোস্বামী তাই মধুররসের সাধনাক্ষেত্রে তাঁদের অনধিকারী বলে ভর্ৎসনা করেছেন :

"নিবৃত্তানুপযোগিত্বাদ্দূরূহত্বাদয়ং রসঃ।" (॥ ৩/৫/২ ॥)

তিন

যে প্রেমরস গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনার 'সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়' পরম-পুরুষার্থ, তার স্থায়িভাব হল চিত্তদ্রবতা। এই চিত্তদ্রবণের ফলে মধুররসের ক্ষেত্রে আত্ম-পর বা কান্ত-কান্তা ভেদজ্ঞানের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। কান্ত-কান্তার প্রেমের সে অবস্থায় প্রেম কেবল এক বিলাসতন্ময়তা ছাড়া আর কিছু নয়। সমস্ত প্রকার সচেতনবোধ কিংবা উপাধি তখন লুপ্ত হয়ে যায়। সে অবস্থায় ধর্ম-অধর্ম বোধ দূরের কথা,—কান্ত-কান্তা বা পুরুষ-নারী বোধটুকু পর্যন্তও থাকে না। এই আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা কিন্তু মুক্তির অদ্বৈতানুভূতি নয়, কেননা এই বিলাসতন্ময়তার পর আবার ভেদজ্ঞানের উদয় হয়। একে একপ্রকার অনির্বচনীয় অপরূপ আস্বাদঘন রসসম্ভোগের অবস্থা বলা যেতে পারে। এই আস্বাদতীব্র অনুভবেই কবি-কর্ণপুরের কৃষ্ণ রাধা-সম্বোধনে বলেন :

"প্রেয়াংস্তেঽহং ত্বমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদ-
স্ত্বং মে প্রাণা অহমপি তবাস্মীতি হন্ত প্রলাপঃ।
ত্বং মে তে স্যামহমিতি চ যত্তচ্চ নো সাধু রাধে!
ব্যাহারে নৌ ন হি সমুচিতো যুষ্মদস্মৎপ্রয়োগঃ ॥"
(অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥ ৫/১১ ॥)

["হে রাধে! আমি তোমার প্রিয় এবং তুমি আমার প্রিয়া—এরূপ উক্তি প্রবাদমাত্র। তুমি আমার প্রাণ, আমিও তোমার প্রাণ—এরূপ উক্তিও প্রলাপমাত্র। তুমি আমার এবং আমি তোমার এরূপ যে বাক্য—তা সাধু নয়। 'তুমি-আমি'—এরূপ শব্দ প্রয়োগই আমাদের কথাপ্রসঙ্গে মোটেই সমীচীন নয়।"]

এ এক বিমূর্ত মানসিক অবস্থা। গভীর অনির্বচনীয় প্রেমের বাহ্য-চেতনাহীন তন্ময় অনুভূতিতে পুরুষ-নারী বোধহীনতার কথা স্মরণ করে সখিদের কাছে শ্রীরাধাকেও বলতে শুনি কবি-কর্ণপুরের নাটকে :

"সখি, ন স রমণ নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভরমণ ইব মদন নিষ্পিপেষ বলাৎ "

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় ॥ ৭/১৫ ॥)

["সখি, সে রমণ আমি রমণী—এরূপ ভেদবুদ্ধি আমাদের ছিল না, কারণ মদন বলপূর্বক আমাদের উভয়ের চিত্ত হরণ করেছিল।"]

সমস্ত প্রকার আত্মসুখবাসনামুক্ত প্রেমের উদ্ভবে উভয়নিষ্ঠ চিত্তদ্রবণের ফলেই এই অনুভূতির উন্মেষ ঘটে, যা লৌকিক জগতে একান্তই দুর্লভ। এই অনুভূতির উপরই বৈষ্ণব দর্শনের প্রেমবিলাসবিবর্ততত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। যেখানে প্রেমের বিবর্তনে একমাত্র প্রেমই দেহ-মন-হৃদয়ের বিলাস, অন্য কোন চিন্তা, জ্ঞান বা বোধ বিন্দুমাত্র থাকে না, বৈষ্ণব দর্শনে তাইই প্রেমবিলাসবিবর্ত। এই বিলাস-তন্ময়তার মধ্যেই প্রেমের সর্বগ্রাসী রসরাজ-রূপটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সাধ্যবস্তুর আলোচনাকালে শ্রীরায়রামানন্দ তাই জীবসাধকের পরমতম সাধ্য হিসাবে কান্তাপ্রেমের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, স্বকৃত গীতের মাধ্যমে তার চরম গভীরতা বিলাসমাত্রৈকতন্ময়তা তথা প্রেমবিলাসবিবর্ত স্বরূপের কথাও শুনিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যকে :

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ ন হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি ॥..." ইত্যাদি।

(চৈ. চ. ॥ মধ্যলীলা / ৮ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ॥)

লৌকিক জগতের পুরুষ-নারীর প্রেমের সঙ্গে এরূপ প্রেমের কোনপ্রকার তুলনা চলে না। কারণ, লৌকিক জগতের প্রেম আত্মসুখের বাসনায় পূর্ণ এবং মিলনপ্রত্যাশী। জগতের অন্যান্য ধর্মাদর্শের মধুর-রসাত্মক প্রেমসাধনার প্রেমের মধ্যেও প্রেমবিলাসবিবর্তস্বরূপ এরূপ বৈষ্ণবীয় প্রেমাদর্শের কোন সাদৃশ্য মেলে না। কেননা, আর সকল ধর্মসাধনাই সাধনার পরিণতিতে সাধ্য হিসাবে ভক্ত-ভগবানের মিলনপ্রত্যাশী. অর্থাৎ ভক্তের মোক্ষলাভকেই সর্বক্ষেত্রে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করা হয়েছে। সাধন-পরিণামে অবিনশ্বর আত্মার এমন এক লোকে উত্তরণ সে সব ক্ষেত্রে সাধকের কাম্য, যেখানে দুঃখ-জরা-গ্লানি-মৃত্যু কিছু নেই। স্পষ্টতঃই সে সকল সাধনা সকাম বা সোপাধিক অর্থাৎ নিরুপাধি নয়। গৌড়ীয় সাধনাব্যতীত মধুর-রসসাধনার অন্যান্য দৃষ্টান্ত হিসাবে খ্রীষ্টীয় মিষ্টিক সাধনা, সূফী-সাধনা, আড়বার সাধকসম্প্রদায়ের সাধনা, সহজিয়া বৌদ্ধসাধনা প্রভৃতির কথা শুনে থাকি। বাইবেলে বর্ণিত রাজা সলোমনের প্রার্থনা তাঁর মধুর-রসসাধনার দৃষ্টান্ত হিসাবে সমগ্র বিশ্বে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সে প্রার্থনায় তাঁর কান্তাভাবের প্রেমসাধনার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু সে প্রেম কেবলমাত্র সাধনগণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ, বৈষ্ণবের প্রেমের মত তাইই সাধ্য বা পরম পুরুষার্থ হয়ে ওঠেনি। তাঁর প্রার্থনাসঙ্গীতের প্রথমেই শোনা যায় সম্ভোগ-বাসনার কথা :

"O that you would kiss me with the kisses of your mouth" (The Bible / The Song of Solomon, 1/2)

এবং সুদীর্ঘ বিরহগীতির শেষেও সলোমনের কণ্ঠে চিরস্থায়ী মিলনেরই প্রার্থনা শুনি—যা ঈশ্বরে সাযুজ্যমুক্তিরই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় :

"Set me as a seal upon your heart,
as a seal upon your arm ;…" (Do, 8/6)

খ্রীষ্টীয় সাধিকাশ্রেষ্ঠা সেন্ট্ তেরিজার প্রার্থনাও অনুরূপ মুক্তিভাবনাকেই বহন করে :

"Please, Thee to unite me to Thyself,
making my soul thy bride ; .." ইত্যাদি।

মধুররসের সাধনায় এরূপ সোপাধিক মুক্তিচিন্তার ফলে পরিণতিতে

ঈশ্বরের প্রতি প্রেমবোধ, গভীর ব্যাকুলতা ও বিরহার্তির অবসান ঘটেছে। অদ্বৈতবাদী বেদান্তদর্শনের মত খ্রীষ্টীয় দর্শনও স্পষ্টভাষায় প্রচার করেছে তার সাধনলক্ষ্য সাধ্যের কথা :

> "Communication with God is the very end of man's being. Because man was created for the very purpose of enjoying God and being enjoyed by Him." (This Jesus : Eric G. Frost, p. 89)

অপরদিকে, সূফী-সাধনাদর্শের ক্ষেত্রেও প্রাচীনতম সাধিকা রাবিয়া (খ্রীঃ ৭১৭-৮৬১) থেকে হল্লাজ-কালাবজি-আত্তার-সাদী-জলালুদ্দীন রূমী-হাফিজ-জামী প্রভৃতি পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু সূফী কবি-সাধকের কাব্যে, সাধনায় মধুররসাত্মক প্রেমসাধনার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হলেও সে সাধনার পরিণতিতে তাঁরা সকলেই উপনীত হয়েছেন ঈশ্বরে সাযুজ্যমুক্তি 'ফণা-ওয়া-বাকা' (Fana-wa-baqa) তত্ত্বে,—যার অর্থব্যাখ্যায় সূফী তত্ত্ববিদ্ লিখেছেন :

> "Union with God means, annihilation of the self in God (fana) and subsistence in Him (baqa). At this stage all distinction between God and man, Beloved and lover,[১০] Sought and seeker disappear." (Sufism and Vedanta : Dr. Roma Choudhury, Part-II / p. 156)

ভারতের আড়্বার সাধকসম্প্রদায়ও এরূপ সাযুজ্য মুক্তিতেই তাঁদের মধুররসাত্মক ঈশ্বর-প্রেমসাধনার পরিসমাপ্তি টেনেছেন। আড়বারসাধিকা-শ্রেষ্ঠা আণ্ডাল বা গোদার ঐতিহাসিক জীবনচরিত রাজা কৃষ্ণদেব রায়-রচিত 'আমুক্তমাল্যদ' সেই সত্যকেই উজ্জ্বল করে। মীরাবাঈ-এর কৃষ্ণকান্তাভাবের সাধনারও আমরা পরিণতি দেখি কৃষ্ণসাযুজ্যমুক্তিতেই।

রাগময় সহজিয়া বৌদ্ধসাধনার ক্ষেত্রেও আমরা খুব একটা ভিন্ন সিদ্ধান্তে

---

১০. সূফী-সাধনায় ঈশ্বর প্রেমিকা ("মাশুক") এবং জীবসাধক প্রেমিক ('আসেক')।

পেঁছতে পারি না। তাঁরা যদিও 'সহজ' প্রেম ও ভক্তির পথকেই সাধনার পথ বলে মনে করেন এবং বৈধী আচারমার্গের বিরোধিতা করে বলেন :

"কিন্তো তন্তে কিন্তো মন্তে কিন্তো রে ঝাণ বখানে ?"

(চর্যাগীতিপদাবলী ॥ ৩৪ ॥)

অর্থাৎ 'সাধনক্ষেত্রে তন্ত্র, মন্ত্র কিংবা ধ্যানের ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন ?' তথাপি চেতনার যে বিশুদ্ধ স্বরূপ তথা সহজ অবস্থায় উত্তরণ তাঁদের সাধনলক্ষ্য, তা কিন্তু নির্বাণ অর্থাৎ অদ্বৈত মুক্তিই। তাঁদের অন্যতম শাস্ত্রগ্রন্থ হেবজ্র তন্ত্রের মতে :

"তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্বং সহজং স্বরূপমুচ্যতে।
স্বরূপমেব নির্বাণং বিশুদ্ধাকার চেতসঃ॥ (॥ ২/২/৪৪ ॥)

["জগৎ এবং জগতের সকল কিছুই সহজস্বরূপ বিশিষ্ট, চেতনার বিশুদ্ধ স্বরূপই হ'ল নির্বাণ।"]

সহজিয়া বৌদ্ধসাধনা যদিও আত্মার সাধনা এবং তাঁদের সাধন ও সাধ্য দুইই 'সহজ'-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সে সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করলে পাই—ব্যক্তি-আত্মাকে উপলব্ধি করে পরম-আত্মায় বিলীন হয়ে মহাসুখপ্রাপ্তি, অর্থাৎ সহজ কথায়—আত্মোপলব্ধির সাধনায় পরমাত্মা-সাযুজ্যই এঁদের 'সহজ'-সাধ্যসাধনের মূলকথা। দৃষ্টান্ত হিসাবে চর্যার পদকে অবলম্বন করা যায়, সেখানে সাধকের উক্তি :

"যোইনি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥" (চর্যা° ॥ ৪ ॥)

এখানে যোগিনী হলেন শূন্যতা বা পরমাত্মা—যাঁকে চুম্বন করে এবং যাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে সাধক কমলরস অর্থাৎ অদ্বয় মিলনজনিত মহাসুখ লাভ করেন। সাধনলক্ষ্যে এঁরা কখনো 'সমরস' কিংবা 'প্রজ্ঞোপায়সিদ্ধি'র কথা বলেন, সে সকলও মোক্ষ বা নির্বাণেরই বিকল্প শব্দমালামাত্র।[১১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধক এ ক্ষেত্রে সালোক্য-সামীপ্যাদি কোন প্রকার মুক্তিকেই সাধনলক্ষ্য জ্ঞান করেননি, বরং মুক্তিবাসনাকে 'কৈতবপ্রধান' বা

১১. দ্রঃ ২০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পাদটীকা /৪.

সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, অথবা নরকসম কিংবা পিশাচী জ্ঞানে তীব্র নিন্দা-ভৎর্সনাই করেছেন।[১২] ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে শুনি :

"সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" (ভা° ॥ ৩/২৯/১৩ ॥)

["যাঁরা ভক্তিপরায়ণ, আমি তাঁদের সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও তাঁরা আমার সেবা ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন না।"]

গৌড়ীয় সাধক এইরূপ ভক্তসেবক। ভক্তি বা প্রেম এঁদের কাছে সাধনের সঙ্গে মুখ্য প্রয়োজনতত্ত্ব বা সাধ্যও। মুক্তি বা আত্মারামত্ব প্রেমবিরোধী বলেই তা এঁদের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয়েছে। শ্রীসনাতন গোস্বামীর উক্তি স্মরণীয় :

"অবান্তর ফলং ভক্তেরেব মোক্ষাদি যদ্যপি।
তথাপি নাত্মারামত্বং গ্রাহ্যং প্রেম বিরোধি-যৎ॥"

(বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ ॥ ২/২/২০১ ॥)

তাই এঁদের একমাত্র কাম্য সম্পূর্ণ নিরুপাধি অকৈতব নির্মল প্রেমভক্তি। কেননা তাঁরা জানেন :

"প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥" (ভা° ॥ ৭/৭/৫২ ॥)

বৈষ্ণব সাধনায় শান্ত থেকে মধুরের পরিণতি অধিরূঢ় মহাভাবের শেষ স্তর পর্যন্ত সুবিস্তৃত ভক্তির প্রথম ও একমাত্র শর্তটিই হ'ল—তা 'সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত' এবং তা কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রীতিবাসনায় উদ্বুদ্ধ ও নির্মল। (দ্রঃ ভ.র.সি. ॥ ১/১/১২-উদ্ধৃত নারদপঞ্চরাত্র শ্লোক ॥)। কবি-কর্ণপুর লিখেছেন :

"নিরুপাধি প্রেম কথঞ্চিদপ্যুপাধিং ন সহতে॥"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় ॥ ৭/১৭ ॥)

অর্থাৎ নিরুপাধি প্রেম কোনপ্রকার উপাধিই সহ্য করে না। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে ভর্তা-ভার্যাবুদ্ধির উদয় সত্ত্বেও জীবনের অস্তিত্ব থাকার জন্য তাঁর নাটকের নায়িকা রাধার কণ্ঠে পরম বিস্ময়ের সুর উচ্চারিত হতে শুনি :

---

১২. দ্রঃ চৈ. চ. ॥ ১/১/৫১ ও ২/৯/২৪৫ ॥ এবং ভ. র. সি. ॥ ১/২/২২ ॥

"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূ-
ন্মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা।
ভবান্ ভর্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি-
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্॥" (॥ ৭/১৫ ॥)

["আমি কান্তা, তুমি কান্ত—এরূপ বুদ্ধি তখন ছিল না। মনোবৃত্তিই লুপ্ত হওয়ায় তুমি ও আমি—এরূপ বুদ্ধিও বিনষ্ট হয়েছিল। এখন তুমি ভর্তা, আমি ভার্যা—এরূপ জ্ঞানের যে উদয় হয়েছে, তথাপি আমার প্রাণ অবশিষ্ট রয়েছে—এ অপেক্ষা বিচিত্র আর কী আছে?"]

এই প্রেমানুভূতিই বৈষ্ণবীয় মধুর-রসসাধনার পরম বৈশিষ্ট্য।

প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে এরূপ বিলাসমাত্রৈক তন্ময়তা গড়ে ওঠে একমাত্র মহাভাবাত্মক প্রেমের আদর্শে। সমগ্র বিশ্বের ভক্তিসাধনার ইতিহাসে এই মহাভাবের অধিকারিণী হলেন একমাত্র শ্রীরাধা। শ্রীচৈতন্যের সাধনায় যে সে মহাভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে, পূর্বেই জানানো হয়েছে—তা শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করে অবতীর্ণ হওয়ার কারণেই। প্রেমের আদিস্তর রতি থেকে মহাভাব-অবধি বিবর্তনের মোট ন'টি স্তরের উল্লেখ মেলে চৈতন্যচরিতামৃতে—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। (দ্রঃ ॥ ২/১৯/১৫১-'৫২ ॥)। বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে রাগের তীব্রতা পূর্বাপেক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। রাগময় প্রেমের এই ক্রম-ঘনীভবনের রূপটি কবিরাজ গোস্বামী একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন:

"যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা-সিতা-মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর॥" (চৈ. চ. ॥ ২/১৯/১৫৩ ॥)

অর্থাৎ ইক্ষুবীজ যেমন ক্রমপরিণতিতে ইক্ষুরস এবং ইক্ষুরস ক্রমপরিণতির ফলে উত্তরোত্তর গাঢ় হয়ে গুড়, খণ্ড, সার, শর্করা, চিনি, সাধারণ মিশ্রি এবং সর্বশেষে পরিশুদ্ধ উত্তম মিশ্রিতে ঘনীভূত হয়, তেমনি প্রাথমিক স্তরের রতিও ক্রমপরিণতির ফলে উত্তরোত্তর ঘনীভূত হয়ে স্নেহ, মান, প্রণয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে সর্বশেষ স্তরে বিশুদ্ধ উজ্জ্বল মহাভাবে পরিণতি লাভ করে।

একেবারে প্রাথমিক স্তরে রতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা

নিরন্তর উষ্ণস্বভাবা হলেও প্রবলতর আনন্দরূপিণী এবং উষ্ণতা প্রকাশ করলেও তা 'সুধাংশুকোটেরপি স্বাদী', অর্থাৎ কোটি চন্দ্রের মাধুর্য অপেক্ষাও মধুরস্বাদে পরিপূর্ণ (দ্রঃ ভ. র. সি. ॥ ১/৩/৬১ ॥)। রতির এরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যই কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় প্রেমে বিষজ্বালা ও অমৃত-আস্বাদের যুগপৎ সহাবস্থান :

"বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
সেই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥" (চৈ. চ. ॥ ২/২/৪৪-৪৫ ॥)

এই অদ্ভুত চরিত্র প্রেমই ক্রমবিবর্তনের ধারায় স্নেহ-মান-প্রণয়ের স্তর অতিক্রম করে রাগের পর্যায়ে এমন উৎকর্ষ লাভ করে যে, অত্যধিক দুঃখ-জ্বালা-বেদনাও রাগের মাধুর্যে সুখ বলে মনে হয়।[১৩] রাগ পরিণত অবস্থায় অধিকতর উৎকর্ষলাভের ফলে স্বয়ং নূতন নূতন বৈচিত্র্যধারণে যখন হৃদয়ে অনুভূত প্রিয়কে নিত্যনূতন মাধুর্যে মণ্ডিত করে প্রেম-ব্যাকুলতাকে অসীম করে তোলে, তখন তা অনুরাগ :

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে ॥ (উ. নী. ॥ স্থায়ি./১৪৬ ॥)

এই অনুরাগেরই পরিপক্ক অবস্থা ভাব, যা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বর্ণনায় শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষ, প্রেমরূপ সূর্যের কিরণতুল্য এবং রুচির দ্বারা চিত্তের মসৃণতা-সম্পাদক।[১৪] মধুররসের সকল সাধকের পক্ষে এই ভাবের অধিকার সুলভ নয়, এমনকি কৃষ্ণমহিষী বা কৃষ্ণের বৈধী স্ত্রীগণের পক্ষেও অতি দুর্লভ। তা একমাত্র ব্রজগোপীগণের সম্পত্তি। কৃষ্ণমহিষীগণ তাঁদের স্বকীয়া প্রেমসাধনায়

১৩. "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে ॥" (উ. নী. ॥ স্থায়ি. / ১২৬ ॥)

১৪ "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ (ভ. র. সি ॥ ১/৩/১ ॥)

যে আর্যধর্ম কিংবা কুলধর্ম বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিতা হন, পরকীয়া ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের সেবাবাসনায় সে সকল অনায়াসে ত্যাগ করে কলঙ্কের দুর্বহ ভার গ্রহণ করতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন না। তাঁরা তাঁদের প্রেমসাধনার ক্ষেত্রে প্রেমের বিকাশঘন এমন এক অবস্থায় উপনীত হন,—উজ্জ্বলনীলমণিতে যাকে বলা হয়েছে 'স্বসংবেদ্যদশা' (দ্রঃ স্থায়ি./১৫৪), যা একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা, লজ্জা-ভয়-কুল-শীল-মান প্রভৃতি সমস্ত প্রকার চিন্তা ও তজ্জনিত সঙ্কোচবোধের অবসান ঘটায়, সে অবস্থাই হ'ল ভাব। মধুররসাত্মক প্রেমের সর্বাধিক ঘনীভূত রূপের প্রকাশ তাই একমাত্র ব্রজগোপীগণের মধ্যে। এ কারণেই ভাগবতের দৃষ্টান্তে উদ্ধবের ন্যায় সর্বত্যাগী ঋষিকেও একান্ত দীনভাবে ব্রজগোপীদের চরণবন্দনা করতে দেখি। (দ্রঃ ১০/৪৭/৬৩)

ব্রজগোপীগণের মধ্যে আবার প্রেমের গভীরতায় শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীই সর্বরকমে শ্রেষ্ঠা। কিন্তু এই সিদ্ধান্তেই প্রেমের বিবর্তন সর্বোচ্চ রূপ পায় নি ; প্রেমের সেই সর্বোচ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ ভাবেরও ঘনীভূত পরিণতি মহাভাব-দশায়, যে স্তরে উত্তরণ ঘটেছে একমাত্র শ্রীরাধার, চন্দ্রাবলীর অধিকার সেক্ষেত্রে ভাব-সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। তাই প্রেমরসের সাধিকা হিসাবে রাধা ও চন্দ্রাবলীর তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী লিখেছিলেন :

"তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥" (উ. নী.॥শ্রীরাধাপ্রকরণ/৩॥)

রূঢ় এবং অধিরূঢ় দু'টি স্তরে বিভক্ত মহাভাবের শ্রেষ্ঠ রূপ হ'ল অধিরূঢ়। অধিরূঢ়ের দু'টি রূপ,—সম্ভোগকালে 'মাদন' এবং বিরহাবস্থায় 'মোহন'। বলা বাহুল্য, এ দু'য়েরও বিকাশ একমাত্র রাধারই অতুলনীয় প্রেমে। উজ্জ্বল-নীলমণিতে মাদনকে বলা হয়েছে 'সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী'— যা প্রেমোন্মাদিনী রাধার নিত্যকালের আচরণে পরিস্ফুট। আর মোহনের বিশিষ্ট অনুভব দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি দশার মধ্যে। বিরহবৈবশ্যহেতু এই মোহনদশাতেই প্রেমের ভাবসমূহ সুদ্দীপ্ত অর্থাৎ সর্বাধিক বিকশিত হয়।[১৫] তাই রাধার

১৫. "মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষ দশায়াং মোহনো ভবেৎ।
যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সুদ্দীপ্ত এব সাত্ত্বিকাঃ ॥ (উ. নী. ॥ স্থায়ি. / ১৭৯ ॥)

ক্ষেত্রে দেখা যায় গভীর বিরহদহনের মধ্যেই একদিকে তার সর্বোচ্চ প্রেম-গৌরবের প্রতিষ্ঠা, অপরদিকে কৃষ্ণমাধুর্যরসের গভীরতম আস্বাদের আনন্দলাভ।

মোহন-দশায় সচেতনবোধবিলুপ্ত যে প্রেমবৈবশ্য, দিব্যোন্মাদ তারই ফল। এই দিব্যোন্মাদ অবস্থার প্রেমাদর্শ ই গৌড়ীয় প্রেমসাধনা-বিবর্তনের শেষ কথা। এই অবস্থায়ই অন্তর-জগতে মিলন ও বিরহের তীব্র আস্বাদময় প্রেমানুভূতি সাধকের আত্মবিস্মৃত হৃদয়কে বিভোর করে রাখে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-লীলায় শেষ বারো বছরের সাধনায় সেই একান্ত কৃষ্ণবিভোরতাই ছিল তাঁর একমাত্র পরিচয়, যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষদর্শী অগণিত মানুষ আস্বাদ পেয়েছিলেন শ্রীরাধার অসীম প্রেমগভীরতার অননুকরণীয় পরমাশ্চর্য স্বরূপটির। সে অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেবের :

"আত্মস্ফূর্তি নাহি রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ॥
কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্তি তিন রীতে প্রভুর স্থিতি ॥" (চৈ.চ. ॥ ৩/১৫/৩-৪ ॥)

চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধার কৃষ্ণপ্রেমের যে অনন্ত বৈচিত্র্য ও মাধুর্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, তার পিছনে রাধাভাবাশ্রয়ী দিব্যোন্মাদনায় বিভোর মহাভাবের মূর্ত সাধক শ্রীচৈতন্যদেবই ছিলেন প্রধান উৎস। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন :

"দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোমগ্ন-চেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেম-মর্যাদা ভুবি দর্শিতা ॥" (ঐ ॥ ৩/১৫/১ ॥)

['রহস্যময় কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন ও ভাসমান-চিত্ত গৌরহরি অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের সাধনার দ্বারাই পৃথিবীতে প্রেমের চরম-সীমা প্রদর্শিত হয়েছে।']

বাস্তবিক, সমগ্র পৃথিবীর অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের সাধনা অপেক্ষা ভগবৎসাধনার বড় আদর্শ আর নেই।

চার

বৈষ্ণব ভক্তিসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেম। তাই কেবল সাধনার ক্ষেত্রেই নয়, বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন—সব কিছুরই গৌরবান্বিত বিকাশক্ষেত্রে অনিবার্য কেন্দ্রমূল হয়ে উঠেছেন রাধা। গৌড়ীয় দর্শনসিদ্ধান্তে রাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—এই তিন সত্তায় বিভক্ত অন্তরঙ্গা শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠা যে হ্লাদিনী, তারই মূর্তিমতী রূপ। হ্লাদিনীকে তাই সেখানে বলা হয়েছে মহাশক্তি—"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী।" (উ. নী. ॥ শ্রীরাধাপ্রকরণ/৬ ॥)। এই মহাশক্তি দ্বারাই কৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দ আস্বাদ করেন এবং জীবকেও করান। সুতরাং হ্লাদিনী-বিগ্রহ রাধাই কৃষ্ণের আনন্দরসাস্বাদের একমাত্র উৎস। কৃষ্ণকে লীলারসের অমৃতময় আস্বাদদানের উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব দর্শন কস্তুরী ও তার গন্ধ, আগুন ও তার উত্তাপ প্রভৃতির মতই রাধাকৃষ্ণ-অদ্বয়তনুর বিচ্ছেদসৃষ্টিকারী। (দ্রঃ চৈ. চ. ॥ ১/৪/৮৪-৮৫ ॥)। কেননা, বিচ্ছিন্নতা বা বিপ্রলম্ভজনিত নিত্য সজীব আকাঙ্ক্ষার ক্রমবৃদ্ধিতেই প্রেমরসের ভাণ্ডারটি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মহাভাবের সাধিকা রাধার ক্ষেত্রেও সর্বাত্মক বিরহের গভীরতাতেই তার সর্ব-প্রকার স্বার্থগন্ধ ও কামকলুষশূন্য বিশুদ্ধ প্রেমস্বরূপটি পূর্ণস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রেমের এরূপ বিকাশের জন্যই বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে সমস্ত প্রকার ঐশীচেতনামুক্ত পূর্ণ মাধুর্যসত্তায়। সেই মাধুর্য-পূর্ণতার জাগরণও একমাত্র রাধারই প্রেম-সাহচর্যের কারণে। চৈতন্যচরিতামৃতে স্বয়ং কৃষ্ণ তাই স্বীকার করেছেন—"রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু।" (১/৪/২০৫)[১৬]

শ্রীকৃষ্ণের মত শ্রীরাধায়ও প্রেমমাধুর্যের চির অবস্থান। মিলন-বিরহ, সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-জাগরণ—সকল অবস্থায় কৃষ্ণের প্রতি প্রেমসেবার চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা এমনকি স্ব-সুখবাসনার চিন্তা পর্যন্ত রাধার থাকে না। মহাভাবের উৎকর্ষেই তিনি এরূপ প্রেমগৌরবের মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। চির-

১৬. এ প্রসঙ্গে পৃ. ২৪ ও ২৫-এ উদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বিচ্ছেদের বেদনাকে তিনি ভুলতে পারেন অন্তরের গভীর ধ্যানে সর্বদা কৃষ্ণকে অনুভবের আনন্দ দিয়ে, যে আনন্দের আস্বাদ-গর্বে তিনি বলতে পারেন :

"হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরি রহু জাগি।"

(গোবিন্দদাসের পদাবলী. ॥ ৫৯৬ ॥)

কৃষ্ণপ্রেমের গর্ব ছাড়া আর কোন কিছুই সে রাধার অন্তরে স্থান পায় না। সমাজ-পরিবেশ, গুরুজন-ভীতি, লোককলঙ্ক, কুলধর্ম এমনকি নারীর স্বাভাবিক লজ্জাধর্ম পর্যন্ত সমস্ত কিছুই সেই কৃষ্ণগর্বের কাছে একান্ত তুচ্ছ হয়ে যায়; এগুলিকে তিনি ঠিক যেমনটি অভিসার-পথের অজস্র দুঃখ-বিপদ-দুর্যোগ-শঙ্কাকে—'পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলুঁ'—বলে অবহেলায় অতিক্রম করে আসেন, সেইভাবেই সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে উপেক্ষা করে এই পরম স্বীকৃতির আনন্দকেই সর্বস্ব করে তুলতে পারেন :

"বঁধু, তোমার গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমার রূপে।" (বৈ. প. ॥ ১১/৪ ॥)

কবি জ্ঞানদাসের ভণিতাংশে যার আরও উজ্জ্বল প্রকাশ :

"জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥" (ঐ ॥ ঐ ॥)

এই অন্তরবদ্ধ প্রেমানুভবের আনন্দগভীর আস্বাদে মগ্নচৈতন্য হয়ে কবি চণ্ডীদাসের রাধা অনায়াসে বলতে পেরেছেন :

"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল-মন্দ নাহি জানি।" (ঐ ॥ ১১/২ ॥)

প্রেমের আনন্দ মানসলোকে অনুভবের আনন্দ, প্রত্যক্ষ প্রাপ্তির মধ্যে সে আনন্দের উপলব্ধি থাকে না। এ কারণেই ভুক্তিমুক্তির সাধনা বৈষ্ণব

সাধকের কাছে পিশাচীবৎ পরিত্যজ্য বলে গণ্য হয়েছে। (দ্রঃ ভ. র. সি. ॥ ১/২/২২ ॥)। সংস্কৃত রসসাহিত্যের কবি লিখেছিলেন :

"সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যা।
সঙ্গমে সৈব যদেকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং তদ্বিরহে ॥" (অনুভবিষ্ণু)

বিরহের কৃষ্ণতন্ময় আস্বাদ-বিভোরতায় রাধা তাঁর বাস্তব অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত ভুলে যান, আত্মপর জ্ঞান পর্যন্ত সে অবস্থায় রাধার থাকে না। কবি বিদ্যাপতি রাধার এ অবস্থা বর্ণনা করেন :

"অণুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মধাঈ।
ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিসরল
আপনে গুণ লুবুধাঈ ॥" (বিদ্যাপতি ॥ ৭৮৪ ॥)

এ চিত্র চৈতন্যোত্তর কালের বৈষ্ণব দর্শনসিদ্ধান্ত প্রেমবিলাসবিবর্তবাদের কথা অনায়াসেই স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণের মথুরা-প্রবাসকালে সখিরা যখন তাঁর বিরহে ব্যথিত হয়ে সান্ত্বনা জানাতে আসেন—অন্তর-গভীরে প্রেমরসনিমগ্না এই অপূর্ব প্রেমের বাহিকা রাধা তখন সখিদেরই ভর্ৎসনা করে চণ্ডীদাসের পদে বলতে পেরেছেন :

"তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিব গো
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥"
(বৈ. প. ॥ ১২/১ ॥)

এমনকি প্রত্যাখ্যানকারী কৃষ্ণকে পর্যন্ত তার পৌরুষে আঘাত দিয়ে হৃদয়ে প্রেমরসের অবিনাশী আস্বাদে তন্ময় মহাভাবসাধিকা রাধা অনায়াসে বলতে পারেন-:

"হস্তমাক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্‌যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥"
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ : লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল ॥ ৩/৯৩ ॥)

আত্মসুখের সমস্ত বাসনা বিসর্জন দিতে না পারলে এমন উক্তি সম্ভব নয়।

এরূপ অশেষ প্রেমানুভবকেই বৈষ্ণব সাধনায় একমাত্র সাধনা ও একমাত্র সাধ্যে পরিণত করা হয়েছে, জাগতিক দুঃখবেদনা সেখানে বিচার্য হিসাবেই গণ্য হয়নি। বরং এরূপ প্রেমসেবার অধিকার অর্জনের জন্য পার্থিব জগতের দুঃখাবর্তেই অনন্তকাল জন্মগ্রহণ এবং যে কোন দুঃখবরণ পরম সুখের কারক হিসাবে তাঁদের একান্ত কামনার বস্তু হয়ে উঠেছে।

বৈষ্ণব দর্শনে 'গোপী' এবং 'রাধা'-শব্দ দু'টির তাৎপর্যেও বিশ্লেষিত হয়েছে মাধুর্যরসময় কৃষ্ণের প্রতি নিত্য প্রেমরক্ষা-ব্রতের সত্যতা। 'গুপ্'-ধাতুর অর্থ রক্ষা করা,—যাঁরা অজস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কৃষ্ণের প্রতি সর্বোপাধিশূন্য প্রেম রক্ষা করেন, তাঁরাই গোপী। আর রাধা-শব্দের তাৎপর্য—প্রেমের আরাধনায় যিনি চরম সিদ্ধিলাভ করেন,—'রাধ্ সংসিদ্ধৌ'—তিনিই রাধা। চৈতন্যপূর্বযুগে যে সকল বিরল ক্ষেত্রে মুক্তি ও স্বসুখবাসনাশূন্য অহৈতুকী ভক্তি বা প্রেমরক্ষার বাসনা প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছে, যেমন কবি বিদ্যাপতির নিম্নোদ্ধৃত প্রার্থনাংশটুকু :

"কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥" (বৈ. প. ॥ ১৪/১ ॥)

অথবা বিষ্ণুপুরাণে ভক্ত প্রহ্লাদের প্রার্থনা :

"নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
তামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"
(॥ ১/২০/১৮-১৯ ॥)

["হে নাথ, যে যে যোনিতে সহস্র সহস্র বার জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অবিচলা ভক্তি থাকে। অবিবেকী বা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের বিষয়ভোগে যেমন ঐকান্তিক প্রীতি থাকে, তোমার প্রতি আসক্ত আমার হৃদয় থেকে সেইরূপ ঐকান্তিক প্রীতি যেন অপসৃত না হয়।"]

একমাত্র এরূপ প্রার্থনাকেই স্বকৃত সাধনার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যদেব সঞ্চার করে দিয়েছেন বৈষ্ণব সাধনার সর্বস্তরে। 'শিক্ষাষ্টক'-ধৃত "ন ধনং ন জনং···" ইত্যাদি তাঁর স্বমুখনিঃসৃত প্রার্থনা মন্ত্রটিতেও তিনি ঈশ্বরের প্রতি জন্মজন্মান্তর-ব্যাপী অহৈতুকী ও অবিচলা সেই প্রেমভক্তি অর্জনের বাসনাকেই সর্বস্ব করে তুলেছেন, মুক্তিভাবনা সেখানে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয়েছে। চৈতন্যসাধনা-প্রভাবিত বৈষ্ণব সাধনায় এবং সাহিত্য ও দর্শনের সুবিশাল ক্ষেত্রে এরূপ অহৈতুকী ভক্তিপ্রেমেই সাধিকাশ্রেষ্ঠা রাধার অবিচল প্রতিষ্ঠা।

সাধনাক্ষেত্রে প্রেমানুভবকে অধিকতর তীব্রতা দানের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের সর্বস্তরে শুধু বিরহ নয়, তার সঙ্গে পরকীয়া কান্তাপ্রেমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কেবল বিরহের ধ্যান-তন্ময়তায় কৃষ্ণানুভবের আনন্দ তীব্রতর হয়ে উঠতে পারেনা, যদি পরকীয়াত্বের তীব্র বাধা না থাকে। স্বকীয় প্রেমরাগে সমাজকর্তৃক পূর্ণ অনুমোদন ও কান্তের উপর সমাজবিধি অনুযায়ী কান্তার সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণ অধিকারজনিত নিশ্চিন্ত ভরসা তথা কলঙ্কের ভয়শূন্যতা প্রেমরাগের তীব্রতাকে মন্দীভূত করে, কোথাও বা গতানুগতিকতায় বৈচিত্র্যের অভাবে সম্পূর্ণ বিনষ্টও করে। কৃষ্ণের বৈধী মহিষীগণ যে, অনুরাগের পরবর্তী ভাবের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা পাননি, তার মূল কারণ এখানেই নিহিত। কান্তের প্রতি প্রেমরাগ এবং মধুররসের আস্বাদ কোনটাই সেখানে তীব্রতা পায় না মূলতঃ উভয়ই সেখানে সমাজ-অনুমোদিত এবং সে কারণে বাধাহীন বলেই। সেক্ষেত্রে পরকীয়া কান্তার প্রেমরাগে সমাজ-অনুমোদনের অভাবহেতু উদ্বেগ, কলঙ্কভীতি, সমাজ ও গুরুজনের গঞ্জনা-ভর্ৎসনার নিত্য আশঙ্কা, প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা প্রভৃতি চিত্তকে উদ্বেগে-ব্যাকুলতায়-শঙ্কায় পরিপূর্ণ করে রাখে বলেই সে প্রেমরাগ সুতীব্র হয়ে ওঠে। এ কারণেই কৃষ্ণ ও ব্রজগোপী-দের মধ্যে অপ্রকট নিত্যলীলায় পরকীয়াত্ব না থাকলেও প্রকট ব্রজলীলাক্ষেত্রে সেই পরকীয়াত্বকে অনিবার্য করে তোলা হয়েছে প্রেম ও রসমাধুর্যের অসীম গভীরতা ও ব্যাপ্তি সম্পাদনের জন্যই। শ্রীজীব গোস্বামীর উক্তি স্মরণীয়ঃ

"বস্তুতঃ পরমস্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মাণাঃ ব্রজদেব্যঃ।"

(প্রীতিসন্দর্ভ ॥ ২৭৮ ॥)

পরকীয়ক্ষেত্রে কান্তাগণের মাধুর্য ও প্রেমরাগ—উভয়েরই সর্বাতিশায়ী বিকাশ।

তাই দেখি, বৈকুণ্ঠলোকে অবাধ প্রেমরাগের অধিকারিণী বৈধী বা স্বকীয়া কান্তা মাধুর্যশ্রেষ্ঠা লক্ষ্মীর শ্রী কিংবা সতীশ্রেষ্ঠা অরুন্ধতীর প্রেমরাগও ব্রজ-রমণীগণের মাধুর্য-পরিমল ও প্রেমরাগের তুলনায় একান্ত অকিঞ্চিৎকররূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে।[১৭] পরিপূর্ণ প্রেমরাগ ও মাধুর্যের আস্বাদ পরকীয়াত্বের কারণে একমাত্র ব্রজপ্রেমেই সম্ভব। চৈতন্যচরিতামৃতেও ব্রজলীলার উদ্দেশ্য-বর্ণনায় কৃষ্ণকে তাই বলতে শোনা যায়ঃ

"বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপে গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥"

(॥ ১/৪/২৫-২৭ ॥)

এই পরকীয়াত্বের কারণেই গোপীশ্রেষ্ঠা মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধার প্রেম-রাগ ক্রমোচ্ছ্বসিত হয়ে অসীমের শিখর স্পর্শ করে। তাঁর আস্বাদক্ষেত্রে একদিকে বিরহের সুতীব্র ব্যাকুলতা ও দহনতীব্রতা বিষজ্বালাকেও হার মানায়, অপরদিকে মধুররসের নিত্যবিচিত্র আস্বাদতীব্রতা অমৃতের আস্বাদকেও লজ্জা দান করে। শ্রীরূপ গোস্বামী রাধার সেই রসাস্বাদতীব্রতার অতুলনীয় সীমা

১৭. "রাগোল্লাসবিলঙ্ঘিতার্যপদবীবিশ্রান্তয়োঽপ্যুদ্ধুর,
শ্রদ্ধারজ্যদরুন্ধতীমুখসতীবৃন্দেন বন্দ্যেহিতা।
আরণ্যা অপি মাধুরীপরিমলব্যাক্ষিপ্তলক্ষ্মীশ্রিয়-
স্ত্রৈলোক্যবিলক্ষণা দদতু বঃ কৃষ্ণস্য সখ্যঃ সুখম্॥"

(উ. নী. ॥ শ্রীহরিপ্রিয়া প্রকরণ / ১৮ ॥)

['রাগের প্রাদুর্ভাবে যাঁরা সাধুমার্গের চরম সীমাকে বিলঙ্ঘন করেছেন, সেই অরুন্ধতীপ্রমুখ মহাসতীগণ তথাপি অতি শ্রদ্ধা সহকারে যাঁদের কুঞ্জে অভিসারাদি চেষ্টার শত শত প্রশংসা করেন; বনবাসিনী হলেও মাধুর্যের সাতিশয় বিকাশহেতু যাঁরা লক্ষ্মীর শ্রীকেও একান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করেন,—অতএব যাঁরা সমগ্র ত্রিভুবনে সর্বদা অনুপমা—সেই কৃষ্ণপ্রিয়া সখীগণ (গোপীগণ) তোমাদের সুখবিধান করুন।"].

নির্ণয় করতে গিয়ে এই সত্যকেই অবলম্বন করে অনবদ্য কাব্যমূর্তি নির্মাণ করলেন তাঁর 'বিদগ্ধমাধব'-নাটকে :

"পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা গর্বস্য নির্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।" (॥ ২/১৮ ॥)

অর্থাৎ রাধার আস্বাদক্ষেত্রে প্রেমানুভবের বিষযন্ত্রণা শিশু-কালসর্পের দংশন-জাত বিষযন্ত্রণারও গর্বনাশকারী। আবার সেই প্রেমের মিলনজনিত আনন্দ-ধারার অজস্র বর্ষণ সুধামাধুর্যেরও অহঙ্কার সঙ্কোচনকারী। ফলে প্রেম-রসাস্বাদজনিত রাধার সুখ এবং দুঃখের স্বরূপ কোন উপমার দ্বারাই ব্যক্ত করা যায় না, তা সম্পূর্ণ অতুলনীয়। 'উজ্জ্বলনীলমণি'র দৃষ্টান্তে সে সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শিব-পার্বতী সংবাদে। শ্রীরাধার প্রেমাতিশয্যের স্বরূপ বিষয়ে পার্বতী শিবের কাছে প্রশ্ন করলে শিব সে স্বরূপ-বর্ণনায় আপনার অপারগতার কথা জানিয়ে পার্বতীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

"লোকাতীতমজাণ্ড কোটিগমপি ত্রৈকালিকং যৎ সুখং
দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাম্।
নৈবাভাসতুলাং শিবে! তদপি তদকূটদ্বয়ং রাধিকা-
প্রেমোদ্যৎসুখদুঃখসিন্ধুভবয়োর্বিন্দেত বিন্দোরপি॥"

(॥ স্থায়ি. / ১৭১ ॥)

['লোকাতীত জগতের অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিকাল-ব্যাপী অর্থাৎ ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যাবতীয় সুখ এবং দুঃখ যদি একস্থানে পৃথক পৃথকভাবে স্তূপীকৃত করা হয়, তাহ'লেও হে শিবে, সেই স্তূপীকৃত সুখ-দুঃখ শ্রীরাধার প্রেমসাগর থেকে উত্থিত সুখ-দুঃখ-বিন্দুর লেশাভাসতুল্যও হবে না।']

সুগভীর বিরহবেদনা, কৃষ্ণকর্তৃক প্রত্যাখ্যান, সমাজের কঠোরশাসন, পরকীয়ার বাধা বা কলঙ্কভীতি—কোন কিছুই রাধাপ্রেমের গতিরোধ করতে পারে না। বরং এ সকল বাধার অভিঘাতে ক্রমগভীর হয়ে সে প্রেমবোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে, যা কোন প্রয়াসেই নিবারণ করা যায় না। চণ্ডীদাসের রচনায় "পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো···" কিংবা "যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে···" ইত্যাদি পদে সে পরিচয় রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

(দ্রঃ বৈ. প. ॥ ৫/১, ৮/২ প্রভৃতি ॥)। কবি কালিদাসও প্রেমের এই স্বরূপটিকে চিহ্নিত করে গেছেন তাঁর 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকে :

"নদ্যা ইব প্রবাহো বিষমশিলাসঙ্কটস্খলিতবেগঃ।
বিস্মিত সমাগম সুখো মনসিশয়ঃ শতগুণো ভবতি ॥" (॥ ৩/৮ ॥)

['শিলাপতনে স্খলিতবেগ নদীর প্রবাহের মতই বিরহের বাধায় প্রেম ও মিলনসুখ মানসক্ষেত্রে শতগুণে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।']

সাধককে কঠিন দুঃখে নিমগ্ন রেখে ঈশ্বর যদি সুখ পান, তবে ঈশ্বরকে সেই সুখ দানেই বৈষ্ণব সাধক ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ কোন প্রতিকূলতাই সাধকের প্রেমকে বিনষ্ট করতে পারে না, বরং তা প্রেমোৎকর্ষের সূচক বলে সাধকের পরম উল্লাসের কারণ হয়। বৈষ্ণব সাধনায় প্রেমের আদর্শ বিচার করতে গিয়ে সে কথা স্পষ্ট করে তুলেছেন শ্রীরূপ গোস্বামী :

"সর্বদা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥"
(উ. নী. ॥ স্থায়ি./৬৩ ॥)

একমাত্র মহাভাবের আদর্শ ব্যতীত অন্যত্র এরূপ প্রেম সম্ভব নয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে, দর্শনে, সাধনায় তাই স্থায়ী বিপ্রলম্ভাদর্শ, পরকীয়াত্ব প্রভৃতি পরম সমাদরে গৃহীত হয়েছে প্রেমের পূর্ণ বিকাশসাধনের জন্য। রাধার প্রেম তাই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তুলনারহিত। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় তার পরিচয় সখি-সম্বোধনে রাধার উক্তিতে পূর্বেই পেয়েছি (দ্রঃ পৃ. ১৭), কবির উক্তিতেও সে প্রেমস্বরূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নিম্নোদ্ধৃত অংশে :

"নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য গোপীভাববর্য ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ-বাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥"
(চৈ. চ. ॥ ২/৮/১৭৫-'৭৬ ॥)

এই গোপীভাবেরই সর্বোচ্চ বিকাশ মহাভাবসাধিকা রাধায়, তাই তার আনন্দ ও বেদনা উভয়েরই সীমা নির্ধারণ কিংবা সাদৃশ্যের অনুসন্ধান সম্পূর্ণ বৃথা,

কেননা—"ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা।"—যা পূর্বের শিব-পার্বতী সংবাদ প্রভৃতি দৃষ্টান্তসমূহে ধরা পড়েছে।

বাস্তবিক ধর্মসাধনার জগতে এরূপ সাধনার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখা যায় না। খ্রীষ্টীয় মিষ্টিক সাধনা, সূফী সাধনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সাধন লক্ষ্যের পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে সে সকল সাধনার মুক্তিপিপাসু সাধক-সাধিকাদের সঙ্গে মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধাকে কখনই তুলনা করা চলে না। যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবকে খ্রীষ্টধর্মানুরাগীরা স্পষ্টতঃই দেখেছেন ঈশ্বর ও মানুষের মিলনসাধকরূপে :

"He (Jesus Christ) died to restore man to God."
(This Jesus/p. 89)

এমন কি সূফী প্রেমসাধনার উচ্চতর বিবর্তনে যে পঞ্জাবী সূফী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে,—যেখানে প্রেমের পরম আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর মত তিনটি প্রেমকাহিনী গড়ে উঠেছে—হীর-রাঝাঁ, সস্‌সী-পুন্নু এবং সোহনী-মহীবাল কাহিনী, সেগুলিতে বিরহবেদনাদগ্ধ প্রেমের এক অসামান্য উজ্জ্বল রূপ পরিস্ফুট হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কাহিনীগুলির প্রতিটির ক্ষেত্রেই পরিণতি ঘটেছে মৃত্যুর পর নায়কের সঙ্গে নায়িকার অখণ্ড মিলনে, সাধনার ক্ষেত্রে যা অদ্বয় মুক্তিরই দ্যোতক। বৈষ্ণবসাহিত্যের রাধার মত অনন্ত বিরহদহনদগ্ধ প্রেমানুভূতির প্রকাশ সে তিনটির কোনটিতেই ঘটেনি। পঞ্জাবী সূফীকবি-সম্পর্কিত গবেষণায় গবেষক শ্রীলাজবন্তী রামকৃষ্ণের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটুকু স্মরণীয় :

> "In all the three, the heroines, Hir, Sassi, and Sohni, who spent their lives in sorrow, always yearning to meet their respective lovers, were united with them in death," (Panjabi Sufi Poets : Lajwanti Ramakrishna/p. Introduction xxi.)

নানাভাবে বিবর্তিত হয়ে সূফী সাধনা আরব থেকে গ্রীস-মেসোপটেমিয়া-ইরাণ-পারস্য-পাকিস্তান-ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানাদেশে প্রসারিত হলেও সে সাধনার সর্বস্তরেই সাধনলক্ষ্যে দ্বৈতত্বের অবসান এবং ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সকল

সময়েই জীবের সঙ্গে বহুত্বহীন একত্ব বা অদ্বিতীয়ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। সূফী-সাধনার ঈশ্বর সম্বন্ধে তাই সূফীতত্ত্ববিদ ডঃ রমা চৌধুরীর মন্তব্য :

> "He is One, and no plurality can ever enter in Him. (Sufism and Vedanta, Part-II/p. 154.)

আড়বার-সাধিকাশ্রেষ্ঠা আণ্ডালের ক্ষেত্রেও দেখেছি তাঁর মধুররসসাধনার পরিণতি ঘটেছে শ্রীরঙ্গনাথের সঙ্গে চিরমিলনে অর্থাৎ মুক্তিতে; দেখেছি কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ-এর পরিণতিও সেইরূপ। কিন্তু রাধার প্রেমসাধনার পরিণতি ঘটেছে মুক্তিহীন, কৃষ্ণের বাস্তব-সাহচর্যহীন চিরবিচ্ছেদের অসীম দহনে, সেখানে তাঁর অনুভবজগতে 'নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য';—অসীম বৈচিত্র্যে মণ্ডিত নিত্য-প্রেমের প্রতিষ্ঠা। এই মহাভাবের প্রেমগৌরবেই শ্রীরাধা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠা সাধিকা,—'সাধিকা-শিরোমণি'। তাই শ্রীরাধাকে বাদ দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কোন অস্তিত্বই থাকে না, রাধাই এ ধর্মের মুখ্য এবং একমাত্র অবলম্বন।

বিধিমার্গের সমস্ত আচারকৃত্যবর্জিত রাধার এই রাগময় প্রেমের আশ্রয় গ্রহণই বৈষ্ণব সাধনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে। শ্রীচৈতন্যের সাধন দৃষ্টান্তে ভক্তির ক্ষেত্রে সেই প্রেমাদর্শই প্রতিফলিত হয়ে তাঁর এরূপ সর্বাত্মক গৌরবের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। চৈতন্যজীবনে এরূপ কৃষ্ণপ্রেম-বিরহার্তির প্রথম প্রকাশ ঘটে সন্ন্যাসজীবনের পূর্বে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে গয়াধাম গমনের পর,[১৮] এবং সে প্রেমার্তির সর্বাত্মক বিকাশ শেষ বারো বছরের দিব্যোন্মাদ দশায়। চৈতন্য-প্রত্যক্ষদর্শীদের রচনাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর সেই রাগাত্মিক প্রেমসাধনার স্বরূপটি,—যেখানে স্নান-আহারাদি

১৮. কবি বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা স্মরণীয় :

কথোদিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি ॥
... ...
যে প্রভু আছিলা অতি-পরম-গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির ॥
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চস্বরে :
ভাসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে ॥" (॥ আদি/১২শ অধ্যায় ॥)

সাধারণ জীবনাচরণ ও হরিনাম-প্রণামাদি সাধনকৃত্য সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে কৃষ্ণবিরহার্তিজনিত ক্রন্দন ও অসীম ব্যাকুলতা তাঁর একমাত্র সাধনা-চরণে পরিণত হয়েছে।[১৯] চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে বিশেষতঃ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে আটটি পরিচ্ছেদ জুড়ে চৈতন্যদেবের সেই কৃষ্ণবিরহার্তি ও দিব্যোন্মাদ স্বরূপের সুবিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাধাপ্রেমমহিমার আলোচনায় কৃষ্ণমাধুর্যসাধনার পরিণতি সম্পর্কে কাব্যের প্রায় আদিতে কবিরাজ গোস্বামী যে কথা লিখেছিলেন :

"এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে ॥" (চৈ. চ. ॥১/৪/১৩০ ॥)

চৈতন্যসাধনায় সেই পরিণতি সর্বাধিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অন্ত্যখণ্ডে। দু' একটি দৃষ্টান্ত :

"কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়
এইরূপে রাত্রি দিন যায় ॥" (॥ ৩/১৬/১৪০ ॥)

অথবা : "সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥" (॥ ৩/১৯/২৯-৩০ ॥)

দিব্যোন্মাদ দশার দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যাপীই শ্রীচৈতন্যের এরূপ—

"আত্মস্ফূর্তি নাহি রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ॥ (॥ ৩/১৫/৩ ॥)

কিংবা : "উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যে বলে যে করে সব উন্মাদ লক্ষণ ॥ (॥ ৩/১৯/৬২ ॥)

কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-প্রত্যক্ষদর্শী কবি না হলেও এ সকল বর্ণনার কোনটিই কাল্পনিক নয়, কেননা প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখ থেকে শ্রবণ করেই তিনি এ সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট স্বীকৃতিও জানিয়ে গেছেন :

"লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোরত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্ ॥" (চৈ. চ. ॥৩/১৭/১॥)

---

১৯. দ্রঃ চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকং : কবি-কর্ণপুর ॥ ১০/৩৮ ॥

গয়াধামের জীবন থেকে নীলাচলধামের জীবন পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল (প্রায় ২৬ বৎসর) পার্শ্বচর শিষ্যমণ্ডলী ও অসংখ্য সাধারণ মানুষের চোখে শ্রীচৈতন্য-দেবের উত্তরোত্তর গভীরতাপ্রাপ্ত কৃষ্ণপ্রেম-বিরহের সাধনাই পরিশেষে শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী স্বরূপটিকে তাঁর সাধকজীবনের সঙ্গে একাত্ম করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাই সেদিন রাধাপ্রেমসর্বস্ব বৈষ্ণব সাধনার ধারাটি বিপুল সমাদরের সঙ্গে প্রায় সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর পূর্ব যুগের নানা আচারজীর্ণ, সংস্কারান্ধ, সকাম ও মুক্তিসন্ধানী ধর্মাদর্শগুলি যেন পূর্ণিমার আকাশে পূর্ণচন্দ্রের পাশে নিষ্প্রভ তারকামণ্ডলীর মতই প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। বলাই বাহুল্য, রাধাপ্রেমাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মই হ'ল সেই পূর্ণচন্দ্র। তাই অনায়াসেই একথা উচ্চারণ করা চলে—ভক্তিসাধনার বিকাশধারায় রাগাত্মিক মহাভাবের প্রেমাদর্শ তথা শ্রীরাধার প্রেমাদর্শই সে সাধনা ও তার বিবর্তনের পরম ও শেষ কথা।

॥ গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার ॥

ঈশ্বর-সাধনার মূল কথা হ'ল রসের সাধনা,—যা আস্বাদক্ষেত্রে অশেষ সৌন্দর্যে-মাধুর্যে-আনন্দে সাধকের চিত্তকে অভিভূত করে রাখে। আর এ কারণেই ঈশ্বর-সাধনার নানা পথ বা পদ্ধতির মধ্যে সবথেকে বেশী বরণীয় হয়ে উঠেছে ভক্তির পথ। রসের পরম আশ্রয় ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত সহজ অনুরাগই হ'ল ভক্তি, তা "সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্।" (নারদীয় ভক্তিসূত্র ॥ ৫৪ ॥), অর্থাৎ অন্তরজগতে সূক্ষ্মতর অনুভবস্বরূপ। ভক্তি তাই পূজা-হোম-যজ্ঞাদি কোন ক্রিয়াকলাপ, ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে কোনপ্রকার ধ্যান-ধারণা বা শাস্ত্রজ্ঞান, কিংবা অন্য কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। সমস্ত বিধিবদ্ধ আচারকৃত্যের জটিলতা থেকে মুক্ত অন্তরের এরূপ সহজ উপলব্ধিই ভক্তির আসল রূপ,—সকল সাধনপথেরও সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অনুভব-তন্ময় রসবিভোর সাধকের কণ্ঠে তাই সহজ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে ঃ

"উত্তমা সহজাবস্থা দ্বিতীয়া ধ্যানধারণা।
তৃতীয়া প্রতিমাপূজা হোমযাত্রা চতুর্থিকা ॥"

রসপূর্ণ ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগেই মনের সেই সহজাবস্থায় উত্তরণ ঘটে। অনুরাগ-তীব্রতায় সেই রসের আস্বাদে পরিপূর্ণ বিভোর হতে পারলে পুত্র-মিত্র-আত্মীয়পরিজন, বিত্ত-ভোগবিলাস-বিষয়সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কিছু অপেক্ষাও গভীরতর মমতায় একান্ত প্রিয়ত্ববোধে সাধকের অন্তরাত্মার সঙ্গে রসময় ঈশ্বর একাকার হয়ে ওঠেন। সে অবস্থায় "তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।" (না. ভ. ॥ ৪১ ॥), অর্থাৎ ভগবান ও সাধকের আত্মায় অনুভবজগতে কোন ভেদ থাকে না; কেননা—"তস্মিন্নন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ।" (ঐ ॥ ৯ ॥),—ঈশ্বরের প্রতি অনন্য অনুরাগ অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি সাধককে উদাসীন করে তোলে। ঈশ্বরপ্রাপ্তির কিংবা ঈশ্বরের মাধুর্যময় রসসম্ভোগের এ অপেক্ষা গভীরতর আদর্শ আর কিছু হতে পারে না। তাই ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি উচ্চারিত বাক্যে স্বয়ং ভগবানের কণ্ঠেই স্বীকৃত হয়েছে বিভিন্ন সাধনমার্গের মধ্যে ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব-মর্যাদার কথা ঃ

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥" (ভা॰ ॥ ১১/১৪/২০ ॥)

ভক্তিসাধনার বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'ল রাগমার্গের প্রেমসাধনা এবং সে প্রেমমার্গের মধ্যেও আবার সর্বাধিক প্রেমানুভূতির বিকাশ ঘটে শৃঙ্গার বা মধুররসের সাধনায়। তাই বিশ্বের ভক্তিসাহিত্য রচনার ইতিহাসে মধুররসের প্রেমসম্পর্কের স্থাপনা সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভগবৎ-সাধনার অন্যতম অবলম্বন। খ্রীষ্টীয় ও ইসলামধর্মী মিষ্টিক সাহিত্য, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সূফী-সাধনসাহিত্য, তামিলভাষায় রচিত আড়বার ভক্তিসাহিত্য ('নাল্-আয়ির্ দিব্যপ্রবন্ধম্' অর্থাৎ চার হাজার দিব্যসঙ্গীত), হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্মভিত্তিক রাগমার্গীয় তন্ত্রসাহিত্য, বিষ্ণু-ভাগবতাদি পুরাণসাহিত্য প্রভৃতির দৃষ্টান্তে মধুররসাত্মক প্রেমকে ভগবৎ-সাধনার মুখ্য অবলম্বনরূপে গৃহীত হতে দেখা যায়। কিন্তু এই ইতিহাসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রেমানুভূতির যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা অদ্বিতীয়। সে আদর্শকে এক কথায় বলা চলে বিবর্তনের শেষ সীমা। আর এই অনন্যতা তার সাধ্য বা সাধনলক্ষ্যের কারণে যা অন্যান্য সমস্ত প্রেমসাধনার ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য হয়েছে। সে সকল ক্ষেত্রে সাধক যেখানে পরিণতিতে সাধ্য বা সাধনলক্ষ্য মুক্তিতে রসিক-সত্তার বিলোপ ঘটিয়ে রসাধার ব্রহ্মসাযুজ্যলাভে সে প্রেমসাধনার অবসান ঘটিয়েছেন, গৌড়ীয় সাধনা সেক্ষেত্রে সেই প্রেমানুভবকেই চিরস্থায়ী করে তুলেছে মুক্তিস্পৃহাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে। কেননা, ব্রহ্মসাযুজ্যে দ্বৈতসত্তার অভাবে ভক্তি বা প্রেমের কোন অস্তিত্বই আর থাকে না। তাই গৌড়ীয় সাধকের কাছে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের ধর্মই হ'ল তা অশেষ, তা প্রতি মুহূর্তে নবনবায়মান, যা অন্তরে সর্বদা অনুভূত পরম প্রিয়স্বরূপ ঈশ্বরকেও অননুভূতবৎ প্রতীয়মান করায় এবং ফলে প্রতি মুহূর্তের আস্বাদকে নূতনত্ব দান করে অশেষ বৈচিত্র্যে ভরিয়ে তোলে। অনুরাগের বৈশিষ্ট্য-নিরূপণে একমাত্র এরূপ আদর্শ ই গৃহীত হয়েছে বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রে :

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবং সোঽনুরাগ ইতীর্যতে॥"
(উজ্জ্বলনীলমণি ॥ স্থায়িভাবপ্রকরণ/১৪৬ ॥)

বৈষ্ণব রসসাহিত্যেও অনুরাগের এ আদর্শ ই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কবিবল্লভের পদে শ্রীরাধার কণ্ঠে :

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥" (বৈষ্ণব পদাবলী ॥৫/২২॥)

বলাই বাহুল্য, বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের প্রেমসাধনা—যেখানে অনুরাগের লক্ষ্যে মুক্তিই একমাত্র কাম্য, সেখানে 'তিলে তিলে নূতন' এরূপ অনুরাগের লক্ষ্যে পুনরায় অশেষ অনুরাগ অর্জনের সাধনদৃষ্টান্তের অনুসন্ধান বৃথা।[১]

এমনকি গৌড়ীয় ভক্তি-আদর্শের গৌরবসৃষ্টিতে সর্বাধিক অনুসৃত হয়েছে ভাগবতপুরাণবর্ণিত যে ব্রজগোপীগণের রাগাত্মিক প্রেমের আদর্শ, ভাগবতে তাও কিন্তু পরিসমাপ্ত হয়েছে গোপীগণের মৃত্যুর পর কৃষ্ণসাযুজ্য মুক্তিলাভে, —শ্রীশুকদেবের নিম্নোক্ত বাক্যে সে ইঙ্গিত স্পষ্ট :

"অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্ত-জাবকোশাস্তমধ্যগন্॥" (ভা° ॥ ১০/৮২/৪৭ ॥)

["গোপীগণ এইরূপ অধ্যাত্মশিক্ষা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া তাঁহার ধ্যানের দ্বারা লিঙ্গশরীর বিধ্বস্ত হওয়ায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনুবাদ : কাশীরাজ সভাপণ্ডিত শ্যামাকান্ত তর্ক-পঞ্চানন।]

কিন্তু গৌড়ীয় সাধনায় সাধন ও তার পরিণতি অর্থাৎ সাধ্য—দুইই প্রেমের নিত্যরক্ষণে, অর্থাৎ মুক্তিস্পৃহা বর্জিত হওয়ায় এক্ষেত্রে প্রেমের কখনই অবসান ঘটে না। আর সে কারণেই এ সাধনা ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে বাহ্যতঃ নিত্য-

---

১. প্রাক্-চৈতন্যযুগে ভক্তি ও আদর্শ যে একেবারে অননুভূত ছিল তা নয় ; যেমন 'নারদীয় ভক্তিসূত্রে' ভক্তিকে অনির্বচনীয় পরম প্রেমস্বরূপ জ্ঞান করা হয়েছে। (দ্রঃ ২, ৫১) এবং প্রেমের আদর্শ ব্যাখ্যায় লিখিত হয়েছে :

"(প্রাকৃত-) গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং
সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্।" (॥ ৫৪ ॥)

কিন্তু প্রেমসাধনার ক্ষেত্রে একমাত্র গৌড়ীয় সাধনা ব্যতীত অন্য কোথাও সে আদর্শ অনুসৃত হয় নি।

বিচ্ছিন্নতার বা বিপ্রলম্ভের সাধনা। মিলনে প্রেমানুভূতির অবসান ঘটে, কিন্তু বিপ্রলম্ভ বা বিরহ সে অনুভূতিকে প্রগাঢ় করে তোলে। তাই এঁদের পরম পুরুষার্থ প্রেমের সাধনক্ষেত্রে মিলন বা মোক্ষের কোন স্থান নেই। তাই মুক্তিজনিত ব্রহ্মানন্দের মধ্যে এঁরা প্রেমভক্তির কণামাত্র অংশেরও আস্বাদ পান না।[২] প্রেমসাধনায় বিন্দুমাত্র আত্মসুখের কামনাকেও এঁরা প্রেমের আদর্শবিরোধী জ্ঞান করেন। এঁদের সাধনায় প্রেম তাই সম্পূর্ণ অকৈতব, যা জাগতিক প্রেমের দৃষ্টান্তে কোথাও দেখা যায় না। বহু শতাব্দী পূর্বে হাল-বিরচিত 'গাথা সপ্তশতী'র জনৈক নায়িকা উচ্চারণ করেছিলেন :

"কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণত্থি ব্বিঅ মামি মানুসে লোএ" (॥ ২/৪ ॥)

অর্থাৎ কৈতবশূন্য প্রেম মানবজগতে কোথাও মেলে না, অর্থাৎ তা অ-পার্থিব। সেই অ-পার্থিব অকৈতব প্রেমাদর্শই পার্থিব জগতের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে সর্বপ্রথম মূর্ত হয়ে ওঠে শ্রীচৈতন্যদেবের রাগনিষ্ঠ প্রেমভক্তির সাধনায়,—যা গৌড়ীয় সাধনা, সাহিত্য ও দর্শনের কেন্দ্রমণি মহাভাবসাধিকা রাধার অদ্বিতীয় প্রেমাদর্শ প্রতিষ্ঠার মূল উৎস। সর্বক্ষেত্রে সেই কৈতবশূন্য প্রেমই একমাত্র আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়ে গড়ে তুলেছে গৌড়ীয়-সাধনার ক্ষেত্রে রাগনিষ্ঠ প্রেমভক্তি, বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ-লীলাকাহিনী এবং দর্শনজগতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রিয় কিংবা কোনপ্রকার আত্মসুখের সঙ্গেই এ প্রেমের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে তাই বলা হয়েছে :

"ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ।" (॥ ৩/২০/৫৩ ॥)

বৈষ্ণব সাধনায় এরূপ প্রেমাদর্শের পূর্ণাঙ্গ সঞ্চার ও ব্যাপ্তি যদিও শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে গৌড়ীয় বা চৈতন্যোত্তর যুগেরই পরম সম্পদে পরিণত হয়েছে, তাহলেও শ্রীচৈতন্যের মতাদর্শ ও সাধনায় পুষ্ট নির্মল ও নিরুপাধি বিপ্রলম্ভাত্মক প্রেমাদর্শের পূর্বাভাস প্রাক্-চৈতন্যযুগীয় ধর্মসাহিত্যের মুষ্টিমেয় কোন কোন কবির রচনায় দেখা যায়। এঁদের মধ্যে পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, প্রাক্-চৈতন্য যুগের

২. দ্রঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥ ১/১/৩৮ ॥

পদাবলী ও অন্যান্য সাহিত্যে বিরহের গভীরতা ও সর্বাত্মক ব্যাপ্তি একমাত্র চণ্ডীদাস-পদাবলীরই প্রাণসম্পদ। প্রাক্-গৌড়ীয় যুগে রচিত হলেও চণ্ডীদাস-পদাবলীর গৌড়ীয় আদর্শানুগ নিত্য-বিরহগভীর ভাবসুষমার পরিচয় ও অখণ্ড অতীন্দ্রিয়-প্রেমরসানুভূতির গভীরতা ও ব্যাপ্তি আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। শ্রীচৈতন্যদেবের সাধনায় ও প্রেমভক্তির আদর্শ-সম্পর্কিত মতাদর্শ গঠনে প্রভাববিস্তার ক্ষেত্রে শ্রুতি-স্মৃতির সঙ্গে চৈতন্যপূর্ব প্রেমভক্তিসাহিত্যের কবিগণ কিছু না কিছু অবদান রেখে গেছেন সন্দেহ নেই,—চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁদের উল্লেখও করে গেছেন নিম্নোদ্ধৃত অংশে :

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।"

পদাবলীর কবি মৈথিলকোকিল বিদ্যাপতি, 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের স্রষ্টা ও প্রেমবিলাসবিবর্তবাদের গীত রচনাকারী রায়রামানন্দ, 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যের রচয়িতা লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল, 'গীতগোবিন্দে'র স্রষ্টা কবি জয়দেব প্রভৃতি প্রাক্-চৈতন্য বা চৈতন্যসমসাময়িক কবিগণ চৈতন্যোত্তর কালের সমৃদ্ধিঘন বৈষ্ণবসাহিত্যের পুষ্টিবিধানে নানাভাবে অল্পবিস্তর সহায়তা করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কবি চণ্ডীদাসের কাছে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এবং গৌড়ীয় কবি-দার্শনিক-সাধকগণ যতখানি ঋণী, প্রাক্‌চৈতন্যযুগের আর কোন কবির কাছে ততখানি নয়। এ ঋণ বহিরঙ্গের শিল্পকলা বা মণ্ডননৈপুণ্যের জন্য নয়, সে ক্ষেত্রটিতে কবি জয়দেব এবং 'অভিনব জয়দেব'—কবি বিদ্যাপতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হৃদয়ের গভীরে যে অনুভূতিতন্ময় নিত্য-বিরহাতুর প্রেমগভীরতা গৌড়ীয় সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-সাধনার সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, চণ্ডীদাস সেই তন্ময় অনুভূতি-জগতের কবি। চণ্ডীদাসের কাছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ঋণ সর্বস্তরে সঞ্চারিত সেই প্রাণসম্পদের জন্য। পদাবলীর সর্বত্র কবি চণ্ডীদাসের রাধা বিরহদীর্ণ প্রেমানুভূতির তন্ময়তায় বাহ্যচেতনাহীন গভীর ধ্যানে বিভোরা, যা বাহ্যজ্ঞানহীন দিব্যোন্মত্ত দশায় শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ-আচরণে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাই নিঃসঙ্কোচে মন্তব্য করতে পেরেছিলেন :

"...before Chaitanya was born, Chandi Das has felt his love, and lifted to the plain from which he

had already visions of his God.....The advent of Chaitanya is presaged in the account of Chandi Das gives of Radha as prostrating herself at the feet of every one who speaks of Krishna." (Chaitanya & His Age / p. 29, C. U. / 1922)

শুধু "যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।"—আচরণটুকুই নয়, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী রাধার সমস্ত ব্যাকুলতা, আর্তি, বিরহদহন, মিলনস্মৃতিই কৃষ্ণপ্রেমবিবশ শ্রীচৈতন্যে প্রতিফলিত হয়ে পদাবলী সাহিত্যে সংযোজন করেছে অভিনব 'গৌরচন্দ্রিকা' পদের বিপুল রসভাণ্ডার।

চণ্ডীদাস-পদাবলী আদ্যন্তই বিরহের পদাবলী। প্রেমের সূচনাকাল পূর্বরাগ-পর্যায় থেকেই চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়, কৃষ্ণবিরহে মৌন-গভীর, তদ্গতপ্রাণ। কবি বিদ্যাপতির রাধা সেখানে বয়ঃসন্ধিকালের দেহ-সচেতনতা ও যৌবনচাঞ্চল্যে উচ্ছল :

"খনে খনে নয়নকোণ অনুসরঈ।
খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ॥
খনে খনে দসনছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥"

(বিদ্যাপতি : সম্পাদনা—বিদ্যাভূষণ ও মিত্র॥ পদ সংখ্যা-৫৪॥)

বিদ্যাপতির পূর্বরাগের রাধা প্রগল্‌ভা ও যৌবন-মদগর্বে গর্বিতা। সে গর্বে আপনাকে পসারিণী ইঙ্গিত করতেও রাধা দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি বিদ্যাপতির পদে। অসঙ্কোচে সে তাই আপনার যৌবন সম্বন্ধে এমন ইঙ্গিতও করতে পেরেছে :

"সগর সঁসারক সারে।
অছয়ে সুরতরস হমর পসারে॥"

অর্থাৎ সংসারের সার সুরতরস রাধার পসরা। কৃষ্ণ সে রস পান করে গেলে রাধার আক্ষেপ :

"বিকলএ গেলিহু রতন অমোল।
চিহ্নি করি বাণিকে ঘটাওল মোল॥"

পূর্বরাগ-পর্যায়ে মদগর্বিতা শরীরী রাধার এ ধরণের প্রগল্‌ভ ইন্দ্রিয়চেতনাতুর

অশালীন উক্তি বিদ্যাপতির পদাবলীতে অজস্র,—যা তাঁর রাধাকে বৈষ্ণব কাব্যের আধ্যাত্মিক নায়িকা হিসাবে মর্যাদা দিতে সংশয় জাগায়। এমনকি ভাবোল্লাসপর্যায়েও বিদ্যাপতির রাধা ইন্দ্রিয়বিলাস থেকে মুক্ত হতে পারেননি। দু' একটি বিরলব্যতিক্রম অংশে ধ্যানগভীর অন্তরজগতে রাধা কৃষ্ণানুভবের গৌরবে অতীন্দ্রিয় প্রেমের সীমা স্পর্শ করেছেন বলে মনে হয় বটে, কিন্তু সে গৌরবদানের ঠিক পরমুহূর্তেই দেখা যায় ইন্দ্রিয়াতুর দেহচিন্তার উন্মেষ তাকে সে মর্যাদালাভের যোগ্যতা থেকে দূরে অপসারিত করেছে। যেমন "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ···"(বৈ. প. ॥ ১৩/৪ ॥) পদটির :

"সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥"

অংশটিতে ইন্দ্রিয়-বিজয়িনী রাধার মদনের প্রতি স্পর্ধিত উক্তিতে প্রেম-গৌরবের শিখরস্পর্শী অনবদ্য রূপ ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ অংশের ঠিক পরমুহূর্তেই সে রূপ থেকে তার সম্পূর্ণ বিচ্যুতি ঘটে ইন্দ্রিয়লিপ্সার সর্বাত্মক উন্মেষে যখন তিনি পূর্বানুভূতির গৌরব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে উচ্চারণ করেন :

"অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।"

এরূপ বিলাসচাতুর্য ও ইন্দ্রিয়চাপল্য রাজসভার কবি জয়দেবের কাব্যেও একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে। স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেব ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট অভিমতই জ্ঞাপন করেছিলেন :

> "জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী।··· জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ;···ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব।" (বিবিধ প্রবন্ধ / বিদ্যাপতি ও জয়দেব।)

আর 'গীতগোবিন্দ'-কাব্যের এই বিলাসপূর্ণতার কথা কবি জয়দেব নিজেও

অস্বীকার করেননি। কাব্যের প্রথম সর্গেই তাঁর কাব্যপাঠের যথার্থ অধিকারী-চিহ্নিতকরণের মধ্যে কবির সে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি স্পষ্ট :

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥" (গীতগোবিন্দ ॥ ১/৩ ॥)

প্রাক্-গৌড়ীয় যুগে কবি বড়ুচণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রেমাদর্শও স্থূল ইন্দ্রিয়পরতা ও ভোগাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। কিছুটা ব্যতিক্রম হিসাবে কাব্যের শেষ খণ্ডিত সর্গ 'অথ রাধাবিরহঃ' অংশে আপাতদৃষ্টিতে চৈতন্যপ্রভাবিত পদাবলী-সাহিত্যের মত বিরহচেতনার কাব্যময় প্রকাশ দেখা গেলেও তা কিন্তু আদ্যন্তই সম্ভোগস্পৃহায় পূর্ণ। আর অবশিষ্ট বারোটি সর্গ জুড়ে অমার্জিত রুচি ও বিলাসকলার পদাঙ্ক অনুসরণে কাব্যটি জয়দেব-বর্ণিত প্রেমাদর্শের ধারাতেই বিবেচ্য হয়ে গীতগোবিন্দেরই সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে। বরং তুলনায় 'গীতগোবিন্দ' এ কাব্য অপেক্ষা অনেক উন্নত রুচির বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। এমনকি একান্ত লৌকিক ও স্থূলরুচির 'ধামালী'-জাতীয় গানের চরম বিকাশও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যে কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছেন।[৩] তাছাড়া যে 'অথ রাধাবিরহঃ' এবং কিছুটা তার পূর্ববর্তী "বংশীখণ্ড" সর্গ দু'টিতে পদাবলীর রাধার মত প্রেমানুভবের সূচনা ঘটেছে বলে মনে হয়, সেখানেও কিন্তু রাধার ইন্দ্রিয়-পিপাসার অজস্র বিস্তার আমাদের প্রতিমুহূর্তে ব্যথিত করে। কৃষ্ণের মথুরা-গমনের পর বড়ায়ির প্রতি আবেদনে রাধার প্রবল মদনার্তিই রাধাবিরহ-সর্গের যেন মূল এবং মুখ্য-ভাবনায় পরিণত হয়েছে। যেমন :

"ঝাঁট করা কাহ্নাঞি আনাওঁ।
রতী সুখেঁ রজনী পোহাওঁ॥
... ...
আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ নারোঁ মনমথবাণ॥

৩. দ্রঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা : তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পৃ. ৪৩২

... ...

উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞি না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ॥" ইত্যাদি।
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন / পৃ. যথাক্রমে ২৬৩, ২৬৭, ২৮২)

তাই নিরপেক্ষ সমালোচকগণ বলতে দ্বিধা করেননি :

"বড়ুর বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের মধ্যেও মনের চেয়ে দেহ বড়।"
(চণ্ডীদাসের পদাবলী : বিমানবিহারী মজুমদার, পৃ. ভূমিকা/৫১.)

এই প্রেক্ষাপটে অতীন্দ্রিয় প্রেম ও বিরহ-নিবিড়তার কবি চণ্ডীদাসের তিলোত্তমা প্রতিভার ভাস্বররূপ অতি সহজেই প্রকট হয়ে ওঠে। কবি বিদ্যাপতি-জয়দেব-বড়ুচণ্ডীদাসের মত কবি চণ্ডীদাসের রাধাও প্রাক্-চৈতন্য-যুগের, কিন্তু রূপে ও রসে কত স্বতন্ত্র। চণ্ডীদাসের রাধা আদ্যন্ত বিরহের তপশ্চারিণী সাধিকা। যৌবনের উচ্ছলতা, মদমত্ততা, দেহগর্ব তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। আত্মেন্দ্রিয় বাসনামুক্ত এ রাধা পূর্বরাগেই কৃষ্ণপ্রেমে ধ্যানী, বিবশহৃদয়া :

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধিয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ানতারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥" (চণ্ডীদাসের পদাবলী ॥৬॥)

চণ্ডীদাসের পদে গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের মত পূর্বরাগেই শ্রীরাধার বিরহের সূচনা। সে বিরহে রাধা বিভোর, বিবশ ; ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের সামান্যতম পরিচয়ও সেখানে নেই। কবির বর্ণনায় :

"অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।
বুঝি অনুমানি কালারূপখানি
তোমারে করিল ভোরে॥" (ঐ ॥ ৪ ॥)

মদনের প্রসঙ্গ যে কবি চণ্ডীদাসের পদে নেই তা নয়। কৃষ্ণের—

"দুইটি লোচন মদনের বাণ
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায় ধরমে
পরাণ সহিতে টানে॥" (ঐ॥ ৭॥)

কিন্তু সে কৃষ্ণনয়ন রাধার দেহচাঞ্চল্য জাগায় না, তার সমগ্র প্রাণ-মনকে পরম রসে আকৃষ্ট করে; লজ্জা, কুলধর্ম, সমাজ প্রভৃতি সব কিছু সম্বন্ধে অসারতা-জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। শ্রীকৃষ্ণের রূপসৌন্দর্য রাধার মনে বিদ্যাপতির পদের মত মদনজ্বালা বাড়ায় না, প্রাণের ভিতর সে রূপমাধুরী অক্ষয় হয়ে থাকে:

"সই, কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতর কাটিয়া পাঁজর
মরমে রহিল পশি॥" (ঐ॥ ১০॥)

পূর্বরাগেই কৃষ্ণবিরহের গভীর অনুভবে রাধার শয়নে-স্বপ্নে-গৃহকর্ম আচরণে নিত্য কৃষ্ণ-বিস্ফূর্তি ঘটে:

"তোমরা কি আর বুঝাও ধরম।
শয়নে স্বপনে দেখি সে কালা-বরণ॥" (ঐ॥ ১৯॥)

কারণ, প্রেমমুগ্ধা এ রাধার কৃষ্ণচিন্তা নিরবধি:

"নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে॥" (ঐ॥ ২১॥)

কিংবা: "সদাই জাগে মনে সে কালো বরণ
হাম কি করব ইবে।" (ঐ॥ ১৯॥)

কবি বিদ্যাপতির জাতি-কুলসচেতন রাধা কৃষ্ণকলঙ্কভয়ে, নানা অনুশাসন বদ্ধ, সঙ্কীর্ণ সমাজ মানসিকতায় সব সময়েই কাতরা, কিন্তু কবি চণ্ডীদাসের রাধার কাছে কৃষ্ণই একমাত্র জাতি-কুল হিসাবে বিবেচ্য হয়েছে, ফলে কলঙ্কভয় তাঁকে পীড়িত করে না। তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন:

"যা বিনে যাহার না রহে জীবন
সেই তার কুল জাতি॥
যাউক কুরব দেশে দেশে সব
তাহাতে বান্ধাছি বুক।" (ঐ॥ ২২॥)

বরং অনায়াসে সে কলঙ্ককে রাধা করে নিতে পেরেছেন দেহমনের পরম আভরণস্বরূপ :

"এ সব কলঙ্ক মলয় পঙ্কজ
হিয়াতে রাখিয়া নিলু।" (ঐ ॥ ৬৩ ॥)

কলঙ্কভীতিও একপ্রকার উপাধি, আত্মসচেতন-সমাজসচেতন একপ্রকার মানসিক অবস্থা ; সুতরাং তাকে জয় করতে না পারলে নিরুপাধি প্রেমের অধিকারী হওয়া যায় না। সেই কলঙ্কভীতি জয় করে চণ্ডীদাসের রাধা যেন অনাগত গৌড়ীয় প্রেমাদর্শকেই প্রচার করেছেন। রাধা তাই নির্দ্বিধায় চণ্ডীদাসের পদে বলতে পেরেছেন :

"সই, ছাড়িতে নারিব কালা।
কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়া
লইব কলঙ্কের ডালা ॥" (ঐ ॥ ২৬ ॥)

চণ্ডীদাস-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র—আক্ষেপানুরাগ। এ আক্ষেপে এক-দিকে রয়েছে বিরহদহনে প্রেমের বিষবেদনা, অপরদিকে অন্তরে জাগ্রত যুগপৎ অমৃতময় প্রেমরসের ধারা। এই প্রেমস্বরূপই গৌড়ীয় যুগে কবিরাজ গোস্বামী প্রচার করেছিলেন 'তপ্ত ইক্ষু-চর্বণ'-তুল্য 'বিষামৃতে একত্র মিলন' বলে[৪], আর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমের সেই বিষামৃতের ব্যাখ্যায় প্রেমকে শিশু-কালসর্পের দংশনজাত বিষযন্ত্রণারও গর্বনাশকারী, আবার আনন্দের ক্ষেত্রে দেবতাদের আস্বাদ্য সমুদ্রমন্থনজাত সুধামাধুর্যেরও অহঙ্কার সঙ্কোচনকারী বলে বর্ণনা করেছেন।[৫] কবি চণ্ডীদাসের পদেও দেখি, বিরহে বাইরের বেদনায় আর্ত রাধা যখন কৃষ্ণকে ত্যাগ করে বিরহদহন ভুলতে চান, তখন অন্তর-গভীরে দেখেন কৃষ্ণের নিত্য আসন,—সেখান থেকে প্রেমময় রসময় কৃষ্ণকে কিছুতেই দূর করতে পারেন না :

"পাশরিতে চাহি তারে পাশরা না যায় গো।" (চ. প. ॥ ২৭ ॥)

বিষপানও সেখানে রাধার নবজীবনদায়ক, বিরহও হয়ে ওঠে প্রেমবর্দ্ধক।

৪. দ্রঃ চৈ. চ. ॥ ২/২/৪৪-৪৫ ॥
৫. দ্রঃ বিদগ্ধমাধব নাটক ॥ ২/১৮ ॥

নিদ্রায় বিরহদহনের সাময়িক বিরতির অবসরও কবি চণ্ডীদাসের নিত্য কৃষ্ণময় রাধায় কোথায়? আক্ষেপানুরাগে তাই সখেদে রাধা উচ্চারণ করেন :

"মুদিয়া নয়ন যদি বা ঘুমাই
হৃদয়ে কানুরে দেখি।" (ঐ ॥ ৩১ ॥)

কৃষ্ণ তাঁকে বিদ্যাপতির পদের ন্যায় বহিঃসৌন্দর্যে মুগ্ধ করেন না, সমস্ত অন্তরকে আকর্ষণ করেন :

"লোক চরচায় ফিরিয়া না চায়
সদাই অন্তরে টানে।" (ঐ ॥ ৩৩ ॥)

বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার দেহে আগুন জ্বালে, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ হৃদয়ে,—শত বারিবর্ষণেও সে আগুন নেভে না; ক্ষণিকের অদর্শন সে আগুনকে দ্বিগুণ করে তোলে :

"জ্বলন্ত আনলে জল ঢালি দিলে
তখনি নিবায়ে যায়।
নেরি আগুনি নিবাইব কিসে
দ্বিগুণ জ্বলয়ে তায়॥ (ঐ ॥ ৩৪ ॥)

এরূপ চিরন্তন অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষার এরূপ নিত্য সজীবতাই গৌড়ীয় সাধনায় প্রেমকে চিরস্থায়ী করেছে। বিরহ-গরলেই প্রেমের অমৃতত্বের আস্বাদ হয়ে ওঠে তীব্রতম, নিত্য বৈচিত্র্যে মণ্ডিত, অসীম। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সমগ্র সাধনার বিনিময়ে একমাত্র প্রার্থনার বস্তু করে তুলেছেন জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী এরূপ অসীম ও অহৈতুকী প্রেমভক্তির অধিকার, মুক্তি নয়।[৬] 'তপ্ত ইক্ষু-চর্বণ'-তুল্য 'বিষামৃতে একত্র মিলন' বলে এ প্রেম তাই একান্ত গৌরবমণ্ডিতই হয়েছে কৃষ্ণ দাসের রচনায়। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, প্রেমের সেই গৌরব-মণ্ডিত চিরজীবী সত্তার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কবিরাজ গোস্বামীর শতাব্দী কলাধিক পূর্বেই কবি চণ্ডীদাস লিখেছিলেন :

"পিরিতে পুড়িল দেহ।
নিমে লোনে সুধা একত্র করিয়া
ঐছন তাহারি লেহ॥

৬. দ্রঃ শ্রীশিক্ষাষ্টক ॥ ৪ ॥

... ...

কিছু কিছু সুধা বিষ গুণ আধা
নেহা চিরজীবী কৈল ॥" (ঐ ॥ ১০৭ ॥)

বিরহ-জ্বালার মধ্যেই মানসক্ষেত্রে অনন্ত প্রেমরসের নিত্যসম্ভোগ, সে অবস্থায় "শুধুই সুধা যে নেহ ॥" (ঐ ॥ ৯৮ ॥)। বলাই বাহুল্য গৌড়ীয় প্রেমসাধনার এরূপ রসপরিপূর্ণতার উপলব্ধিই তার দর্শন-সাধনা-সাহিত্যের পূর্ণবিকাশে মুখ্য সহায়ক। ভাষান্তরে, গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের রসপূর্ণতার উপলব্ধি প্রাক্‌চৈতন্য বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে একমাত্র কবি চণ্ডীদাসেরই ছিল। আসলে সে উপলব্ধি গৌড়ীয় সমাজ চণ্ডীদাসের মনোজগৎ থেকেই আহরণ করে নানাভাবে তার বিবর্তন সাধন করেছেন।

(গৌড়ীয় সাধনার প্রেমাদর্শ চিরবিরহকেই নিত্য প্রেম-পোষণকারী হিসাবে সাহিত্যশাখায় সর্বাত্মক মূল্যায়ন করেছে। তাই মাথুরের অনন্তবিরহপর্যায় বৈষ্ণবসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। চণ্ডীদাসের রাধা আদ্যন্ত বিরহিণী হলেও মাথুর-পর্যায়ের বিরহ-চিত্রণ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বিরল। তা ব্যাপকভাবে আছে কবি বিদ্যাপতির পদাবলীতে। তাই বিরহ-পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে বিদ্যাপতিই সমাধিক পরিচিত, যদিও বিরহের তন্ময়-অনুভূতি কবি চণ্ডীদাসের পদেই সর্বাধিক গভীর হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা চণ্ডীদাস পদাবলীর আদ্যন্ত জুড়ে। বিদ্যাপতিকে মাথুর-পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হলেও বিদ্যাপতির মাথুর-পর্যায় গৌড়ীয় সাধনার প্রেমাদর্শ-বিচ্যুত ; কেননা—প্রেমের অতীন্দ্রিয়তার ও অনুভূতিলোকে নিত্যমিলনের পরিবর্তে সেখানে ইন্দ্রিয়লালসাই প্রধান হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির পদে মিলন-বিরহের সর্বক্ষেত্রে মানবীয় শরীরী-প্রেমেরই আধিপত্য। গৌড়ীয় আদর্শ এই শরীরী প্রেমকেই শুধু নয়, অন্য কোনপ্রকার আত্মসুখের বাসনাকেই প্রেম বলে স্বীকার করেনি, সে সকল বাসনাকে অভিহিত করেছে 'কাম' নামে। কাম ও প্রেমের স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ তথা প্রেমের সংজ্ঞায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের অভিমত স্মরণীয় :

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম ॥" (চৈ. চ. ॥ ১/৪/১৪১ ॥)

কিন্তু বিদ্যাপতির রাধার কাছে প্রায় ক্ষেত্রেই কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার পরিবর্তে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণের বিনিময়ে একান্ত কাম্য হয়ে উঠেছে। পূর্বরাগ-পর্যায়ে সে রাধার মানসিকতার স্পষ্ট পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি, অভিসার পর্যায়েও অভিসার-শেষে কৃষ্ণের নিকটে আগতা বিদ্যাপতির অভিসারিকা রাধার কৃষ্ণের কাছে স্পষ্ট স্বীকৃতি শুনি :

"মাধব আজু আয়লুঁ বড় ধন্ধে।
সুখ লাগি আয়লুঁ বড় দুঃখ পায়লুঁ
পাপ মনমথ সন্ধে॥"

প্রবাসী কৃষ্ণের বিরহেও সে রাধার ধ্যানের পরিবর্তে কামই দারুণ হয়ে ওঠে :

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥" (বৈ. প. ॥ ১২/৭॥)

কিংবা পূর্ণশরীর নবযৌবনকাল বিরহে অতিবাহনের জন্য সে রাধার কণ্ঠে প্রবল হয়ে ওঠে একান্ত আক্ষেপ, যা 'পাপ মনমথ'-কেই অবারিত করে তোলে :

"অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে॥" (ঐ ॥ ১২ / ১০ ॥)

আর ভাবোল্লাস-পর্যায়েও অতীন্দ্রিয় ধ্যানের পরিবর্তে রাধার সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা আমরা তো অল্প পূর্বেই শুনেছি।

কবি বিদ্যাপতির ভাষারীতি, আলঙ্কারিক মণ্ডনকলা প্রভৃতি বহুল অনুসৃত হলেও তাঁর প্রেমভাবনার কামানুগ আদর্শকে তাই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবসাহিত্য প্রায়ক্ষেত্রেই বর্জন করেছে। সেক্ষেত্রে মিলন-বিরহ উভয়ক্ষেত্রেই নিরুপাধি

ও অতীন্দ্রিয় প্রেমের স্রষ্টা কবি চণ্ডীদাসের প্রেমভাবনাকেই আরো বিবর্তন দান করে গৌড়ীয় সাধনা ও সাহিত্যে মহাভাবের সমুন্নত প্রেমাদর্শের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে। এ হিসাবে কবি চণ্ডীদাসই বৈষ্ণব কবি-সাধক-দার্শনিক সকলের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের রাধাপ্রেমাদর্শে মহাভাবের দর্শনসিদ্ধান্তগত প্রতিষ্ঠা ঘটে নি,—একথা অবশ্যই সত্য; কিন্তু চৈতন্যোত্তরকালে মহাভাবসাধিকা রাধার সমগ্র বিশ্বজগতের দৃষ্টান্তে অদ্বিতীয়, অনুপম কিংবা অননুকরণীয় প্রেমাদর্শের যে প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবসাহিত্যে ঘটেছে, তার তত্ত্বতঃ না হলেও রসগত প্রতিষ্ঠা চণ্ডীদাসের রাধাপ্রেমাদর্শে অবশ্যই সূচিত হয়েছে। কবি বিদ্যাপতি-বড়ু চণ্ডীদাস-জয়দেবাদির রাধাপ্রেমাদর্শের উপমা সমগ্র বিশ্বের লৌকিক প্রেমভাবনার সর্বস্তরেই খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু কবি চণ্ডীদাসের রাধাপ্রেমের উপমা কোথাও মেলে না। ব্যক্তিজীবনে প্রেমের হলাহল-দগ্ধ বেদনার বিষে নীলকণ্ঠ কবি চণ্ডীদাস তাঁর রাধার প্রেম সম্বন্ধেশ্রীচৈতন্যের প্রেমসাধনার দৃষ্টান্তে কবি-দার্শনিকগণ যেমন সে সাধনার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তরহিত আদর্শ সহজেই অনুভব করতে পেরেছিলেন, তেমনি অতি সহজে নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন :

"এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
... ...
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥" (চ. প.॥ ১২৮॥)

শুধু তাই নয়,—সূর্যের সঙ্গে পদ্মের, মেঘের সঙ্গে চাতকের, ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের কিংবা চাঁদের সঙ্গে নিশাচর চকোর পক্ষীর,—অবিচ্ছেদ্য প্রেমসম্পর্কের কবিপ্রসিদ্ধ এ সকল অতি বিখ্যাত উপমাও চণ্ডীদাসের রাধাপ্রেমাদর্শের অসীম গভীরতা ও ব্যাপ্তির কাছে একান্ত ম্লান হয়ে যায়। কবির ভণিতাতেই শুনি :

"ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥" (ঐ॥ ঐ॥)

মহাভাবের গৌরবে অদ্বিতীয় গৌড়ীয় রাধাপ্রেমাদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যায় দার্শনিক কবি যখন লেখেন :

"ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা ॥"

(চৈ. চ. ॥ ২/৮/৭৯ ॥)

তখন কাব্যাংশে কবি চণ্ডীদাসের ভাষাশৈলীর অনুসৃতিই শুধু নয়, গৌড়ীয় সাহিত্য-দর্শনের মহাভাবসাধিকার পরিপূর্ণ উৎসরূপিণী হিসাবে চণ্ডীদাসের রাধামূর্তিটিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ফলে সে রাধাকেও মহাভাবের গৌরব-মর্যাদায় বরণ করে নিতে নিষিদ্ধ বাসনা জাগে।

বিদ্যাপতির যৌবনমদগর্বিতা রাধার সঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধার কোনই সাদৃশ্য নেই। চণ্ডীদাসের রাধাও গর্বিতা, কিন্তু তা যৌবনের দেহসৌন্দর্যের জন্য নয়,—সে গর্ব কৃষ্ণের প্রেমলাভে এবং কৃষ্ণকে ভালবাসার অধিকারে। তাই আপনার জন্য কৃষ্ণের সামান্যতম বেদনাও চণ্ডীদাসের রাধার বক্ষে শেল হয়ে বাজে :

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
বন্ধু, কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোণে গাখানি তিতিঞাছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই কি আর বলিব তোরে।
কোন্ পুণ্যফলে সে হেন বন্ধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥" (চ. প. ॥ ৪৫ ॥)

একদিকে দুঃখ-বেদনার পরিপূর্ণতা, অপরদিকে হৃদয়ে প্রেমাস্বাদের তীব্রতা। চণ্ডীদাসের রাধার তাই বাহ্যিক মিলনের অবসর কোথাও নেই, কেবলই বিচ্ছেদ বিরহের জ্বালা :

"শঙ্খ-বণিকের যেমতি করাতি
আসিতে যাইতে কাটে ॥" (ঐ ॥ ৬২ ॥)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব উভয়েরই প্রতিষ্ঠা প্রেমে। বিদ্যাপতি-জয়দেবাদির কাব্যে সাধ্য প্রেম নয়,--কৃষ্ণ বা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে কেবলমাত্র প্রেমে প্রতিষ্ঠিত সেই গৌড়ীয় সাধ্য-সাধনতত্ত্বের পূর্বাভাসও মেলে নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে :

"পিরিতি পিরিতি পিরিতি রতন
যাহার হিয়ায় জাগে।
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
এ বড় সুখ যে লাগে॥" (ঐ॥ ৯৬॥)

গৌড়ীয় দর্শনে প্রেম চতুর্বর্গের উপরে পঞ্চম এবং পরম পুরুষার্থ, চণ্ডীদাসের রাধার উপলব্ধিতে নশ্বর প্রাণকে অতিক্রম করে 'পিরিতি' অবিনশ্বর ও 'বড় সুখ',—দুইই অভিন্ন। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের রস-ঐশ্বর্যের আবিষ্কারে একনিষ্ঠপ্রাণ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যখন রসবিভোরতার বিমুগ্ধ আবেশে মনোরম উপমার রসে সিক্ত করে কবি চণ্ডীদাস-সৃষ্ট রাধাপ্রেমাদর্শ সম্বন্ধে প্রাণের গভীর-অনুভূতিটি লিপিবদ্ধ করেন:

> "Divorce....is not recognised in the law book of Chandi Das. ....It is the flower's love, tear off its petals, crush it cruelly, it will have a smile for you still. At this stage only a step further and one attains love divine." (Chaitanya & His Age : Rai Bahadur Dinesh Chandra Sen, p. 28)

তখন বিতর্কহীন ভাষায় পূর্ণ প্রাণে বলা চলে,—চণ্ডীদাস-প্রেমাদর্শ সম্বন্ধে এর তুল্য যোগ্য অনুভব আর হতে পারে না। আর এ অনুভবে সাধ্যসাধন-সর্বস্ব গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের অদ্বিতীয় দিব্যস্বরূপটি চণ্ডীদাস-প্রেমাদর্শ সম্পর্কেও অভিন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কবি বিদ্যাপতি সম্ভোগবাদী বলেই রাধার বিরহদুঃখের অবসান চেয়েছেন। তাই বারবার বিরহকাতরা রাধাকে কবি পুনর্মিলনের আশ্বাস দিয়েছেন আপনার বিভিন্ন পদের ভণিতায়। যথা:

"ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক কু-দিন দিবস দুই-চারি॥'
(বৈ. প.॥ ১২/৫॥)

কিংবা: "ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥" (ঐ॥ ১২/৬॥)

চণ্ডীদাসের পদেও সান্ত্বনাদানের প্রয়াস একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই বিরহিণী রাধাকে চণ্ডীদাস অধিকতর দুঃখের আগুনে নিক্ষেপ করে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিরহজ্বালার অন্তহীনতা ও প্রেমানন্দের মরমী আস্বাদের কথা :

"চণ্ডীদাস কহে দৈব-গতি নাহি জান।
দারুণ পিরিতি সেই বধয়ে পরাণ॥" (চ. প. ॥ ১১০ ॥)

অথবা : "চণ্ডীদাস বলে কালার পিরিতি
দুখের নাহিক ওর॥" (ঐ ॥ ১১২ ॥)

এ ধরণের ভণিতা চণ্ডীদাস-পদাবলীতে অজস্র.[৭] যা দুঃখ-জ্বালা-দহনদগ্ধ প্রেমের নিখাদ উজ্জ্বল রূপটিকে রাধাপ্রেমাদর্শে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বিদ্যাপতি প্রধানতঃ আত্মসচেতন শিল্পী-কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস আত্মবিস্মৃত মরমী কবি। এই মর্মস্বরূপই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই চণ্ডীদাস স্বভাবতঃই অনেকখানি গৌড়ীয় সাহিত্যের মর্মাদর্শসম্মত কবি। অথবা বলা চলে,—কবি চণ্ডীদাসের মর্মস্বরূপই আরও পরিণত ও স্ফূর্ত হয়ে উঠেছে গৌড়ীয় সাহিত্যে ও তার প্রেমাদর্শে।

চণ্ডীদাস পদাবলীতে রাধাকে মিলনের আস্বাসদানের প্রয়াস যে ক'টি পদে পাই, একটু তলিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে—সেগুলির মধ্যে রয়েছে ভাবসম্মিলনের স্পষ্ট ইঙ্গিত, ইন্দ্রিয়মিলনের নয়। বিরহজ্বালায় পীড়িতা রাধা যখন সখীকে বলেন :

"গরল গুলিয়া দেহ জিহ্বার উপরে।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে॥" (ঐ ॥ ১১৯ ॥)

সে পদের ভণিতায় তখন রাধার প্রতি কবির সান্ত্বনাবাণী :

"চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে পরাণনিধি আপনি মিলিবে॥"

বিরহতন্ময় কৃষ্ণচিন্তার অনিবার্য পরিণতি কৃষ্ণ-মিলন, কৃষ্ণপ্রেমস্মৃতিময়তা, কৃষ্ণবিস্ফূর্তি : তাই তা 'আপনি মিলিবে।'—ভাবসম্মিলনের ইঙ্গিত এখানে সুস্পষ্ট। নিম্নোদ্ধৃত পদাংশ ও ভণিতাটিও স্মরণীয় :

৭. দ্রঃ চ. প. ॥ ৬১-৬৩, ৭৫, ৮১, ৮৪-৮৮, ১০২, ১৩৯ প্রভৃতি সংখ্যক পদের ভণিতাসমূহ ॥

"শরীরে না রহে প্রাণ বাহিরায় এখনে।
পরাণ গেলে কি করিবে পিয়া দরশনে॥
চণ্ডীদাস কহে প্রাণ যাইবেক কেনে।
চিত্ত স্থির করি রহ মিলিবে এখনে॥" (ঐ॥ ৭৭॥)

এখানেও মিলন স্থিরচিত্তের একাগ্র কৃষ্ণধ্যানে অন্তরগভীরে, অর্থাৎ তাও অবিতর্কিত ভাবসম্মিলন,—ইন্দ্রিয়মিলনের ইঙ্গিতমাত্র এখানে নেই, কেননা 'মিলিবে এখনে' শব্দটি লক্ষ্যণীয়। বলা চলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধার চিরবিরোধ। এমনকি বিরহবেদনা বিস্মৃতির জন্য সে রাধা ইন্দ্রিয়চিন্তায় বিভোর হতে চাইলেও তাতে সার্থকতা পান না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-বংশী-ধ্বনি প্রভৃতিকে অস্বীকার কিংবা অগ্রাহ্য করার জন্য চক্ষু-নাসিকা প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়সমূহকে আবৃত করা সত্ত্বেও চণ্ডীদাসের পদে শ্রীরাধার অন্তরে বহিরিন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অনুভূতির দ্বারপথে প্রবেশ করে কৃষ্ণের সর্বাত্মক অস্তিত্বের নিত্য উপলব্ধি, যে কারণে অতীন্দ্রিয় প্রেমের অধিকারিণী সে রাধার সুতীব্র আক্ষেপ:

"ধিক্ রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥" (ঐ॥ ১২৬॥)

বিরহজ্বালাকে চণ্ডীদাসের রাধা চির পাওয়ার অনুভব দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন। আর অনুভূতির এই লক্ষ্যে পৌঁছনোই তো গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের মূল কথা। বিরহ-লব্ধ এ উপলব্ধি অনিবারণীয়, বরং তা ক্রমাগত বৃদ্ধি ও গভীরতা লাভ করে অসীম ও অতলস্পর্শী হয়ে ওঠে;—কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় শুনেছি:

"রাধা-প্রেম বিভু যার বাঢ়িতে নাই ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥" (চৈ. চ.॥ ১/৪/১১১॥)

এ আনন্দের সন্ধানও প্রাক্-চৈতন্য যুগে কবি চণ্ডীদাসই সর্বপ্রথম দিয়েছেন:

"নিতুই নৌতুন পিরিতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি থায়॥

সখি হে, অদভুত তুহুঁ প্রেম।
এত দিন চাই অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম॥" (চ. প. ॥ ১২৭ ॥)

পদটি প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের কিনা, সে বিষয়ে গবেষকমহলে বিতর্ক থাকলেও চণ্ডীদাসের অন্যান্য অজস্র পদের দৃষ্টান্তে কবি চণ্ডীদাস যে এ অনুভূতির যোগ্যতম অধিকারী, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। কারণ কবি চণ্ডীদাসের পদাবলী-পাঠকমাত্রেরই অসংশয়িত উপলব্ধি—শিল্পসুষমা নয়, অনন্যনির্ভর ভাবুকতাই তাঁর সৃজনশৈলীর মর্মকথা।

কবি চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলীই এরূপ মিলন-বিরহাশ্রিত প্রেমের বিষামৃত-স্বরূপের যুগ্মপ্রকাশক। একদিকে বিরহের অতলস্পর্শী বেদনাসমুদ্র, অন্যদিকে অসীম বৈচিত্র্যেভরা অতীন্দ্রিয় প্রেমানুভূতির পরম ভূমানন্দ,—উভয়কে আশ্রয় করে চণ্ডীদাসের পদাবলী গৌড়ীয় প্রেমভাবনার মূল সূত্রটিকে অনায়াসেই পৌঁছিয়ে দেয় আমাদের কাছে। দক্ষিণ ভারতের আড়বার সাধক-বৃন্দ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাধক ও কবির সাধনা ও কাব্যাদর্শ, বিভিন্ন পুরাণ-দর্শনশাস্ত্র-রসসাহিত্য-লোকগাথা প্রভৃতি গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের পরিপোষণক্ষেত্রে তাদের অল্পবিস্তর প্রভাব সঞ্চারিত করে দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গৌড়ীয় আদর্শ থেকে সে সকল প্রেমাদর্শের ব্যবধান দুস্তর। কিন্তু কবি চণ্ডীদাস-পদাবলীর প্রেমাদর্শই প্রাক্-গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে একমাত্র দৃষ্টান্ত, যার মধ্যে রয়েছে গৌড়ীয় প্রেমাদর্শ-পরিপুষ্টির বহুল উপকরণ। বলা চলে—গৌড়ীয় সাহিত্যের রাধাপ্রেমাদর্শ চণ্ডীদাসের রাধাপ্রেমাদর্শকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। ভাষান্তরে,—কবি চণ্ডীদাসের রাধার ভাব-সুনিবিড় নিষ্কাম প্রেমই অকৈতব নিরুপাধি প্রেমহিসাবে গৌড়ীয় ধর্ম, সাধনা ও সাহিত্যের সর্বস্তরে একান্ত নিষ্ঠাসহকারে গৃহীত হয়েছে। গৌড়ীয় কবি-দার্শনিক-সাধকগণ তাই কবি চণ্ডীদাসের প্রেমের আলোকবর্তিকাধারী পথিকৃৎ-সত্তার গৌরবমর্যাদাকে অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁদের রচনাধারায় ও সাধনায়। জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ পদাবলী সাহিত্যের কবিবৃন্দ, শ্রীরূপ-সনাতনাদি গৌড়ীয় রসশাস্ত্রকার তথা আলঙ্কারিকগণ, কবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ চৈতন্য-লীলা ও গৌড়ীয় প্রেমভক্তি-সাধন-দর্শনের ভাষ্যকারগণ তাঁদের কাব্য-দর্শন-

লীলাগ্রন্থাদি প্রণয়নে কবি চণ্ডীদাস-প্রচারিত প্রেমাদর্শকে নানাভাবে অনুসরণ করেছেন, একান্ত মর্যাদাসহকারে তাঁকে স্মরণ করেছেন। আর স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-দেব বিশেষ করে কবি চণ্ডীদাসেরই রচনাশ্রিত নানা পালাভিনয়, পদকীর্তন ও পদ-আস্বাদন করে দিব্যোন্মত্ত হয়ে উঠতেন গভীর কৃষ্ণপ্রেমে--যা ছিল অসংখ্য ভক্ত ও সাধারণ মানুষের একান্ত চাক্ষুষ করা সত্য।

সুতরাং, অনায়াসেই বলা চলে—শ্রীরাধাভাবতনু শ্রীচৈতন্যের অনুপম কৃষ্ণপ্রেম-মানসিকতার প্রধানতম উৎসটি হ'ল কবি চণ্ডীদাস-কল্পিত শ্রীরাধা কিংবা নিত্য-বিরহিণী শ্রীমতী রাধিকার স্রষ্টা কবি চণ্ডীদাসের প্রেমভাবনা। কবি চণ্ডীদাসের কল্পনার রাধাই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবে মূর্ত হয়ে শ্রীরাধার প্রেম-ঐতিহ্যকে নিঃশেষে প্রামাণ্য করে তুলেছে। তাই রসপ্রজ্ঞ পণ্ডিত স্বর্গীয় আচার্যদেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে লিখেছিলেন :

> "কাব্যক্ষেত্রে চণ্ডীদাস প্রভু কর্মক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভুর ন্যায় অন্য এক প্রেমাবতার।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য / পৃ. ২৩২)

কবি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সে উপলব্ধি সত্যদ্রষ্টার অসংশয়িত অনুভব।

॥ বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও কবি জ্ঞানদাস ॥

শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ধারাটাই স্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চৈতন্যদেবের রাগমার্গীয় প্রেমভক্তিরসের সাধনাকে আশ্রয় করে উত্তরচৈতন্যযুগের সাহিত্যধারা ভাব ও রসগত উৎকর্ষে সাহিত্যধারায় নিয়ে আসে এক প্রবল জোয়ার-প্রবাহ, যাকে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের, সেই সঙ্গে সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও একটা নূতন প্রেরণার কিংবা জাগরণের কাল বলে অভিহিত করা যায়। আর বলাই বাহুল্য, এই প্রবাহের পুরোভাগে ছিল বৈষ্ণবসাহিত্য। প্রাক্-চৈতন্যযুগে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীকে অবলম্বন করে প্রেমমাধুর্যের বিস্তার ঘটেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে ভক্তিসাধনার আদর্শ রূপায়ণের কোন প্রয়াস ছিল না,—অন্ততঃ কবি জয়দেব-বড়ু চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির রচনায় বর্ণিত রাধাপ্রেমাদর্শ সে সম্বন্ধে কোন সংশয় রাখে না। কবি চণ্ডীদাসের রচনাকে বাদ দিলে সে আদর্শ আর যাই হোক না কেন, সম্ভোগবাসনাতুর লৌকিক প্রেমভাবনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি; আর সে কারণেই তা কারও কাছে রাজসভা বা ধনীর মজলিসের উঁচুদরের বৈঠকি গানের তুল্য মনে হয়েছে,[১] আবার কেউ বা সে সকলকে সাত্ত্বিক ভাবশূন্য এবং নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের প্রতীক কিংবা প্রেমের ছদ্ম আবরণে কামের নগ্নরূপ ও পরকীয়া প্রেমের সামাজিক সম্ভোগের বিস্তার বলে মনে করেছেন।[২] প্রাক্‌চৈতন্যযুগে চণ্ডীদাসের রচনাতেই সর্বপ্রথম সম্ভোগচেতনা-মুক্ত প্রেমের মহত্তর রূপের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সে প্রেমের সঙ্গে ভক্তিসাধনার কোন যোগসূত্র ছিল না। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে —"প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবনের নিতান্ত মানবিক অনুভব অকৃত্রিম উপলব্ধির তন্ময়তায় পরিস্রুত হয়ে যেন এক অশরীরী, জীবনাতীত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে।"[৩]

১. দ্রঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস/১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ : ডঃ সুকুমার সেন, পৃ. ৩৮৫.

২. দ্রঃ বাংলা দেশের ইতিহাস/২য় খণ্ড (মধ্যযুগ) : সম্পাদনা—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ২৫৮-'৬০.

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা/১ম পর্যায় : ভূদেব চৌধুরী, পৃ. ১৯৬.

সন্দেহ নেই, প্রাক্‌চৈতন্যযুগীয় তান্ত্রিক ভক্তি-আদর্শের বীভৎসতা ও ব্রহ্মণ্য-ধর্মের নানা গোঁড়ামি তথা ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নানা অরাজকতা ও বিকৃত আচরণের কালে সে সকলের বলিষ্ঠ প্রতিবাদে ভক্তির নির্মল ও মর্যাদাপূর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপনক্ষেত্রে[৪] শ্রীচৈতন্যদেবের উজ্জ্বল প্রেমভক্তিমানসিকতাকে চণ্ডীদাসের সেই 'অকৃত্রিম উপলব্ধির তন্ময়তা' অনেকখানিই প্রভাবিত করেছিল, আর সেই প্রভাববিস্তারের সূত্রেই কবি চণ্ডীদাস গৌড়ীয় প্রেমভক্তির সাধক-সম্প্রদায়ের কাছে চৈতন্যপূর্ব মহাজন-কবিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে তা শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক চণ্ডীদাস-পদাবলী আস্বাদিত হওয়ার এবং চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তি-আদর্শ চণ্ডীদাসের রচনায় আরোপিত হওয়ার কারণেই। সুতরাং তা চণ্ডীদাস-পদাবলীর স্বতঃ বা সহজাত বৈশিষ্ট্য নয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ সাধনায় যে সাধন-সাধ্যসর্বস্ব পরম পুরুষার্থস্বরূপ অহৈতুকী প্রেমভক্তির সূচনা তাঁর মর্যাদাকে কেবল ধর্মীয়ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, রাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনীর আশ্রয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে সেই প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে চৈতন্যোত্তর কালে। অর্থাৎ বৈষ্ণবসাহিত্যে মহাভাবের অধিকারিণী ও প্রেমসাধিকা-শিরোমণিরূপে শ্রীরাধার পরিকল্পনা ও যথাযথ প্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্যের সাধনায় প্রকটিত প্রেমাদর্শকেই মুখ্যতঃ অবলম্বন করে। সে হিসাবে চৈতন্যোত্তর পদাবলী ও অন্যান্য বৈষ্ণবসাহিত্যের সুবিশাল ধারাটাই হ'ল গৌড়ীয় প্রেমভক্তিরসের যথার্থ বিকাশস্থল। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ চৈতন্য-দেবের সন্ন্যাসজীবনকে বিশেষতঃ তাঁর অন্ত্যজীবনের দিব্যোন্মাদ-সাধনাদর্শকে অবলম্বন করে গৌড়ীয় প্রেমভক্তির আদর্শকে এক সুবিস্তৃত দার্শনিকভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি অলঙ্কারগ্রন্থের রচয়িতা ও গৌড়ীয় প্রেমভাবনার দিগ্‌-

---

৪. শ্রী কবি-কর্ণপুরের চৈতন্যপ্রণাম স্মরণীয় :
"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ॥ ৬/৭৪ ॥)

দর্শনী উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, বিদগ্ধমাধব, লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি কাব্য-নাটকের স্রষ্টা শ্রীরূপ গোস্বামী এবং ষট্‌সন্দর্ভ (তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎ সন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ), সর্বসম্বাদিনী, ভক্তি-রসামৃতশেষ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ও ভাগবত-ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতির যথাক্রমে ক্রমসন্দর্ভ-দুর্গমসঙ্গমনী-লোচনরোচনী প্রভৃতি টীকারচনাকারী শ্রীজীবগোস্বামী। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে অসংখ্য কবির রচনাকে আশ্রয় করে পদাবলী ও অন্যান্য বৈষ্ণবসাহিত্য প্রেমভক্তিবাদী সেই দার্শনিকভিত্তির উপরেই পূর্ণ বিকাশলাভ করে বৈষ্ণবসাহিত্যের এক সুবর্ণযুগ গড়ে তোলে। এই কারণেই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবসাহিত্য পরিচিত হয় বৈষ্ণব দর্শনের রসভাষ্য হিসাবে, যা তার একান্ত গৌরবমর্যাদার পরিচায়ক।

চৈতন্য-তিরোধানের পরবর্তীকালে পদাবলী-সাহিত্যের লীলাকাহিনী মুখ্যতঃ বৈষ্ণবসাধনার দার্শনিক ভিত্তিস্থাপনকারী গোস্বামী-শাস্ত্রের প্রেরণায় নিতান্ত মানবিক অনুভবকে অতিক্রম করে গৌড়ীয় ভক্তিসাধনার আদর্শে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর ক্ষেত্রেও সম্ভোগ বা বা মিলনস্পৃহা কিংবা অধ্যাত্মব্যঞ্জনায় যা মুক্তিবাসনা, তাকে অতিক্রম করে নিত্য কৃষ্ণবিরহার্ত দিব্যোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের অনুসরণে রাধার প্রেমাদর্শে মহা-ভাবসত্তার প্রতিষ্ঠা ঘটে। ফলে, ব্রিজগতে অনুপম প্রেমের সাধিকা রাধার অনন্ত বিরহ ও সে বিরহের আস্বাদবৈচিত্র্যকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব ভক্তিসাধনায় প্রেমের পরম-পুরুষার্থতার যে অদ্বিতীয় আদর্শ, বৈষ্ণবসাহিত্যে তার পূর্ণ প্রচার ও প্রসার ঘটে। সেই সঙ্গে পদাবলীতে সংযোজিত হয় নূতন নূতন বহু পর্যায়, যা বৈষ্ণব দর্শনসম্মত অশেষ বৈচিত্র্যমণ্ডিত প্রেমভক্তি আদর্শেরই রসগত সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। মুক্তি গৌড়ীয় দর্শনের পরম পুরুষার্থ ভক্তি বা প্রেমের বিরোধী বলে উত্তরচৈতন্যযুগের সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্য শৃঙ্গাররসের বিপ্রলম্ভ আদর্শকেই সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এ কারণেই রসপ্রজ্ঞ সমালোচক লিখেছিলেন :

"রাধাবিরহই পদাবলী-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ।"

কিংবা : "কেবল মাথুর বেদনার কথা নয়, পদাবলী আগাগোড়া বেদনারই গান।" (পদাবলী সাহিত্য : শ্রীকালিদাস রায়, পৃ. ৬০, ৬৩)

গৌড়ীয় দর্শনানুগ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাদর্শের সৃজনে যাঁরা বৈষ্ণবসাহিত্যের সুবর্ণযুগের ধারক, সেই ষোড়শ শতকের কবিদের মধ্যে মুখ্যস্থানটি অধিকার করে আছেন পদাবলীর কবি জ্ঞানদাস। গৌড়ীয় দর্শনসিদ্ধান্তসম্মত প্রেম-ভক্তির রসভাষ্যরূপটি তাঁর রচনাতেই সর্বপ্রথম পূর্ণস্ফুট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে আন্তরধর্মে কবি চণ্ডীদাসের অকৃত্রিম উপলব্ধির তন্ময় জগৎটিকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে নেওয়ায় চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য কবি জ্ঞানদাস প্রেমরস ও ভক্তিদর্শন উভয় জগতেই এক অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কবি বিদ্যাপতির সুনিপুণ মণ্ডন-ঐশ্বর্যের অনুসরণে জ্ঞানদাসও অবিসংবাদী শিল্পীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সত্য, কিন্তু আন্তরক্ষেত্রে সম্ভোগরসাতুর, মুক্তিবিলাসী, রূপদক্ষ কবি বিদ্যাপতি জ্ঞানদাসের গৌড়ীয় প্রেমরসময় মানসজগৎটিকে বিন্দুমাত্র নাড়া দিতে পারেননি। সেখানে যে রসস্রোতটুকু মহাজন-ঋণে আবদ্ধ, তা তাঁর কাঁদরা থেকে স্বল্পদূরত্বের গ্রাম নানুরের পূর্বসূরী কবি ভাবনিবিড় বিরহতন্ময় সেই চণ্ডীদাসের প্রাণের স্পর্শ-সঞ্জাত। কিন্তু পরিণতিতে গৌড়ীয় প্রেমরসধারার দীক্ষালব্ধ পরিপূর্ণতায় তা হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র ও অধিকতর গৌরবের অধিকারী। চৈতন্যোত্তর কালের গোবিন্দদাস কবিরাজও এ প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু বিদ্যাপতির অনুসরণে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' কবি গোবিন্দদাস আলঙ্কারিক মণ্ডনসমৃদ্ধ ও সম্ভোগরসাতুর পদ রচনায় কম ব্যাপৃত ছিলেন না। জ্ঞানদাসের পদাবলীতে 'বসন্তলীলা' ও 'শারদরাস' পর্যায়ের অতি সীমিত সংখ্যক পদে সম্ভোগের বর্ণনা থাকলেও সেগুলিকে অতিক্রম করে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-মানসিকতার একান্ত আনন্দদায়ক অসংখ্য বৈচিত্র্যই আমাদের মনকে সমধিক আকর্ষণ করে। নৃত্য-গীত, সখিদের হাস্যপরিহাস, প্রহেলিকা গান, হোরিখেলা, বিবিধ কেশ-বেশ রচনা, অনবদ্য প্রকৃতির পটভূমিকা প্রভৃতির অপরূপ মাধুর্যই সে সকল পদের মুখ্য বৈশিষ্ট্যে ও একান্ত আস্বাদের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

'যুগল-মিলন' শীর্ষক স্বল্প কয়েকটি পদের সম্মিলিত একটি পর্যায় কবি জ্ঞানদাস তাঁর পদাবলীতে স্থান দিয়েছেন সত্য, কিন্তু সেখানেও সেই মাধুর্য-মণ্ডিত চিত্রাবলীর সৌন্দর্যই আমাদের মুগ্ধ করে। সে মিলন সম্ভোগহীন এক পরম মাধুর্যের আকর। রাধাকৃষ্ণের সেই মিলিত অবস্থায়:

"দোহাঁর মুখের বাণী অমিয়া-অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায় ॥
দোহাঁর মাধুরী-গুণে উলসিত সখীগণে
নানা ফুলে দোহাঁরে সাজায় ।"

(জ্ঞানদাসের পদাবলী ॥ যুগল-মিলন/১ ॥)

এই যুগল-মিলন পর্যায়ে কবির মুখ্য প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে :

"কাম কামিনি এক কাম নাহি জাগ ॥" (ঐ ॥ ঐ/১১ ॥)

মিলনে কাম-কামিনী অর্থাৎ কৃষ্ণ ও রাধা একাত্ম হলেও সে মিলন কিন্তু কাম বা মদনবিকারশূন্য, ভাবসম্মিলনের অন্তর্গূঢ় রসের আস্বাদে তা অনুপম মাধুর্যে সুরভিত। এ বিষয়ের একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত ধরা পড়েছে প্রভাতকালে রাধার প্রতি সখির বিস্ময়বিমুগ্ধ উক্তিতে :

"একলি মন্দিরে শুতল সুন্দরি কোরহি শ্যামর-চন্দ ।
তবহুঁ তাকর পরশ না ভেল এ বড়ি মরমে ধন্দ ॥"

(ঐ ॥ রসোদ্গার/৩৫ ॥)

মিলনের মধ্যেও ভাবী বিচ্ছেদের আশঙ্কায় যে বিরহনিবিড় অতীন্দ্রিয়তা,—এ কিন্তু সেই প্রেমবৈচিত্ত্য নয়, যার অনুপম দৃষ্টান্ত চৈতন্যোত্তর অন্যান্য কবিদের মত কবি জ্ঞানদাসও দিয়েছেন। বর্তমান পদটিতে রাধাকৃষ্ণ উভয়ের ক্ষেত্রেই এ যেন আলঙ্কারিকদের ভাষার 'রসচর্বণ', সমস্ত অন্তর-ইন্দ্রিয় জুড়ে এক অপূর্ব রসাস্বাদের বিভোরতা। মিলন-উদ্দেশ্যে একই কুঞ্জে অবস্থান করেও দেহবিস্মৃত এরূপ ভাববিভোর প্রেমরাগের দৃষ্টান্ত, দেহাতিক্রমী সুধারসের আহরণে সীমাহীন মানসসম্ভোগের এরূপ আদর্শ সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্যেই বোধ-করি বিরল। রসোদ্গার পর্যায়ের আর একটি পদে মদনবিজয়ী প্রেমের মানসিক চাঞ্চল্যে, বাস্তব জগতের প্রতি অসহিষ্ণুতায় মানসক্ষেত্রে যেন সেই রসচর্বণই রাধার কণ্ঠে ফুটে উঠেছে। সে পদে কৃষ্ণের রূপদর্শনে রাধার উক্তি তার অতীন্দ্রিয় রসাস্বাদ বিভোরতাকে উজ্জ্বল করেছে :

"ভালের তিলক আলোক ভুবন মদন পালায় লাজে ।
ঘরের নিয়ড়ে রহিতে নারি আগুন লাগিল কাজে ॥"

(ঐ ॥ ঐ/৩৩ ॥)

কবির "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে" পদের "প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥"—বাক্যটিতে রাধার সম্ভোগবাসনার ইঙ্গিত ব্যাখ্যা করার সুযোগ মেলে বটে, কিন্তু সে বাক্যের ঠিক পরবর্তী শ্লোক—

"হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥" (ঐ॥ ঐ/৯॥)

এ অংশ প্রমাণ দেয় যে, সে বাসনাও হৃৎসম্মিলনেরই ধ্বনিরূপ, যা এইরূপই আন্তর-ইন্দ্রিয়বিভোর রসময়। আর জ্ঞানদাসের মত ধ্বনিবাদী বৈষ্ণব কবি যে দ্বিতীয় কেউ নেই,—এ কথা তো তাঁর পদাবলীর পাঠকমাত্রেরই কাছে তাঁর রহস্যময়তা, ব্যঞ্জনাদক্ষ রোমান্টিক সত্তার জন্য একান্ত সাধারণ সত্য। তাঁর অন্যান্য বহু পদে প্রেমের সেই হৃদয়বিভোরতা একান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন —"শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে।" (শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ/৩৩), "হিয়ার মাঝারে প্রেম-অঙ্কুর পশিল।" (অনুরাগ/২০), "রাতি দিন নাই সদাই ধেয়াই মরমে সমাধি হইল॥" (ঐ/৪) ইত্যাদি।

কবি জ্ঞানদাসের এই সংযত অথচ ব্যাপ্ত-গভীর, সহজ অথচ রহস্যময়, চিরদুর্জ্ঞেয় অথচ অকৃত্রিম উপলব্ধির সহজ বিভোরতার আদর্শই বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে তাঁকে অনন্য গৌরব-স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী করেছে, যা তাঁর পদে গৌড়ীয় দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক যুগপৎ বিরহ-মিলনের অতীন্দ্রিয় আদর্শকে ও প্রেমসাধনার অনবসিত রূপকে উপলব্ধি করিয়েছে। তাঁর রাধার —"হিয়া দগদগি পরাণ পোড়য়ে তবহিঁ সন্তোষ হোয়।" (মাথুর/২৪)। অথবা এই যুগপৎ দ্বৈত-অনুভূতির এক আশ্চর্য মানসিকতার বর্ণনা—"সদাই পুলক গায়ে আঁখে ঝরে জল॥" (অনুরাগ/২০)। কিংবা অভিসারের পদে আর এক অনির্বচনীয় দ্বিমুখী অনুভব :

"অদভুত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥"
(অভিসার/১)।

এ সকলই গৌড়ীয় দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদের আদর্শকেই রাধার প্রেমানুভবের আশ্রয়ে প্রকাশ করে।

উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব-অনুসরণে গৌড়ীয় দর্শন ব্যাখ্যা করেছে কস্তুরী ও

তার সৌরভ, আগুন ও তার উত্তাপ প্রভৃতির যুগপৎ ভেদ ও অভেদাত্মক সম্পর্কের মতই—

"রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥" (চৈ. চ. ॥ ১/৪/৮৫ ॥)

দেহগত ক্ষেত্রে যা ভিন্ন, হৃদয়ক্ষেত্রে সেখানে কোন ভেদ নেই,—নিত্য মিলনাবস্থা। জ্ঞানদাসের রাধার :

"শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল ভিন ভিন করি দেহা॥"
(রসোদ্গার / ৩৮)

—এ উক্তি আমাদের অনায়াসে স্মরণ করিয়ে দেয় সে আদর্শের কথা। "না জানি কি লাগি",— এখানে যে রহস্যময় অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনা, তাইই রসধ্বনি হয়ে আমাদের নিয়ে যায় গৌড়ীয় প্রেমসাধনার 'অসমোর্ধ্বমাধুর্যে'র উপলব্ধিতেও। কৃষ্ণের আদি-অন্তহীন মাধুর্যরসের আস্বাদে রাধার ক্রমগভীর আকাঙ্ক্ষার অবসান হয় না বলেই নিত্য নবীন সে রসাস্বাদের জন্য তার প্রেমাসক্তিও নিত্যকাল বেড়ে চলে; আবার রাধার অশেষ প্রেমগভীরতায় কৃষ্ণের মাধুর্যরসও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চিরবর্ধনশীল। ফলে উভয়েই লাভ করে অশেষ প্রগাঢ়তা ও ব্যাপ্তি।[৫] গৌড়ীয় দর্শনের ভাষায় তাই হল অসমোর্ধ্ব-মাধুর্য। দেহের ভিন্নতা অর্থাৎ বিরহযাতনার অনিবার্য উপস্থিতি ব্যতীত সে আদর্শের বিকাশ ঘটতে পারে না। কেননা, প্রাপ্তি বা মিলনে প্রেমাকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। বাহ্যিক ক্ষেত্রে ভেদ কিন্তু অন্তরে অভেদের গৌড়ীয় সাধনার মর্মকথাটাই যেন কবি জ্ঞানদাস তাঁর পদের ভণিতাতেও সাধিকাশিরোমণি রাধাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

"শুন বিনোদিনী প্রেমের কাহিনী পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥"
(ঐ / ৪০)

আর নিত্য রসবৈচিত্র্যমণ্ডিত কৃষ্ণের সে অপরূপ মাধুর্যও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কবির এই বর্ণনায় :

৫. দ্রঃ চৈতন্যচরিতামৃত ॥ ১/৪/১১১, ১২৪

"লীলা-রভস হাস সরসামৃত
রতিপতি-মতি কো ফান্দ।
জগ-বৈচিত্র্য কলা তঁহি নিরমিত
অপরূপ শ্যামর চান্দ॥"

(শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ / ২৬)

কিংবা শ্রীরাধারই গভীর অনুভবে :

"সজনি অপরূপ নিরমিল ধাতা।
বয়েস কিশোর ওর[৬] নাহি লাবণি
দরশে পরশ-সুখ-দাতা॥" (ঐ / ৩০)

বিচ্ছেদ ও তার দহন তাই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে কবি জ্ঞানদাসের প্রায় সমগ্র রচনা জুড়েই। বিদ্যাপতি তাঁর বিরহিণী রাধাকে প্রায়ই সান্ত্বনা দিয়েছেন অবিলম্বে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনসম্ভাবনার কথা বলে,[৭]—যা বিরহ-দহনের মন্থনজাত ধ্যানগভীর তীব্র রসানুভবকে ব্যাহতই করেছে। কিন্তু কবি জ্ঞানদাস কৃষ্ণবিরহবিদীর্ণা রাধার কাছে কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপকে 'জাতি-কুল-শীল ছাড়া' 'বিষফল' সদৃশ, 'কেবল দুখের ঘর' 'বিষম জ্বালা', 'সহনে না যায়', 'মরণ অধিক শেল'[৮] ইত্যাদি বলে তাকে সান্ত্বনার পরিবর্তে অধিকতর দুঃখ বেদনার দহনে নিক্ষেপ করেছেন। সে বেদনা অব্যক্ত, যা তুষের আগুনের মত কেবল আপনার হৃদয়েই দহনতীব্রতার জ্বালা সৃষ্টি করে। এই দহন-জ্বালাকে শ্রীরূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছিলেন শিশু কালনাগের দংশনজনিত জ্বালা অপেক্ষাও তীব্রতর বলে।[৯] সে কথা কবি জ্ঞানদাসও বলেছেন—"বিষাধিক বিষম পিরিত॥" (অনুরাগ / ৩)। সেই বিষাধিক বিষম জ্বালাই অন্তরে একান্ত সংগোপন করে রাখেন জ্ঞানদাসের রাধা, বিদ্যাপতির রাধার

৬. ওর=সীমা।

৭. "ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥"

(বৈষ্ণব পদাবলী [চয়ন] ॥ মাথুর/৬ ॥)

৮. দ্রঃ যথাক্রমে অনুরাগ/১১, ১৫, আক্ষেপানুরাগ/৬, ১০, ১৮, ৩০।

৯. দ্রঃ বিদগ্ধমাধব ॥ ২/১৮ ॥

মত "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।" বলে তার বিশ্বপ্রচার করেন না। তাঁর রাধা—"চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।" (আক্ষেপানুরাগ / ৯), কিংবা যেন চকিতে বাঁটুল-বিদ্ধ রুদ্ধবাক ভীরু কপোতী। (দ্রঃ রসোদ্গার / ৩৭)। রাধার স্বকণ্ঠেই শুনি—"খেণে খেণে জীয়ে প্রাণ খেণে খেণে মরি॥" (আক্ষেপানুরাগ / ৮)। তদুপরি কবির ভণিতা বাক্যটি—

"কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পিরিতি॥"

সেই অন্তর্গভীর দহনস্তব্ধ গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের সঞ্চারকেই প্রকট করে তোলে।

গৌড়ীয় প্রেমাদর্শ কেবল এইরূপ নিত্য দহনজ্বালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিংবা পরিসমাপ্ত নয়, সে জ্বালা যুগপৎ ভূমারসের অমৃত আনন্দের আস্বাদবাহী এবং সে আস্বাদ বাহ্যিক মিলননির্ভর নয়। গৌড়ীয় সাধনার প্রেমস্বরূপকে একই সঙ্গে বলা চলে বিষকুম্ভ পয়োমুখ এবং পয়োকুম্ভ বিষমুখ, যা কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'তপ্ত ইক্ষু চর্বণ', 'বিষামৃতে একত্র মিলন' প্রভৃতি কথায় যথার্থ ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমের বিষজ্বালার অন্তরে তার অমৃতস্বরূপের কথা বলতে গিয়ে তাকে সুধামাধুর্যেরও অহঙ্কার-সঙ্কোচন-কারী বলে বর্ণনা করেছিলেন।[১০] জ্ঞানদাসের রচনায় উভয় আদর্শেরই পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। তাঁর রাধা একদিকে বলেন—"পিরিতি-বেয়াধি যার উপজয়ে সে বুঝে না বুঝে আর॥" (আক্ষেপানুরাগ / ২৮); বিষকুম্ভ প্রেমের পয়োমুখ দর্শনমুগ্ধা সে রাধার সুখের আশায় বাঁধা ঘর অগ্নিদগ্ধ হয়,—অমৃত-সরোবরে স্নান শরীরকে বিষজর্জর করে তোলে,—চন্দ্রকিরণ প্রখর সূর্যতাপ হয়ে শরীরকে অগ্নিদগ্ধ করে। (দ্রঃ ঐ / ৩০)। কিন্তু অপরদিকে সেই কৃষ্ণপ্রেমই একান্ত তন্ময়তায় গভীর প্রশান্তিতে দেহমন স্নিগ্ধ করে তোলে—"তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।...তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।" (আত্মনিবেদন / ৩)। আর এই তন্ময়তায় রাধা কৃষ্ণের প্রতি গভীর আত্মনিবেদনে ঘোষণা করেন আপনার প্রেমগর্বের কথা, যা তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ঃ

১০. দ্রঃ ঐ॥ ঐ॥

"তোমার গরবে গরবিনি হাম রূপসী তোমার রূপে।
... ...
অন্যের আছয়ে অনেক জন আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি॥" (ঐ/২)।

বিরহের তীব্রতাই মানসক্ষেত্রে আনে নিবিড় বিভোরতা। সেই বিভোর অন্তর-জগতে—"কালার পিরিতে এ তনু বান্ধা" (অনুরাগ/৫), কিংবা, "ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যামবন্ধু বিনু আর কেহো মোর নয়॥" (ঐ/১১) প্রভৃতি উপলব্ধিই বিরহিণী রাধাকে সুধামাধুর্যের অহঙ্কার-নাশকারী প্রেমরসের ভূমাস্বাদে বিভোর করেছে। ভণিতায় কবির কণ্ঠেও গোস্বামী-শাস্ত্রের সে আদর্শের উজ্জ্বল বিকাশ ঘটেছে:

"হিয়ার পিরিতি কহিল না হয় চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহ নব অনুরাগ অমিয়া-অধিক লাগে॥" (ঐ/১৬)

গৌড়ীয় দর্শন ও প্রেমসাধনার পরম লক্ষ্যটি যেন জ্ঞানদাসের পদে অবারিত হয়ে ওঠে এই 'অমিয়া-অধিক' প্রেমরসে তন্ময় শ্রীরাধার আনন্দোদ্বেল কণ্ঠের রসোজ্জ্বলতায়:

"শুন শুন হে পরাণ-পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি আর না দিব ছাড়িয়া॥
তোমায় আমায় একই পরাণ ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া কি রূপে আছিলা তুমি॥"
(আত্মনিবেদন / ১)

গৌড়ীয় প্রেমসাধনায় রাধাকৃষ্ণের চিরবিচ্ছেদের তাৎপর্যটি এখান থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। জ্ঞানদাসের ভণিতাবাক্য অনায়াসবোধ্য করে তোলে তার "কালার পিরিতি অন্তরে অন্তরে বান্ধা'র (ঐ/২) আদর্শটিকে, যা 'টুটিলে না টুটে' (অনুরাগ/৫) বা "ছাড়িলে ছাড়ান না যায় সে লোক পরাণ-অধিক বড়।" (ঐ/৯)। কান্ত-কান্তার অনবসিত বিচ্ছেদ-ব্যবধান রাধার অনুভবে ও কবির ভণিতায় সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই পদটিতে:

"জীউক পিরিতি নিরাশ।
জীবইতে না তেজব আশ॥
জগমাহা জলে জনু এক।
জ্ঞানদাস কহ পরতেখ॥" (মাথুর/৮)

অর্থাৎ রাধার বক্তব্য—নিরাশ বা বিরহগভীর প্রেমই চিরজীবী হোক। বেঁচে থাকার সমগ্র কাল আশা অর্থাৎ প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিত্য সজীব থাকুক। সমস্ত জগৎই যেন জলে এক হয়ে গেছে অর্থাৎ কান্ত কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচল না, কেননা বিরহের সে ব্যবধান অনন্ত[১১]।

উপনিষদ ঈশ্বরের মধ্যে যে পরিপূর্ণ রসময়তার কথা বলেন, তা মাধুর্য-রস বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অলৌকিক ঐশীসত্তায় সে মাধুর্যের পূর্ণবিকাশ ঘটতে পারে না। গৌড়ীয় দর্শন ঈশ্বরের সে রসময়তার আদর্শে গভীরতর বিবর্তন লাভ করেছে ঈশ্বরকে তাঁর ঐশী আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে পূর্ণ মানব-সত্তায় উত্তরণ ঘটিয়ে। চৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি স্মরণীয়—"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নর লীলা....।" ইত্যাদি (দ্রঃ॥ ২/২১/৮৩॥)।

এ কারণেই কৃষ্ণের নরলীলার বিকাশস্থল বৃন্দাবনকে গৌড়ীয় কবি-দার্শনিকগণ কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়স্থান বলে বর্ণনা করেন:

"সর্বস্মাদ্‌গোকুলং শ্রেষ্ঠং তস্মাদ্‌বৃন্দাবনং বরম্।
বৃন্দাবনাৎ পরং স্থানং ন কৃষ্ণস্য প্রিয়ং ক্বচিৎ॥"

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ: শ্রীশ্রীমদ্ রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী॥ ৩/৭॥)

আর শ্রীরূপ গোস্বামী সেই বৃন্দাবনস্থিত ঐশীচেতনামুক্ত কেবল মাধুর্যরসময় কৃষ্ণকেই পূর্ণতম কৃষ্ণ জ্ঞান করেন, সেক্ষেত্রে দ্বারকা ও মথুরাস্থিত কৃষ্ণকে ঐশীচেতনার তারতম্য হেতু বর্ণনা করেন যথাক্রমে পূর্ণ ও পূর্ণতর কৃষ্ণ বলে।[১২] কৃষ্ণের ঐশীক্ষমতার সূচক কালীয়সূদন মূর্তিটি যে বৈষ্ণব পদ-

১১. দ্রঃ জ্ঞানদাসের পদাবলী / সম্পাদকদ্বয় (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)-কৃত প্রাসঙ্গিক পদের গদ্যানুবাদ, পৃ. ২০৯.

১২. দ্রঃ ভ. র. সি.॥ ২/১/২২৩॥

সাহিত্যে পরম সমাদরে গৃহীত হয়েছে, তা কিন্তু কালীদহে অন্তর্হিত কৃষ্ণের জন্য ধেনুগণসহ সমগ্র ব্রজবাসীর বিরহার্তির মাধুর্যটুকু প্রতিফলনের জন্যই, কৃষ্ণের ঐশীক্ষমতার প্রচারবাসনায় নয়;—সুতরাং তা একান্ত মাধুর্যরসবাহী। বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণের এই পূর্ণ মানবত্তা জ্ঞানদাসের রচনায় যে অনুপম রসমূর্তি লাভ করেছে, তার সমতুল আদর্শ সমগ্র বৈষ্ণব কবিকুলের রচনাতেই বিরল। রসোদ্গার পর্যায়ের অজস্র পদে রাধার স্মৃতি-অনুভবে শ্রীকৃষ্ণের সেই পূর্ণ মানবত্তা এবং তারই পাশাপাশি রাধার প্রতি তাঁর স্নেহনিবিড় অনবদ্য প্রেমরাগের এক আশ্চর্য ও দুর্লভ পরিচয় ধরা পড়ে। কৃষ্ণপ্রেম-গর্বিতা রাধার উক্তিসমূহে কৃষ্ণের সে অনবদ্য মাধুর্য নিঃশেষে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেমন সখি-সম্বোধনে রাধার কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধ উক্তি :

"সই কিবা সে পিরিতি তার।
জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে কি দিয়া শোধিব ধার॥

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখন সে দিগে ধায়॥"
(রসোদ্গার / ৩৮)।

কিংবা

"হাসি হাসি মোর মুখ নিরখয়ে মনে মনে কথা কয়।
কায়ার সহিত ছায়া মিশাইতে পথের নিকট রয়॥
সই সে জনা মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে পিরিতি করিলে না জানি কি জানি হয়॥"
(ঐ / ৩২)।

একদিকে প্রেমের অন্তর্গভীর অসীমতা, অপরদিকে তার অনির্বচনীয়তার উপলব্ধি—"না জানি কি জানি হয়"—গৌড়ীয় প্রেমসাধনার ভূমারসময়তাকে, তার সেই চির রহস্যময় অসমোর্ধ্বমাধুর্যকে যেন উজ্জ্বলতর করে তোলে। সেই সঙ্গে ঐ মুগ্ধতা কৃষ্ণের কেবল-মাধুর্যময় নররূপের পূর্ণতমতাকেও এক গভীর রসরূপ দান করে।

এই উজ্জ্বলতা বোধ করি সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করেছে নিদ্রিতা রাধার

সামান্য অঙ্গ-সঞ্চালনে তার বেদনার চিন্তায় আকুল শ্রীকৃষ্ণের এই রসমূর্তি অঙ্কনে :

"নিঁদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥" (ঐ / ২৮)।

এমনকি এ কৃষ্ণ একান্ত যত্নে আদরে রাধার পদযুগল রঞ্জিত করে দেয় অলক্তরাগে, (দ্রঃ ঐ / ১৬), কখনও এক হাতে রাধাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে আর এক হাতে রাধার কেশবিন্যাস রচনা করে (দ্রঃ ঐ/৩০)। নররূপ কৃষ্ণের এহেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কোথায়? আমরা মরমী কবি চণ্ডীদাসের পদে রাধার কণ্ঠে অবিরাম বর্ষণ উপেক্ষা করে তার জন্য কৃষ্ণকে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় নীরবে সিক্ত হতে দেখেছি—"আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে॥" (বৈ. প. ॥ অভিসার / ৯ ॥)। তবু অনস্বীকার্য যে জ্ঞানদাসের কৃষ্ণের আশ্চর্য স্নেহময় মানবমূর্তির ঔজ্জ্বল্যের পাশে চণ্ডীদাসের সে, কৃষ্ণ যেন অনেকখানিই ম্লান। চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অনুভবদীক্ষার লালনেই কবি জ্ঞানদাস অধিকতর গৌরবানুভূতির অধিকারী, কেননা গৌড়ীয় প্রেমভক্তি-আদর্শের পিছনে সর্বাধিক ঋণদাতা মহাজন হিসাবে চণ্ডীদাসের মর্যাদা আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই দেখেছি। পরকীয়া প্রেমরসের তত্ত্বমূর্তিদানে গৌড়ীয় দর্শনে যে প্রেমসাধনাদর্শ সঞ্চারিত হয়েছে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতির "লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম···" ইত্যাদি অংশে,[১৩] কানু-কলঙ্ককে গলার হার করে চণ্ডীদাসের রাধাই কিন্তু তার অন্যতম প্রধান উৎস। সেই চণ্ডীদাস-কবিমানসিকতার গভীরতর বিবর্তনে ও যুগপৎ গৌড়ীয় প্রেমদর্শনের ভাবগৌরবের পরিপোষণে জ্ঞানদাসের পদাবলী অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে গৌড়ীয় দর্শনের অনুপম রসভাষ্যে পরিণত হয়েছে। শ্যাম-সর্বস্বতার পূর্ণ অনুভবে তাঁর রাধা ধর্মভয়কে পর্যন্ত অবহেলা করে বলতে পারেন :

"সই মরম কহিলুঁ তোরে।
কানুর পিরিতি শপতি করিলু যে বলু সে বলু মোরে॥
ধরম বচন মনেতে না লয় করমে আছিল যে।"

(অনুরাগ / ১৬)

১৩. দ্রঃ চৈ. চ. ॥ ২/৪/১৪৩-'৪৫ ॥

সে অনুভবগর্বে লোকলজ্জা, কলঙ্কভয়, পরিজনের নিন্দা-কুবচনকে জ্ঞানদাসের রাধা পরিণত করতে পারেন আভরণে—"গঞ্জে গুরুজন বলু কুবচন সে মোর চন্দন চুয়া।" (ঐ / ১২), কিংবা অপবাদদাত্রী কুলকামিনীদের তীব্র ভৎর্সনা করে আস্বাদবিভোর প্রশান্তিকেই অন্তরে বরণ করে নেন :

"যে মোর করমে লিখন আছিল বিহি ঘটায়ল মোরে।
তোমরা কুলবতী দেখিলে কুমতি কুল লৈয়া থাক ঘরে॥"

(ঐ / ১১)।

কবি চণ্ডীদাসের রচনায় পরকীয়া প্রেমের তীব্র প্রতিবন্ধকতাজয়ী গভীরতাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁর পদাবলীতে রাধার শাশুড়ী-ননদীর যথেষ্ট উল্লেখ থাকলেও তার বৈধ পতির উল্লেখ নেই। জ্ঞানদাসের রাধার কণ্ঠে তার স্পষ্ট উল্লেখ এবং কৃষ্ণপ্রেমের পটভূমিকায়—"পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি।" (ঐ / ৬), "বিষ হেন লাগে মোরে পতির পিরিতি।" (ঐ / ৭) প্রভৃতি উক্তি চণ্ডীদাস রচনাপেক্ষা জ্ঞানদাসের রচনার পরকীয়া প্রেমাদর্শের জ্বালা ও কলঙ্কময় গভীরতাকে যেন অধিকতর প্রকট করে তুলেছে। কৃষ্ণকে সম্বোধন করে জ্ঞানদাসের রাধা যখন বলেন :

"একে হাম পরাধিনী তাহে কুল-কামিনী
ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি তোমা বই নাহি জানি
সকলি কহিলুঁ সবিশেষ॥" (আক্ষেপানুরাগ / ৪)

তখন সেই পরকীয়াত্বের গৌরবানুভূতির সঙ্গে গীতা-অনুসৃত গৌড়ীয় সাধনার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' অনন্য শরণাগতির আদর্শ, অপরদিকে সেই ভক্তি-আদর্শের বিবর্তন-সঞ্জাত শ্রীচৈতন্যের "ন ধনং ন জনং···" ইত্যাদি প্রার্থনামন্ত্রের সকল বাসনাজয়ী অহৈতুকী প্রেমাদর্শের পূর্ণ ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণের পূর্ণতমতা গৌড়ীয় দর্শনে আর এক ভাবেও ব্যাখ্যাত হয়েছে। তা হ'ল বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণের চির কিশোরত্ব। সম্মোহনতন্ত্রের নির্দেশ শুনি :

"দেহেষু যৌবনং রম্যং কৈশোরং তত্র দুর্লভম্।
কিশোরং যত্নতঃ কৃষ্ণং ধ্যায়েদানন্দবিগ্রহম্।"

গৌড়ীয় দার্শনিক-সাধক এর টীকায় লিখেছেন :

"আদিরসোপভোগে বাল্যবয়ো ন সম্ভাব্যং, যৌবনে তু রসাধিক্ষণ প্রমাণেন রসস্য ন্যূনত্বং, অতঃ কৈশোরবয় ইতি পূর্ণমুজ্জ্বলরসে প্রশস্তম্। যতঃ ক্ষণে ক্ষণে রসস্য বর্দ্ধিষ্ণুতা ভবতি। অত আদিরসে কৈশোরবয়ঃ পূর্ণরসময়ং বর্দ্ধমানমিতি জ্ঞাতব্যম্।" (—শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ ॥৪/৭ ॥ পৃ. ৯০)

কবি জ্ঞানদাসের রচনায় কৃষ্ণের সেই নব কিশোরমূর্তিই বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শারদরাস পর্যায়ে নব কুঞ্জ ও নূতন মেঘের পটভূমিকায় বিনোদিনী রাধার পাশে কবি উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন 'নব নাগর' কৃষ্ণকেই। (দ্রঃ ॥৬॥)। পূর্বে ভিন্নপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত রাধার এই উক্তিটিতেও অসীম লাবণ্যের আকর চির কিশোর কৃষ্ণেরই মাধুর্যপূর্ণতার প্রকাশ ঘটেছে :

"সজনি অপরূপ নিরমিল ধাতা।
বয়েস কিশোর ওর নাহি লাবণি
দরশে পরশ-সুখ-দাতা ॥"

রাধার সঙ্গে গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে সমাহিত কবি জ্ঞানদাসের ভক্তিসাধক কবি-চিত্তটিও এসব ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে ওঠে।

গৌড়ীয় দর্শন প্রেমের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন :

"সর্বদা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥" (উ. নী. ॥ স্থায়িভাব-প্রকরণ/৬ ॥)

অনন্ত বিচ্ছেদদহন, কৃষ্ণকর্তৃক প্রত্যাখ্যান, আত্মীয় পরিজনের নিন্দা-অপবাদ, রাধাসমক্ষে কৃষ্ণের অন্য গোপীবিহার—কোন কিছুই এ প্রেমের বিনাশ ঘটাতে পারে না। বরং পরিবর্তে কৃষ্ণবিস্ফূর্তি প্রেমবন্ধনকে আরও অটুট, আরও মর্মগভীর করে তোলে। ভরিয়ে তোলে নিত্য নূতন মাধুর্যের আস্বাদে। জ্ঞানদাসের রাধাকেও দেখি বিচ্ছেদদহন থেকে মুক্তি পাবার জন্য কৃষ্ণকে ভোলার শত চেষ্টা করেও ভুলতে পারেন না, পারেন না প্রেমানুভবকে বিনাশ করতে। তাই তার কাতর উক্তি শুনি—"কতেক যতন করি চিত নিবারিতে নারি" (শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ /৯)। চতুর্দিকের ভিন্ন বস্তুতে তার কৃষ্ণবিভ্রম ঘটে। কবির বর্ণনায় সে বিভ্রমের একটি অনুপম চিত্র :

"ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত
কোরে করত তুয়া ভানে।" (শ্রীরাধার···পূর্বরাগ /১০)।

আর রাধার নিজস্ব অনুভবে বিরহের আস্বাদতীব্রতায় কৃষ্ণবিস্ফূর্তি, কৃষ্ণপ্রেমের অনিবার্যতা, ভাবসম্মিলন—সব যেন একাকার হয়ে যায় অনুরাগের এই পদটিতে :

"পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরিতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
হিয়ায় হৈতে পিয়া শেজে না ছোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥" (অনুরাগ /১৯)।

গৌড়ীয় সাধনায় নিত্য আস্বাদ সত্ত্বেও কৃষ্ণের রসবৈচিত্র্য হ্রাস পায় না, তাই আকাঙ্ক্ষা কমে না, আস্বাদ বাসনার অবসান ঘটে না, পরিবর্তে এ সকলই অশেষ হয়ে ওঠে। জ্ঞানদাসের রাধার অনুভবেও আমরা যেন সেই দর্শন-সিদ্ধান্তেরই রসরূপ ভাষ্য শুনি :

"অপরূপ শ্যাম নাম দুই আঁখর তিলে তিলে আরতি বাঢ়ায়॥"
(শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ / ৩)।

আরও গভীরভাবে গৌড়ীয় প্রেমরসের সমগ্র আদর্শটিই যেন নিঃশেষে ধরা পড়ে এই পদটিতে :

"বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥
এক-দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেকে বরিখে।
যুগ মন্বন্তরে কত কল্পে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥" (রসোদ্গার/২৭)।

যুগ-মন্বন্তর-কল্পব্যাপী রাধাকে দর্শন করেও কৃষ্ণের কাছে রাধামাধুর্য চির নবীন, তাই—"দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।"। প্রেম ভালবাসার যে আদর্শ কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমে "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তব হিয়া জুড়ন

না গেল…" ইত্যাদি অংশে কবিবল্লভের পদে পূর্ণরসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখি, সেই রসাদর্শ এখানে রাধার প্রতি কৃষ্ণের স্নেহ-প্রেম ভালবাসায় পূর্ণ সঞ্চারিত হয়েছে, ফলে প্রেমে পারস্পরিক মাধুর্যসাধনার পূর্ণ গৌরব এখানে প্রকাশিত। কৃষ্ণের অনবদ্য মাধুর্যের, নররূপের, রস-রসিক একাত্ম-সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এ পদে। আর সেই পটভূমিকায় রাধার মহিমাও হয়ে উঠেছে অতুলনীয়। সেই সঙ্গে প্রেম-মাধুর্যের ক্ষেত্রে কান্ত-কান্তা ভেদজ্ঞান লুপ্ত গৌড়ীয় দর্শনের প্রেমবিলাসবিবর্তবাদের অপূর্ব ব্যঞ্জনায়, সর্বভাব অতিক্রমকারী মাদনের বিপরীত প্রকাশে, অবসানহীন আকাঙ্ক্ষায়, অশেষ বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত নিত্য সজীব প্রেমাদর্শের যেন এক অদ্বিতীয় রসস্বর্গের পূর্ণ বিস্তার ঘটেছে এ পদটিতে। সৌন্দর্যে-বৈচিত্র্যে-মহত্ত্বগৌরবে-আস্বাদমাধুর্যে পদটি সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্যে অনন্য।

শ্রীচৈতন্যের সাধনায় কৃষ্ণবিরহের উন্মত্ততা ও অসহিষ্ণুতা পরবর্তীকালের বৈষ্ণবসাহিত্যে পরিকল্পিত রাধাপ্রেমাদর্শে সঞ্চারিত হয়ে রাধাকে অদ্বিতীয়া মহাভাব-স্বরূপিণী ও সাধিকাশ্রেষ্ঠার পদে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, এ কথা আমরা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে উল্লেখ করেছি। রাধাপ্রেমাদর্শের সৃজনে চৈতন্যের সে কৃষ্ণবিরহার্তি ও উন্মত্ততা কবি জ্ঞানদাসেরও বহু পদে সঞ্চারিত হয়ে তাঁর রাধাপ্রেমাদর্শকে বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের পরিপোষক করে তুলেছে। যেমন মাথুর বিরহের অসহিষ্ণুতা ও কৃষ্ণ-উন্মাদনায় রাধার উক্তি শুনি :

"স্বপনে দেখিলুঁ সোই মোর প্রাণনাথ।
সমুখে দাড়াঞা আছে যোড় করি হাত॥
পুন না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি।
কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি॥
পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইলুঁ।
আপন করম-দোষে আপনি মরিলুঁ॥
যে দেশে পরাণ-বন্ধু সেই দেশে যাব।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব॥" (মাথুর /২৩)

অথবা কবির বর্ণনায় রাধার বিরহ-অসহিষ্ণু উন্মত্ততা :

"কানুক ঐছে দশা শুনি বিরহিনি বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি খিতি-তলে মুরছলি সখিগণ দিগুণ বিষাদ॥

... ...

চেতন পাই হেরই পুন দশ দিশ অতি উৎকণ্ঠিত হোই।
কাহাঁ মঝু প্রাণ-নাথ কহি ফুকরয়ে অবহুঁ না আওল সোই।
রোয়ত হসত খসত মহি জোয়ত পন্থহি নয়ন পসারি।..."

ইত্যাদি। (ঐ/২২)

এ সকল আমাদের অনায়াসে স্মরণ করিয়ে দেয় উৎসমূল শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণ-বিরহাতিজনিত উন্মত্ত আচরণ ও প্রলাপোক্তিসমূহকে। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত সেই উৎসমূল অজস্র দৃষ্টান্তের সামান্য দু' একটি নিদর্শন যেমন :

"কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন
কাঁহা রাসবিলাস কাঁহা নৃত্য গীত হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন ॥
উঠিল নানাভাব বেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঁঙাইতে।
....
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ
তাহা মোরে কহত আপনি ॥
... ...
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥..." ইত্যাদি।

(চৈ. চ. ॥ ২/২/৪৯-৫০, ৫৩, ৬২ ॥)

কিংবা :

"পাইলুঁ বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোরে নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুঞি আইনু ॥" (ঐ॥৩/১৪/৩৫).

অথবা : "কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই,
এই কহি চলিল ধাইয়া ॥" (ঐ ॥৩/১৭/৫৭ ॥)

বৈষ্ণব সাধনাদর্শ রাগাত্মিক প্রেমভক্তির যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় ও কাব্যরসের বিস্তারে অনুপম রাধাপ্রেমাদর্শের

সৃজনে তার যে বিবর্তন সাধন করেছে, তা সমগ্র বিশ্বের ভক্তিরসবিবর্তনের শেষ কথা। অদ্যাবধি ভক্তিসাধনার জগতে দ্বিধালেশমুক্ত সিদ্ধান্ত :

"... ... রাধিকা সর্বথাধিকা।

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥" (উ. নী. ॥ শ্রীরাধাপ্রকরণ/৩॥)

এই অতিবরীয়সী রাধা ও তাঁর অতুলনীয় প্রেমাদর্শ, ঈশ্বরকে এমন আপন করার দৃষ্টান্ত ও ঈশ্বরের কেবল অনুপম মাধুরীর অশেষ আদর্শ সর্বাধিক গৌরব লাভ করেছিল শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ সাধনাদর্শে অনুপ্রাণিত ষোড়শ শতকের বিশেষতঃ বৈষ্ণব পদসাহিত্যের আশ্রয়ে। কবি জ্ঞানদাসকে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সেই সুবর্ণযুগ-মহিমার সূচনা ও বিকাশসাধক পদকার হিসাবে পরম শ্রদ্ধায় বরণ করে নেওয়া চলে।

———